রমাঁ রোলাঁ

# জাঁ ক্রিস্তফ

[ মূল ফরাসী উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড ]



অনুবাদ করেছেন :
পুষ্পময়ী বসু

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

প্রকাশক : বিমল মিত্র, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর : ননীগোপাল পোদ্দার, ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-৬

# জাঁ ক্রিসতফ : চতুর্থ খণ্ড

## চোরা বালি

মুক্তি! মুক্তি!...সবার বাঁধন থেকে মুক্তি! মুক্তি নিজের কাছ থেকে...ওর চেতনা জুড়ে কেবলি বাঁধন ছেঁড়ার সুর বাজছে। বছর-খানেক থেকে বা তার বেশীই হবে, ক্রিসতফকে ঘিরে কতরকম আবেগের ঘন জাল বুনে উঠছিল, ওর নড়বারও শক্তি ছিল না। আজ কেমন ক'রে জানি জালটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। ও জানতেও পারল না। ও বাড়ছে বলেই ছোট খাঁচায় আর ধরছে না। বড় হবার ওই দশা। যে আত্মাটুকুর মধ্যে হাত পা কুঁকড়ে দম বন্ধ হ'য়ে আজন্ম থাকা, সেটাকে ভেঙ্গে একেবারে ফেলে দিয়েই বড় হয় শক্তিমানের দল।

কি যে ঘটল কিছুই বুঝতে পারে না ক্রিসতফ, কিন্তু বুকটা ওর হালকা হ'য়ে গেছে। বুক ভ'রে নিশ্বাস নিতে পারছে। গটফ্রেড্‌কে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরছিল। শহরের গেটের মধ্য দিয়ে পথ। হিমেল ঘূর্ণি হাওয়া বইছে শন্ শন্ ক'রে। পথচারীরা মাথা নীচু ক'রে ঝড় ঠেকিয়ে পথ চলছে। মেয়েরা এরই মধ্যে চলেছে কাজে; হাওয়ায় কাপড় নিচ্ছে উড়িয়ে। সামলাতে ওরা হিমসিম খাচ্ছে। নাক মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে; দম নেবার জন্য দাঁড়াতে হচ্ছে বার বার। সর্বাঙ্গ পরিশ্রমে যেন নুয়ে আসছে। মুখ দেখে মনে হয় এক্ষুণি চোখ ফেটে জল পড়বে। শহরে বরফ পড়েছে, মেঘলা থম্‌থমে হিম আকাশের বুকে তার খবর লেখা। ক্রিসতফ চারপাশে তাকায়, নিজের মনটার ভেতরে তাকায়। আজ ও একেবারে মুক্ত, অন্তর বাহির সবখানকার সব প্রভাব থেকে মুক্ত। কিন্তু একা...বড় একা। তা হোক, বেশ লাগছে...। আজ ও

সম্পূর্ণ নিজের। কারো হাতের পুতুল নয়। কারো ইচ্ছের বশ নয়। কি আনন্দ!

মুক্তির কি আনন্দ! যাদের ভালোবেসেছে, ঘৃণা করেছে, তাদের স্মৃতি এতদিন আগুন হ'য়ে ওর পাঁজর জ্বালিয়েছে। আজ সেখান থেকেও মুক্তি। সে স্মৃতি আজ আর দহন করে না, ভয় দেখায় না। সবার থেকে, সব কিছু থেকে ও একেবারে মুক্তি পেয়েছে। সর্বনাশের মধ্যে ও বাঁচার মন্ত্র পেয়েছে।...আজ ও স্বয়ং-প্রভু! আজ ও আপনি আপনার রাজা! কি আনন্দ! কি আনন্দ!

সারা গায়ে মাথায় বরফ নিয়ে বাড়ী ফিরল। হালকা খুশিতে বরফগুলি গা ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলতে লাগল। মা বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছিল। পেছন থেকে এসে খপ ক'রে দুহাতে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিল তাকে। ছেলেমানুষের মত ক'রে আধো আধো কথায় কত রকম ক'রে আদর করতে লাগল, মা যেন ছোট্ট খুকী। বেচারী লুইসা, ছেলের কোল থেকে নামবার জন্য ছট্‌ফট্ করতে লাগল। ওর সারা গা বরফের জলে ভিজে গেছে। প্রাণ-ভরা আনন্দে হাসতে হাসতে মা বলে: 'বুড়ো খোকা কোথাকার...'

এক সাথে তিন তিন সিঁড়ি টপকে এসে ঢুকল নিজের ঘরে। অন্ধকার ছোট্ট আয়নাটায় মুখ দেখতে পেলে না। এতটুকু এক ফালি ঘর, নড়তে চড়তে গা ঠেকে দেয়ালে; তাই যেন ওর রাজার রাজ্যি। দরজা বন্ধ ক'রে একা একা হো হো করে হাসতে লাগল অমনি-খুশিতে। এতদিনে আপনাকে ও খুঁজে পেল। কতকাল হারিয়েছিল, কতকাল অন্ধের মত পথ হাতড়ে বেড়িয়েছে...।

অথৈ চিন্তা, কুল পাথার নেই। সাঁতারুর মত ক'রে ঝাঁপ দিয়ে

পড়ে চিন্তা-সায়রে। হাত পা ছেড়ে গা ভাসিয়ে দেয়। ইচ্ছে হয় ঝাঁপাই খেলে।

ভালো ক'রে অন্তরের মধ্যে তাকায়···বহু দূরের এক বিশাল হ্রদ যেন সোনালী নীল কুয়াশার সাথে গা মিলিয়ে এলিয়ে আছে ওখানে।

স্বপ্ন দেখে: কাল রাতে ওর ভয়ানক জ্বর হয়েছিল। আজ জ্বর নেই, হ্রদের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে স্নিগ্ধ জলে পা ডুবিয়ে। শীতান্তের প্রভাতী হাওয়ায় তপ্ত দেহ স্নিগ্ধ হ'য়ে ওঠে। ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ল জলে, চলল সাঁতরে—কোথায় তা জানা নেই। দিকে হোক, বিদিকে হোক, নিশানায় হোক আর গড় নিশানায় হোক, খুশি মত সাঁতরাতে পারছে, এ আনন্দের পার নেই। স্তব্ধ হ'য়ে যায় ক্রিসতফ। তারপর হেসে ওঠে···কান পেতে শোনে, আত্মার গভীরে কত বিচিত্র সঙ্গীত···জীবন যেন উপচে প'ড়ছে সেখানে সহস্র ধারায় ধারায়। কিছুই বুঝতে পারে না ও···মাথা ঘুরছে—কেবল এক অচেনা আনন্দে সারা চেতনা দুলছে। বিরাট শক্তির অনুভূতিতে ফুলে ফুলে উঠছে ধমনীর স্রোত। ও নেচে ওঠে। এত শক্তি ওর মধ্যে! কোথায় ছিল এতদিন! কেমন ক'রে এমন বন্ধ্যা হ'য়ে ছিল সে মহাশক্তি। আজ আবার হঠাৎ হাওয়ার বুকে বসন্ত নাড়া দিয়ে গেল। রং বেরং এর ফুল ফুটে উঠল চারদিকে। ওরা যেন আগুনের শিখা। রং-এর নেশায় ক্রিসতফ মোহ-গ্রস্ত হ'য়ে থাকে। আলসে গা ঢেলে ব'সে ব'সে দেখে শক্তির লীলা।

মার ডাক শোনা যায়; খেতে ডাকছেন। নীচে আসে ক্রিসতফ। ওর মাথার ভেতরটা একেবারে খালি হ'য়ে গেছে। মাথা ঘুরছে, কাল সারাটা দিন বুঝি ও রোদে হাওয়ায় মাঠে ঘাটে ঘুরে বেরিয়েছে। কিন্তু এমন একটা আনন্দের ঝলক ওর মুখে চোখে সর্ব অবয়বে—মা জিজ্ঞাসা করেন অবাক হ'য়ে, কি হয়েছে। কোন জবাব দিল না ও। দৌড়ে

গিয়ে মায়ের কোমর জড়িয়ে খাবার টেবিলের চারদিকে নাচতে লাগল তাকে সুদ্ধ। হাঁপিয়ে ওঠে লুইসা, চীৎকার করে: 'হতভাগা তুই পাগল হ'য়েছিস! ছাড় ছাড়!' অনেক কষ্টে হাত ছেড়ে পালায় বেচারী।

মনে মনে উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে, আবার বুঝি হতভাগা কারো প্রেমে প'ড়ল।

ক্রিসতফ হো হো ক'রে হেসে উঠে হাতের ন্যাপকিনটা নিয়ে লোফালুফি করে।

'কি বলছ মা? প্রেম! হায় ভগবান! না গো না। প্রেম টেম নয়। ওরে বাবা! আবার! নিশ্চিন্ত থাকতে পার সে-বিষয়ে। নেড়া কবার যাবে বেল-তলায়?'

ঢক ঢক ক'রে এক গ্লাস জল খেয়ে ফেলল।

আশ্বস্ত হ'য়ে লুইসা তাকায় ওর দিকে। মাথা নেড়ে হেসে বলে: 'মাতালের প্রতিজ্ঞা তো! শুধু রাতটুকু। দিন হলেই আবার ধিঙ্গি। তাই না?'

'দিনটাই পুরো লাভ। তাহলেই বা মন্দ কি?' ও হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

'তা আর বলতে!' মা বলে: 'কিন্তু তোর আজ হল কি বলত? অত খুশির হেতুটা কি?'

'বড় ভালো লাগছে মা। বস্ আর কিছু না। অকারণ লাগিছে যে ভালো। বুঝেছ?'

টেবিলের ওপর কনুই রেখে মায়ের মুখোমুখি টেবিলে ব'সে ভবিষ্যৎএ কি ক'রবে না ক'রবে তার ফিরিস্তি দিতে বসে মাকে। মা সংশয়ে দরদে মিশিয়ে শুনতে শুনতে ছেলেকে সস্নেহে মনে করিয়ে দেয়: 'ওরে

তোর স্যুপ যে ঠাণ্ডা হলো।' ক্রিসতফ জানেনা ওর কথা মার কানে যাচ্ছেই না। নাই যাক। ও বলছে বলার খুশিতে।

স্নিগ্ধ হাসি-ভরা চোখে পরস্পরের দিকে তাকায় ওরা। ক্রিসতফ ব'লে যায়—লুইসা শোনে না। ছেলের কথা মনে হ'তে গর্বে বুক ওর ফুলে ওঠে। কিন্তু ছেলের স্বপ্নের সাথে ওর আত্মীয়তা নেই। শুধু এইটুকুই সান্ত্বনা যে এতদিনে ছেলেটা একটু খুশি হ'য়েছে। এই যে ঢের। ক্রমশ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে ক্রিসতফ, কথা বলতে বলতে কালো শালে ঘেরা মায়ের প্রিয় মুখ খানির দিকে তাকিয়ে থাকে—শাদা ধবধবে চুল—কোমল চোখ-দুটির শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে যেন ওকে গণ্ডুষে গণ্ডুষে পান করছে। মায়ের মনের ভাবনাটুকু ওর আর জানতে বাকী নেই। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে:

'সবই তোমার কাছে এক কেমন! আর এই যে কথাগুলো বলছি তা কিছুই গায়ে লাগছে না?'

দুর্বলভাবে প্রতিবাদ করে লুইসা: 'না না। কে বলেছে?'

মাকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খায় ক্রিসতফ। বলে:

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমায় আর ঢাকতে হবে না। ঠিকই তো বলছ। নাই বুঝলে আমায়, ভালোবাসো, শুধু ভালোবাসো, মা। আর চাইনে কারো ভালোবাসা। আর কাউকে চাইনে কিছু চাইনে। আমার মধ্যেই সব খুঁজে পেয়েছি আমি। সব আছে···সব···সব! আমার নিজের মধ্যে সব আছে···

লুইসা বলে: 'আঃ আবার পাগলামী ঢুকেছে মাথায়! বাবাঃ আগের চেয়ে তবু রক্ষে।'

ভাবনার হ্রদের বুকে ভেসে ভেসে চলেছে ও···মধুর···মধুর···কি

সুখ…কি আনন্দ…। নৌকার পাটাতনের ওপর শুয়ে আছে হাত পা এলিয়ে…মিঠে রোদ আর জলের বুক-ছোঁয়া হাওয়া আদর বুলিয়ে যাচ্ছে ওর চোখে মুখে। ঘুম আসতে চায়। আকাশ থেকে যেন দোলনা ঝুলছে আর তাতে ও দুলছে। ও বুঝতে পারছে এলান দেহটার নীচে, নৌকার তলা দিয়ে বইছে ঘোলা জলের রাশ; হাতখানা গিয়ে পড়ে জলে। ও উঠে পড়ে। নৌকার ধারে থুত্নী ঠেকিয়ে ছোট বেলার মত ক'রে তাকিয়ে থাকে জলের দিকে। অদ্ভুত অদ্ভুত জীব জন্তুর ছায়া যেন বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেরে জলের মধ্যে ছুটোছুটি করে…আরো… আরো…কত…। এক একটা এক এক রকম…। চিত্ত-লোকে এ কি বিচিত্রের উদ্ঘাটন! ও হেসে ওঠে। নিজের খেয়ালে নিজেরই হাসি পায়। ধরবে ওই জন্তুগুলোকে? কি হবে ধরে? পছন্দ মত একটা বেছে নেবে। হাজার হাজার স্বপ্নের এই মেলা, তার মধ্য থেকে একটা বেছে নেওয়া? কেন? একটা কেন? তাড়াই বা কিসের? বহু সময় আছে…বহু সময়…। পরে হবে…দুদিন যাক না। একটা বড়শী ফেলে রাখবে শুধু, যেটা পড়ে পড়ুক। ধরবার চেষ্টা করে না ক্রিসতফ। ঝাঁক বেঁধে অবাধে সাঁতরে সাঁতরে চলে যায় জন্তুর দল।…যাক… যাক…পরে হবে…। সময় আছে। স্বপ্নের প্রবাহে উষ্ণ বাতাসের দোলায় নৌকা ভেসে চলে নিরুদ্দেশে। চারদিক স্নিগ্ধ স্তব্ধ মধুর।

শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করে, কেমন একটা আলস্য। আড়মোড়া ভেঙ্গে ছিপটা জলে ফেলে। নৌকার ওপর ঝুঁকে তাকিয়ে থাকে ফাৎনার দিকে। খানিক দূর ভেসে গিয়ে ওটা ডুবে যায়। খানিক ক্ষণের জন্য যেন ওর সর্ব দেহে তন্দ্রা নেমে আসে। তন্দ্রার মধ্যেই ধীরে ধীরে বড়শী ধ'রে টানে। বড্ড ভারী লাগে। টানতে গিয়ে হাত সরে না,

নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসতে চায়। জানে শিকার পড়েছে বড়শীতে। কিন্তু কি কে জানে। যতক্ষণ আশা থাকে ততক্ষণই ভালো। তুললেই তো ফুরোল ; থাকই না আর কিছুক্ষণ।

তারপর মন ঠিক ক'রে নেয়। কি চমৎকার! কতগুলি মাছ! রং বেরং এর আলোয় মাখা দেহ (সাপের মত কিলবিল করছে মাছগুলো)। অবাক কৌতূহলে তাকিয়ে থাকে। আঙ্গুল দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে। কিন্তু একি? জল থেকে টেনে তুলতেই কোথায় গেল বর্ণের জলুস! সব কটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় জলে। আবার বড়শী ফেলে। মাছ ও ধ'রে রাখবে না ; শুধু দেখবে—চিত্ত-সায়রে ওই যারা কেলি ক'রে বেড়াচ্ছে—ওর স্বপ্নের দল—একটা একটা ক'রে ও কেবল একবার দেখবে সবগুলো। কিন্তু জলের মধ্যেই দেখতে বেশ লাগে। তুললেই কেমন বিশ্রী হ'য়ে যায়।

সব রকম মাছ তুলে তুলে দেখে—একটার চাইতে আর একটা আরো বেশী সুন্দর। গত কয়েক মাস ধ'রে অজস্র রকমের কল্পনা ওর মনের মধ্যে জমে উঠছে থরে থরে। জমেইছে শুধু কাজে আর লাগেনি। এত জমেছে যে আর জায়গায় কুলয় না—ও যেন ফেটে পড়ছে আজ। কিন্তু সব কেমন এলোমেলো, মাথা গোলমাল হ'য়ে যায়। মনটা একেবারে 'বেবেল' রাজ্য হ'য়ে উঠেছে—অথবা ইহুদীদের আজব চীজের দোকান—দুর্লভ মনি-মুক্তা, বহুমূল্য হরেকরকম জিনিষ তার সাথে পুরানো ভাঙ্গা-চুড়া লোহা, ছেঁড়া ন্যাকড়া সব এক সাথে খিচুড়ী পাকান। কোনটার যে কি দাম ও ঠিক ক'রে উঠতে পারে না ; সবই ভালো লাগে—সবই মন টানে। কান পেতে শোনে, বুকের মধ্যে কত সুর ; মিঠে মন-মাতান সুর—অহর্নিশি বাজছে। কখনও মৌমাছির মত গুনগুনিয়ে যায়, কখনও প্রেমিকের মত মুখের দিকে তাকিয়ে যেন

মিঠে-মধুর হাসে। ঝিলমিলিয়ে যায় কত স্বপ্ন—ওর স্বদেশ···চেনা, অচেনা কত মুখ, কত আবেগ, কত মন. কত চরিত্র, কত রকম বেরকমের মানুষ—কত সাহিত্যিক, দার্শনিক; কত ভাব আর অনুভাব, বড় বড় অসম্ভব পরিকল্পনা, যার কোনো কুল কিনারা নেই। ও ভাবে সারা পৃথিবীর সব কিছুই ও রূপ দেবে সুরে। সঙ্গীত···সঙ্গীত···। সামান্য এতটুকু ছোঁয়ায় সুর ওঠে গুনগুনিয়ে। হয়ত আচমকা কারো কণ্ঠ শোনা গেল, কেউ বা পাশ দিয়ে চ'লে গেল, হয়তো বা বৃষ্টি পড়ে টুপ টাপ্‌ রিম্‌ঝিম্‌···ওর অনুভূতির তারগুলি কি এক সুরে ঝনঝনিয়ে বাজতে থাকে। শুধুই একটা অরূপ সুর···তাও পুরো নয়·· বেশী দূর এগোয় না, পুরো হয় না কোনোটা। কিন্তু তরুণদের মত ওরও মনে হয় —এ ওরই বুকের ভাষা; কণ্ঠের গান। ঠিক এই কথা কটিই ও যেন ব'লতে চেয়েছিল।

কিন্তু ওইটুকুতেই খুশি হ'য়ে থেমে পড়ার মত অত ক্ষুদ্র দুর্বল প্রাণ নয় ক্রিসতফের। মনের মধ্যে আলেয়ার খেলা; ও ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় সবগুলোকে টেনে ছিঁড়ে ও পেড়ে ফেলে মাটিতে। কিন্তু কোথায় হবে সুরু! কোনটাই তো ওর কাছে ছোট নয়। সবই সমান আদরের ধন। উল্টে পাল্টে দেখে প্রত্যেকটা···একবার ঠেলে সরিয়ে দেয়···আবার আরম্ভ করে···। না না ভুল হলো···এ তো হয় না···সব যে কেবলি বদলাচ্ছে···ওর চোখের সামনে হাতের মধ্যে বদলে যায়···। তাড়াতাড়ি ধ'রতে যায়, পারে না···হাত চলে না··· ভয় পেয়ে যায়। তাড়া সয় না। ইচ্ছে হয় সব কিছু এক দিনে করে··· কিন্তু সব দূরে থাক, সামান্য এতটুকু একটা কাজও হ'য়ে ওঠে না। কিছুতেই পেরে ওঠে না, স্বপ্নগুলি যেন মিলিয়ে যাচ্ছে···সাথে সাথে মিলিয়ে যাচ্ছে বুঝি ক্রিসতফও; একটা কাজ হাতে নেয়··কিন্তু সেই

মুহূর্তেই যা নেয় না তার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। হাতের কাজ প'ড়ে থাকে। যেন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্যই বেছে বেছে অত চমৎকার চমৎকার কাজ ও হাতে নিয়েছিল। এই জন্যই অত ঐশ্বর্য ওর কোনো কাজে আসে না। চিন্তাগুলি জীবন্ত থাকে যতক্ষণ তারা বাইরের আলোয় না আসে, যতক্ষণ তাতে ওর হাত না পড়ে। ওর সৃষ্টি যেন কিছুতেই সার্থক হ'য়ে ওঠে না। সব মৃত-জাত শিশুর মত নিরর্থক। এ যেন ট্যানটেলাস-এর অভিশাপ···হাতের কাছে অজস্র ফল, যেমনি ছোঁয়া অমনি সব পাথর। সামনে স্বচ্ছ শীতল মিঠে জল—মুখ দিলেই আর নেই।

যে ঝরণাটার দেখা পেয়েছিল পথের সুরুতেই —অর্থাৎ ওর প্রথমকার রচনা—তাতেই তৃষ্ণা মেটাতে যায়। কিন্তু কি বিশ্রী—বিস্বাদ···! মুখে দিয়ে থু থু ক'রে ফেলে দেয়—গাল দেয় নিজেকে। এ কি ?··· কতগুলি শব্দের কচ্ কচি ? এরই নাম সঙ্গীত ? এই সঙ্গীত রচনা করেছে ক্রিসতফ ? সবগুলি আবার পড়ে, ভালো ক'রে মন দিয়ে পড়ে ···ভয়ে শিউরে ওঠে! একটা অক্ষরও বুঝতে পারছে না···কি ক'রে ওর হাত দিয়ে বেরুল এমন জিনিষ ? ভারী আশ্চর্য লাগে। লজ্জা! লজ্জা! মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। একটা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রচনা প'ড়ে, চার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল ও, নেই তো কেউ আশেপাশে ? লজ্জার সীমা থাকবে না তা হ'লে। তারপর লজ্জিত শিশুর মত গিয়ে বালিসে মুখ গুঁজল গিয়ে। এক এক সময় রচনাগুলি এত কুৎসিত মনে হয়, ভাবতেই পারে না ওগুলো ওর হাতের রচনা।···

হেসে লুটিয়ে পড়ে। হয়তো ব'লেই বসে, 'একেবারে গাধা, গাধা'। কিন্তু কোন কোন রচনায় গভীর আবেগ···প্রেমের, আনন্দ-বেদনার রংএ মিশে গ'লে গ'লে ঝ'রে পড়ছে ; ওর অন্তরের গভীরে গিয়ে তারা

ঢেউ তোলে। চেয়ার থেকে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে, যেন বোলতা কামড়ে দিল; টেবিল চাপড়ে, চুল ছিঁড়ে, চীৎকার ক'রে, নিজেকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়ে একেবারে তোলপাড় করে। তারপর গিয়ে দাঁড়ায় আয়নার সামনে রাগে ফোঁসা মুখ চোখ নিয়ে।...নিজের থুত্নী ধরে তুলে চীৎকার ক'রতে থাকে :

'শয়তান! দেখ দেখ, চেহারাখানা একবার তাকিয়ে দেখে নে প্রাণ ভ'রে। পাজী বদমাস, দাঁড়াও, মিথ্যে কথা বার করছি। খাও এখন চুবুনি, এখন কেমন বাছা-ধন?'

ব'লেই গামলার জলে গিয়ে মুখ চুবিয়ে ধরে, দম বন্ধ হ'য়ে আসে—তবু ওঠে না। যখন উঠল, মুখের রং নীল হ'য়ে উঠেছে, চোখ ঠিকরে পড়ছে, শীল মাছের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে প'ড়ছে নিঃশ্বাস। ওই অবস্থাতেই টেবিলের কাছে ছুটে গিয়ে গর্জন ক'রতে ক'রতে রচনাটা তুলে নিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

'হ'ল তো এবার! শয়তান, হ'ল!...এই নাও...এই নাও...' বলে আর ছেঁড়ে। ছিঁড়ে ফেলে তবে ও ঠাণ্ডা হয়।

ওর সব থেকে বেশী রাগ—ও সুরকার ও শিল্পী—কিন্তু ওর রচনায় কোথায় সত্য? সব ফাঁকি আর ভণ্ডামী। অনুভূতি নেই, অনুভূতি নেই, কোথাও এক ফোঁটাও অনুভূতি নেই। ইস্কুলের ছেলের মত সুর ক'রে ক'রে আওড়ানর মত কতগুলি ছড়া লিখেছে; ঐ পর্যন্ত। প্রেমের গান লিখতে গেছে! যেন অন্ধ রং বোঝাতে বসেছে আর কি! শুধু লোকের মুখে শোনা বাঁধা বুকনী নাকী সুরে, ছড়ায় গেঁথেছে। শুধু তো প্রেমই নয়, সব কিছুরই তো ওই দশা! সর্বত্র মিথ্যে। মানুষের হাসি, অশ্রু, আনন্দ, বেদনা, মিলন-বিরহ, যা কাব্যের ধন হ'য়ে আছে—ওর হাতে কি দশা ঘটেছে তাদের! অথচ সত্য, হ'তেই ও চেয়েছে,

সাধনা ক'রেছে। কিন্তু শুধু চাইলেই সত্য হওয়া যায় না। সাধ্য থাকা চাই। জীবনকে যে কখনও দেখলে না, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার পরিচয় নিলে না, তার সত্য-দৃষ্টি হবে কোত্থেকে ? রচনার ফাঁকি এর আগে ধরা পড়েনি। গত ছ' মাসের অভিজ্ঞতাই ওর দৃষ্টি দিয়েছে খুলে। সেই অভিজ্ঞতার নিরিখেই ও দেখেছে আগের ক্রিসতফ ও আজের ক্রিসতফের মাঝখানে এক বিরাট গহ্বর। আজ ওর চোখে মিছে কল্পনার রং নেই ; আছে সত্য-দৃষ্টি। সেই মানদণ্ডে আজ ও ওর সমস্ত অন্তরলোককে যাচাই ক'রে নিতে পারে।

ওর আগের লেখাগুলি একেবারে নীরস, ভাবশূন্য। সেই বিতৃষ্ণায় ও পণ ক'রে বসল, আর লিখবে না, গান গাইবে না। সঙ্গীত-চর্চা, নৈব নৈব চ। বজ্রের আঘাতে বুকের আগুনে যেদিন সৃষ্টির শিখা জ্ব'লে উঠবে, অন্তরের আবেগ যেদিন আপনা থেকে লেখা হ'য়ে ঝরে পড়বে, সে-দিন আবার কলম ধ'রবে ক্রিসতফ। আবার গান গাইবে।

ঝড় যে আসছে, ঝড়ের কেতন উড়িয়ে আসছেন সর্বনাশের দেবতা, কেমন ক'রে জানি খবরটা ওর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই ওর অমন গভীর পণ। বজ্র যখন পড়ে, কোথায় যে প'ড়বে আর কখন প'ড়বে সে-কথা কেউ বলতে পারে না। কোনো কোনো পর্বত শিখর নিজের টানে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে আসে সে-আগুনকে বুকের মধ্যে। আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও পাত্র বিশেষের বুকের মধ্যেই ঝড়ের ঠাঁই। হয়তো ঝড়ের উপাদানই তার কোষে কোষে, নয় দিক-চক্রবালের প্রতি বিন্দু হ'তে ঝড়ের বেগকে সে আপনার মধ্যে টেনে নিয়ে আসে দুই হাতে। বিশিষ্ট ঋতুর মত মানুষেরও বিশিষ্ট একটা বয়স আছে। সেই বয়সটা এমনি বিদ্যুৎ-সম্পৃক্ত, যে তার মধ্যেই প্রলয়-ঝড়ের আবাহনের

মন্ত্র। কিন্তু মানুষের ইচ্ছে মতই আসবেন না রুদ্র-দেবতা। আশা ক'রে পথ চেয়ে ব'সে থাকলে অন্ততঃ সাড়া তিনি দেবেন।

মানুষের সর্ব-সত্তাই উন্মুখ হ'য়ে থাকে রুদ্রের পদধ্বনি শোনবার জন্য। কখনও কখনও দিনের পর দিন ঝড়ের দেবতা বিষ-ফনাটা উঁচিয়ে—স্তব্ধ, স্থির হ'য়ে থাকেন। ফ্যাকাশে আকাশটার বুক আগুন-বরণ মেঘে ঢাকা, বাতাস থমকে আছে থেমে ; ভেতরে ভেতরে তার আগ্নেয়-গিরির ফুটন্ত লাভা ; সমস্ত পৃথিবী যেন তন্দ্রায় বিবশ ; কোথাও একটু শব্দ নেই। নিথর নিস্পন্দ নিঝুম! মস্তিষ্কের মধ্যে দাপাদাপি। সমস্ত প্রকৃতি যেন থেমে গেছে। বুক দুরু দুরু করে ভয়ে ; এই বুঝি নুতন-জাগা শক্তিগুলি বিস্ফোরণে ফেটে ছড়িয়ে গেল—এই বুঝি হাতুড়ীটা উঠল, হঠাৎ আছড়ে পড়বে মেঘের হাপরের ওপর ভয়ংকর শব্দে—কালো উষ্ণ ছায়ার দল যেন পাশ দিয়ে চ'লে যায়, আগুনের হল্কা ব'য়ে যায় শিরায় শিরায় ; স্নায়ু-জাল পাতার মত থর থর করে কাঁপে।… তারপর আবার নিস্তব্ধতা। আকাশের বুকে বজ্রের আগুন জমে ওঠে।

এমনি প্রতীক্ষার সাথে সাথে থাকে প্রবল উৎকণ্ঠা। কিছুতেই আরাম নেই, স্বস্তি নেই, বুকে পাথর চেপে থাকে। কিন্তু তবু শিরায় শিরায় বিশ্ব-গ্রাসী অনলের স্রোত। অভিশপ্ত মানুষ যেন গন্‌গনে আগুনের মধ্যে প'ড়ে ফুটন্ত সুরার মত টগবগ ক'রে ফুটছে। জীবন মৃত্যুর সহস্র সহস্র ভ্রূণ পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে আলোয় বেরিয়ে আসার জন্য উন্মুখ। কিন্তু কি ঘটবে? ওই ভ্রূণের দল হ'তে জন্ম নেবে কোন্ সম্ভাবনা! গর্ভবতী নারীর মত নীরবে ও আপনাকে দেখে…কান পেতে শোনে গর্ভের অন্ধকারে প্রাণের স্পন্দন ; আর ভাবে কি সন্তান হবে।

কখনও কখনও বৃথা প্রতীক্ষায় চ'লে যায় কত সুদীর্ঘ প্রহর। কোথায় উন্মত্ত প্রভঞ্জন? কোথায় তার ভয়াল রুদ্ররূপ? চমক ভাঙ্গলে, দেখে

মাথা ভারী, বুক ভারী…মনে হয়—ঠকলুম ঠকলুম, বিষম ঠকলুম। মনে হয় বুক ভেঙ্গে গেল—শরীর অবশ হয়ে আসে নিরাশায়। কিন্তু বুকের মধ্যেই অভয় বাণী, ভয় নেই গো, ভয় নেই। প্রভঞ্জনের দেবতা দেখা দেবেই তার ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে, শুধু দু'দণ্ডের দেরী। আজ না হ'লে কাল। যত দেরী হবে ততই ভয়ঙ্কর হবে তার রূপ।…

ওই দেখ ঝড় উঠল…চিত্তাকাশের প্রতিটি কোণ থেকে ওই দেখ ছুটে আসছে কালো কালো দৈত্যের মত মেঘের দল…তাদের বুক চিরে চিরে ওই যে মাতাল বিদ্যুতের লক্‌লকানী। দৈত্যের মত হাঁক ডাক ক'রে ছুটে আসছে মেঘেরা…দিক্ চক্রবাল ঢেকে গেল…আলো গেল মুছে। কি প্রচণ্ড! কি ভয়ঙ্কর…! প্রকৃতির নিয়মে পঞ্চ-ভূতের দল খাঁচায় ছিল বাঁধা। আজ তারা ছাড়া পেয়েছে। তাই যখন চেতনার রাজ্যে রাত্রি নেমে এল, ওরা দানবের মত বিকট দাপাদাপি শুরু করলে সেই অন্ধকারে। বেদনায় আঁকু পাঁকু করে মন…কাৎরে ওঠে—না না আর বাঁচা নয়, এবার মরণ হোক, মুক্তি হোক…

হঠাৎ একি বিদ্যুতের ঝলক!

ক্রিসতফ আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠল।

আনন্দ! ভয়ঙ্কর আনন্দ! সবিতৃ-রূপ, যে সবিতা জ্বালায়, আলোয় ভাসায় আগত অনাগত সব কিছুকে। সৃষ্টি-সুখের অমৃত রূপ এ যে! সৃষ্টি ছাড়া কোথায় আনন্দ! কোথায় প্রাণ! প্রাণী তো সেই যে প্রাণন করে, প্রাণকে সৃষ্টি করে। বাকী সব শব, ছায়া, শুধু মৃত ছায়া…মাটির বুকে প্রেতের মত শুধু কিলবিল করে…জীবনকে তারা চেনে না। জীবনের যিনি দেবতা সৃষ্টির আনন্দেই তাঁর প্রকাশ। প্রেম বলো, প্রতিভা বলো, কর্ম বলো সৃষ্টিতেই শুধু সার্থক। যে হতভাগ্য লোভী, অহংকারী আর নিস্ফল ইন্দ্রিয়চারীর দল সেই মহাগ্নির পাশে ঠাঁই

পেলে না, তারাও আশ পাশ থেকে হাত বাড়ায়, আগুন নাই যদি পায় কোনো মতে একটুখানি উষ্ণতার স্পর্শ পাবার জন্য ওরা আকুল।

দেহের ক্ষেত্রে হোক আর মানস ক্ষেত্রে হোক, সৃষ্টি করো, সৃষ্টি করো। সৃষ্টিই দেহ হ'তে বন্ধন মোচনের মন্ত্র; জীবনের প্রমত্ত ঝড়ের পিঠে সওয়ার হ'য়ে দিগ্বিজয়ের যাদু। যে শুধু মাটি আঁকড়িয়ে কোনো মতে ধুক্‌ধুকিয়ে বেঁচে আছে, সৃষ্টি ক'রতে পারলে সেও পরম মানুষ, সেও ভগবানের আসন পায়। স্রষ্টাই ভগবান। সৃষ্টিই জয়ের মন্ত্র।

সৃষ্টি করতে পারলেনা যারা, তারা দুর্ভাগা, বিষম দুর্ভাগা। বিরাট বিশ্বের বুকে একক ধূলি কণার মত কোথায় হারিয়ে ব'সে আছে তারা—নিজের বিশীর্ণ দীপ্তি-হীন জলুস হীন শুধু 'আছি' টুকুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের ক্লান্ত দিন যায়। কোনো দিন জীবনের কোনো শিখা জ্বলবে না ওই দুর্ভাগাদের বুকে। যারা নিজের ঐশ্বর্যের খবর রাখলে না, তারা কি কম দুর্ভাগা! ওদের মানস লোকও যে প্রেমে, প্রাণে, অজস্র সম্ভাবনায় একেবারে উপচে প'ড়ছে। সংসার হয়ত তাদের সম্মান দিয়ে মাথায় রাজ-মুকুট পরাবে। কিন্তু মৃত দেহে রাজ-মুকুট পরিয়ে কি লাভ হবে!

ক্রিসতফের চোখের সামনে হঠাৎ বিদুৎ ঝলসে ওঠে। তরলিত বিদ্যুৎ ওর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে। ও কেঁপে ওঠে। আঁধার রাতে উতরোল সাগরের বুকে দিক-হারা হ'য়ে ভাসছিল—হঠাৎ যেন মাটির ঠিকানা পায়। অথবা অজানা মানুষের ভিড়ে হঠাৎ মেলে কার আমন্ত্রণ ভরা দুটি চোখের আত্মীয়তা। এমনি প্রায়ই ঘ'টতে লাগল। এই আছে এই নেই। ধরা দেয় না। হতাশায় হাত পা অবশ হয়ে প'ড়ে থাকে ঘন্টার পর ঘণ্টা; অশান্ত আক্রোশে মন কেবলি শূন্যে হাত

পা ছোড়ে। ঠিক তার পরেই লাফিয়ে ওঠে···আলো! আলো! ওই যে আলোর হাতছানি!

আবার কখনো হয়তো সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবছে, হয়তো কথা বলছে মায়ের সাথে, অথবা পথ চলছে আনমনে, হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল, হঠাৎ রক্তে জাগল তুফান। বাইরে থাকলে সামাজিক বোধটা কিছু জাগ্রত থাকে। আনন্দে আত্মহারা হ'লেও বেসামাল হয় না। কিন্তু বাড়ী থাকলে কথা নেই। এমনি চেঁচামেচি ক'রবে যেন বিশ্ব জয় ক'রে এসেছে। নাচানাচি দাপাদাপি ক'রে একেবারে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে তোলে। মা এখন ছেলেকে বুঝে নিয়েছেন; আদর ক'রে শুধু বলেন: 'হতভাগা ডিম পাড়া মুরগীর মত নৃত্য করছে দেখনা।'

ওর সমগ্র সত্তা সুরের স্বপ্নে ভরপুর। কখনও সে-স্বপ্ন রূপ নেয় একটি বাক্যে—একটি বাক্যেই একটি নিটোল ছবি। কখনও বা সম্পূর্ণ রচনা হ'তেই সুরের আলো বিচ্ছুরিত হয়। তার মধ্যেও আবার বিশেষ বিশেষ অংশ ঐশ্বর্যে অপূর্ব হ'য়ে ওঠে। রচনার গঠন, তার শৈলী যেন সূক্ষ্ম এক আবরণের নীচে অস্পষ্ট হ'য়ে যায়। সেই আবরণের ছিন্ন অবকাশে ঐশ্বর্য নিপুণ ভাস্করের রচনার মত প্রকাশময় হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য মাত্র। এক মুহূর্ত পরেই সব কোথায় মিলিয়ে যায় আবার। কখনও বা সুরের শোভা-যাত্রা বর্ণে বর্ণে, ছত্রে ছত্রে··· রাত্রির দিগ-দিগন্ত একেবারে আলোয় আলো হ'য়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিভা ওর দুষ্টু মেয়ের মত শুধু লুকো-চুরি খেলে। এই দেখা দিল। এই নেই; নেই···নেই দিনের পর দিন দেখা নেই। দেখা নেই, কিন্তু যাবার সময় আপন সুগন্ধটুকু সে হাওয়ায় ছড়িয়ে রেখে গিয়েছিল।

প্রেরণার এত বিপুল আনন্দ, তার কাছে আর সব কিছুর স্বাদ ফিকে

হ'য়ে যায়। অভিজ্ঞ শিল্পীই শুধু জানে প্রেরণা কত দুর্লভ; এবং এও জানে প্রাতিভ জ্ঞানের কাজকে সম্পূর্ণ করে বুদ্ধি। নিজের কল্পনাকেও সে-নিষ্পেষনী যন্ত্রের চাপ দিয়ে তার যত সুধা রস শেষ বিন্দু অবধি নিংড়ে নেয় [প্রয়োজন হলে বিশুদ্ধ জলও মিশিয়ে নিতে আপত্তি নেই]। কিন্তু ক্রিসতফের কাঁচা বয়স, দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস—অসাধু উপায়ে ওর অত্যন্ত ঘৃণা। ও চায় আপনা থেকে স্বচ্ছন্দ ধারায় যা আসবে সৃষ্টির ক্ষেত্রে, একমাত্র তাই হবে ওর সত্য দান। অসম্ভব, অবাস্তব কল্পনা। ও স্বেচ্ছায় চোখে ঠুলি পরেছে, নয় তো দেখতে পেত কতখানি অসম্ভব এ আদর্শ টিকিয়ে রাখা। কিন্তু এ ওর মানস লোকের ঋদ্ধির পর্ব। ব্যর্থতার স্থান নেই এখানে। বিরক্তির সামান্যতম ফাঁকও নেই।

অফুরন্ত মন অফুরন্ত তার উর্বরতা, যা কিছু সেই উর্বর ভূমিতে এসে পড়ে তাই সৃষ্টিময় হ'য়ে ওঠে।

যা দেখে যা শোনে, প্রাত্যহিক জীবনে যা কিছুর সাথে পরিচয় ঘটে, প্রতি কথা প্রতিটি চাহনি অজস্র স্বপ্নের ফসল ফলায়। ওর সীমাহীন মানস-গগনে কোটি কোটি শুভ্র নক্ষত্রের নাচ; জীবন্ত আলোর লক্ষ-কোটি ঝরণা; কিন্তু এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন এক ফুঁয়ে সব কিছু নিবে যায়—সব তারা, সব আলো। এ কালো রাত্রি ও বেশী ক্ষণের নয়; আত্মার সুদীর্ঘ স্তব্ধতায় ছটফট ক'রে মরার অবসর ওর নেই; তবু কি রকম ভয় করে—ওই যে অচেনা শক্তি কেবলি লুকোচুরি খেলছে ওর মনের মধ্যে—এই আসে, এই নেই, আবার আসে—এই একেবারে নেই ...এবারে কতক্ষণ থাকবে এমনি লুকিয়ে? আর কি আসবে না? আসবে না এ কথা ওর অহংকার কিছুতেই মানবে না—আসবে না কি? কোথায় যাবে সে? ও যে আমি গো আমি! এই যে আমি রয়েছি!

ও শক্তি যখন ফুরিয়ে যাবে—সে আমারই ফুরিয়ে যাওয়া। সে-দিন কি আর নিজকে রাখব ভেবেছ? তবু বুকের কাঁপুনি থামে না। কিন্তু ও ভয় নয়, ভয়ের বেশে এসেছে আনন্দ ...

এই আসা-যাওয়ার খেলায় বসন্ত বেলা হয়তো অমনি ফুরিয়ে যাবে না; কিন্তু ক্রিসতফ ভালো ক'রে বুঝেছে, একটা সম্পূর্ণ রচনা সার্থক-সৃষ্টি হ'য়েও উঠবে না যতক্ষণ না ওই পলাতকা স্থির হ'য়ে হৃদয়ের মধ্যে আসন পেতে ব'সবে। ভাবনাগুলো মনের মধ্যে আসে কেমন এলোমেলো; অন্ধকার খনির তলা থেকে যেন ওকে মেহনত ক'রে খুঁড়ে তুলতে হয় ওগুলো। শ্রী-ছাঁদ হীন কিম্ভুত-কিমাকার চেহারা; হুট ক'রে যখন তখন আসে। ও-গুলোকে গুছিয়ে নিয়ে বিচার দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, স্থির চিন্তা দিয়ে কেটে কুঁদে পালিশ ক'রে নিলে তবেই তা কাজের মত হয়। ওর গভীর শিল্পী-মন এই সংস্কারের কাজে হাত না দিয়ে থাকতে পারে না।

মানুষের বোধগম্য ক'রতে গিয়ে আইডিয়ার কিছুটা অদল বদল ক'রতে ওকে হয়ই। কিন্তু সে-কথা কিছুতেই স্বীকার ক'রবে না। নিজকে ও বিশ্বাস করাবেই যে মনের ভেতরে যা ছিল, এতটুকু ছোঁয়নি। তা ঠিক আছে। বাইরে এসেছে শুধু। কখনও বা জোর ক'রে একটা কিছু অর্থ ও তৈরী করে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থ ও কিছুই বোঝে না, অন্তরে সঙ্গীতপ্রেরণা যত প্রবলই হোক না কেন। জীবনের গভীর হ'তে, চেনার পার হ'তে বন্যার মত বিপুল বেগে বুকের মধ্যে যেন সুরের ঢল নামে। কিন্তু সে শুধুই একটা বিপুল শক্তির পদধ্বনি, সে শুধু আপনাকে জানান দিয়ে যায়; এখনও রূপে ধরা পড়েনি, সুষ্ঠু প্রকাশে দানা বেঁধে ওঠেনি। তাই কোন্ পথে যে সে যাবে, সচেতন মন তার নিশানা পায় না। মানব-হৃদয়ের অনুভূতি বিশ্লেষণ ক'রে, শ্রেণীবিভাগ ক'রে লেখায়

ফুটিয়ে তুলতে যায় ; কিন্তু এমনি হয় তার চেহারা যে চেনাই যায় না। কারণ আনন্দ আর বেদনা এক হ'য়ে গিয়ে এক অপূর্ব রস হ'য়ে ওঠে যা বুদ্ধির পরিসীমার উর্ধ্বে ; ফলতঃ তা অবোধ্যই থেকে যায়। বোঝা যাক আর না যাক, এই নূতন প্রকাশ-রূপকে একটা নাম দিতে হয়। এত পরিশ্রম ক'রে মস্তিষ্ক-রূপ মৌচাকের মধ্যে যে যুক্তি-শাস্ত্রটার সৃষ্টি ক'রেছে মানুষ, তা দিয়ে ভাবকে বাঁধতে হয়, নইলে সাধারণ বুদ্ধি খেই পায় না।

ক্রিসতফ নিজকে বোঝাতে চায়, যে শক্তি লুকিয়ে থেকে অন্তরে প্রেরণা জোগাচ্ছে, তার একটা কিছু সুনিশ্চিত অর্থ আছে। এবং সেই অর্থটা ওর ইচ্ছের সাথে যেন মিশে আছে। নির্জ্ঞান মনের গভীরে যে সহজাত-প্রবণতা আছে তা স্বচ্ছন্দ মুক্ত। কিন্তু আজ যেমন তেমন ক'রে চলার পথ পায় না তা। স্ব-প্রকৃতি বিরোধী হ'লেও নির্দিষ্ট একটা ভাবনা নিয়ে যুক্তির পথই খুঁজতে হয়। এই কারণেই ওর মানস-লোক অত বড় শক্তির আধার হ'লেও ওর এই সময়কার রচনা অতি মিথ্যে। সে শক্তির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তা তখনও ক্রিসতফের অজ্ঞাত।

মাথা নীচু ক'রে কেবলি পথ হাতড়ে বেড়ায় ক্রিসতফ। আত্মবিরোধী শক্তির সংঘাতে ও যেন পাগল হ'য়ে ওঠে। ওর কাঁচা হাতের কাঁচা রচনার অসংলগ্ন প্রলাপের মধ্যে বলিষ্ঠ জীবনের বিপুল বেগ নেমে আসে অদৃশ্য উৎস হতে। ক্রিসতফ তাকে ভাষা দিতে না পারলেও গৌরবে-ও আনন্দে হৃদয়ের মধ্যে বহন করে।

ও যে নূতন শক্তি লাভ ক'রেছে এই অনুভূতিই ওর চোখ খুলে দিল। চারপাশের জগৎটার দিকে চোখ মেলে তাকায় ও ; যে সব বস্তুকে পূজো ক'রতে শিখিয়েছে ওকে ওর বাপ ঠাকুরদা, যা ও এত দিন বিনা বিচারে শ্রদ্ধা ক'রে এসেছে, আজ তা বিচার দিয়ে নিরিখের সময়

ওর এসেছে। বেপরোয়া ভাবে নির্মম হ'য়ে ও বিচারের দণ্ড হাতে তুলে নিল। চোখের সামনেকার আবরণ ছিঁড়ে গেল—জার্মানীর মিথ্যে একেবারে বে-আব্রু হ'য়ে ধরা প'ড়ে গেল।

প্রত্যেক জাতির শিল্পের মধ্যে কোথাও না কোথাও ফাঁকি কিছুটা থাকবেই। পৃথিবীর ভাণ্ডারে যা সঞ্চিত হ'চ্ছে, তার অধিকাংশ মিথ্যের মশলায় তৈরী। সামান্যই তার সত্য। মানুষের মন দুর্বল। নির্জলা সত্য তার ধাতে সয় না। ফলতঃ তার ধর্ম, নীতি, রাষ্ট্র, কাব্য, শিল্প সব-কিছুতে খানিকটা মিথ্যের মিশেল না থাকলে কাজ চলে না। স্থান কাল পাত্র হিসেবে মিথ্যের চেহারার হেরফের হয়; জাতীয় চরিত্রের সাথে একেবারে মাপসই ক'রে থাপ খাওয়ান থাকে তা। এই মিথ্যের জন্যই যত ভুল বোঝাবুঝি। পরস্পরের গায়ে কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ি। সত্যের রকম ভেদ নেই। সর্ব ক্ষেত্রেই তা এক। মিথ্যে ক্ষেত্র-বিশেষে আলাদা হয় বটে। প্রত্যেক সমাজের আদর্শবাদ নামে খাস পোষ-মানা কতগুলো বিশেষ বিশেষ মিথ্যে আছে। আমৃত্যু মানুষ ও-মিথ্যের পূজো করে। আমৃত্যু ওই মিথ্যে নিশ্বাস বায়ুর মত মানুষের জীবনের একান্ত ধন হ'য়ে থাকে। ও-শৃংখল ভাঙ্গবার মত বলিষ্ঠ হাতের দেখা মেলে সংসারে কদাচিৎ। দু'চারজন মানুষ, প্রতিভার বরপুত্র যারা, তারাই শুধু জীবনের কোনো মহা-সন্ধিক্ষণে ওই শৃংখল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে। স্বাধীন চিন্তার মুক্ত পথে একলা পথিক হ'য়েই তাকে বেরিয়ে আসতে হয়। অনন্ত আকাশের তলায় সে-দিন কেউ থাকে না তার পাশে।

অতি সামান্য ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে জার্মান কলা-লক্ষ্মীর মিথ্যে মুখোসটা ওর সামনে খ'সে প'ড়ল। এতদিন মিথ্যেটা চোখের সামনে ছিল না ব'লে ও দেখতে পায়নি, একথা বললে সত্যের অপলাপ হয়। বরং বড় বেশী কাছাকাছি ছিল ব'লেই এ অঘটন ঘটেছে। দেখার বস্তু সামনে

থাকাতেই ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেছে। কিন্তু এখন দূরে স'রে আসতেই মিথ্যের ঝাপ্‌সা পাহাড়টা পুরোপুরি দৃশ্যমান হ'য়ে উঠল।

'স্তাদ্‌তিশে' টাউন হলে একটা কনসার্ট এর আয়োজন হ'য়েছে। প্রকাণ্ড হল—দশ বার সারিতে ছোট ছোট টেবিল পাতা প্রায় দু'তিন শ। ঘরের শেষ প্রান্তে মঞ্চ। তার উপরে অর্কেষ্ট্রা সাজান। ক্রিসতফ গেছে শুনতে। ওর চারদিকে লম্বা কালো কোট পরা, গোঁফ-দাঁড়ি চাঁচা, চওড়া গম্ভীর-মুখো সরকারী কর্মচারীর দল; মহিলাদের হাসি গল্পে রীতিমত কোলাহল স্থরু হয়েছে; ছোট ছোট মেয়েরা খুশিতে হাসছে। ওদের দাঁতগুলি ঝলমল ক'রছে সেই খুশির আলোয়। বিশাল-দেহ পুরুষদের দাড়ি আর চশমায় ঢাকা মুখগুলি গোল-চোখ ভালো-মানুষ মাকড়যার মত দেখায়। বার বার হাতের গ্লাস ভ'রছে, আর বার বার অতি নিষ্ঠার সাথে উঠে দাঁড়িয়ে টোষ্ট পান করছে সবাই। গলার সুর মুখের ভাব এমনি বদলে যায় টোষ্ট পান করার সময় যেন "মাস্‌" (mass)এর মন্ত্র প'ড়ছে ওরা। পরস্পরের সামনে ওরা মদের গ্লাস তুলে ধ'রছে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে, ভ'াড়ামী ক'রে মদ খাচ্ছে। ওদের হৈ-হল্লোড় আর গ্লাসের ঠুন্‌ ঠুন্‌-এ অর্কেষ্ট্রার আওয়াজ যায় ডুবে। সবাই চুপ ক'রে থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু চেষ্টাই সার। বৃদ্ধ কনসার্ট-মাস্টারের দীর্ঘ দেহ বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে; সাদা দাড়ির গোছা থুত্‌নী থেকে ঝুলছে ল্যাজের মতো; খাড়া নাকটার ওপর চশমা জোড়া —সব মিলিয়ে লোকটার চেহারা ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতের মত। ক্রিসতফের অতি-পরিচিত নমুনা সব; বহুবার দেখেছে। আজ কেন জানি না এসব ওর তামাসা ব'লে মনে হ'তে লাগল। হয়তো এমনিই হয়। মানুষের ভেতরকার অসুন্দর, দৈনন্দিন জীবনের ক্লেদ বহুদিন চাপা থাকলেও একদিন হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে চোখের সামনে এসে ধরা দেয়।

সেদিনকার প্রোগ্রামে ধর্ম-মূলক, ভাবাত্মক, হাস্য-রসের—নানারকম সঙ্গীতেরই ব্যবস্থা ছিল। বিঠোফেন এর আলাপ অর্কেষ্ট্রায় চমৎকার বাজল। তারপর একদিকে ধর্ম-সঙ্গীত, একদিকে শ্রোতাদের আসরে মদের বোতলের ছিপি খোলার ফট ফট শব্দ। ক্রিসতফের পাশের টেবিলেই ব'সে ছিলেন এক বিরাটকায় ভদ্রলোক। হাসির গানটি স্বরু হতেই শেক্‌সপীয়রের ফলষ্টাফ্‌ এর নকল ক'রে তিনি টেবিল ঠুকে তাল দিতে শুরু করলেন। ব্রাহ্‌মস্‌ আর সুম্যানের 'লাইডার' গাইলেন এক স্থূলকায়া বৃদ্ধা মহিলা, ফ্যাকাশে নীল রং-এর পোষাক পরা, শাদা বেল্ট কোমরে, থ্যাবড়া নাকে সোনার পাঁশনে আটা ; বাহু দুটির রং লাল, এই এতখানি চওড়া কোমর। গলা ছেড়ে গাইলেন। গাইবার সময় চারপাশে তার বাঁকা চোখের দৃষ্টি ঘুরে বেড়াতে লাগল ; হাসির ভাবখানা দেখে মনে হয়, ওর হাসিতে বিশ্ব-ভূবন ভুলে আছে। তার হাবভাব ইসারা অতি কুৎসিৎ ; চেহারাটার মধ্যে একটু ভারিক্কীপনা ছিল তাই রক্ষে, নয়তো গানের আসর কাফে-মজলিশ হ'য়ে উঠত। খর-যৌবনা এক তরুণীর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করলেন তিনি হয়ত কয়েক সন্তানের জননী। আর সুম্যান-এর কাব্যে লাগল খুকুমনির ছড়ার সুর ; শ্রোতার দল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হাততালি দিলে ; কিন্তু দক্ষিণ জার্মানীর গাইয়ে দল ঢুকতেই ওদের হাসি হুল্লোড় গেল থেমে ; ভারী মনোযোগ দিয়ে কান খাড়া ক'রে শুনতে লাগল সবাই। দলে ছিল জন চল্লিশ গাইয়ে। কখনও মিহি কখনও মোটা গলায় ঘর ফাটিয়ে ওরা নিজ নিজ পালার গান গাইলে। রকমারী সুরের কসরৎ—স্বর কখনও উঁচু পর্দায় ওঠে, কখনও ধীরে ধীরে রেশে মিলিয়ে যায়, কখনও হঠাৎ কেঁপে উঠে ছড়িয়ে পড়ে, কখনও সাঁই সাঁই ক'রে ওপরে ওঠে হাউই-এর মত। মনে হয় যেন খালি বাক্স পেটাচ্ছে কেউ ধ'রে। তাল মানের বালাই

নেই। সব মিশিয়ে সে এক অদ্ভুত জিনিষ। মনে হয় যেন শেক্‌সপীয়রের 'বটম' বলছে :

'আমি সিংহ সাজব, শুনছ। এমনি মিহি ক'রে ডাকব মনে হবে ঘুঘুর বাচ্চা ডিম ফুটে চিঁ চিঁ ক'রছে। নয়তো যেন ঠিক নাইটীঙ্গেল ডাকছে।'

ক্রিসতফ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শোনে। শোনে, আর অবাক হয়। কিছুই ওর কাছে নূতন নয়। এই কনসার্ট, অর্কেষ্ট্রা, শ্রোতার দল, সব অতি ভালো ক'রে ও চেনে। কিন্তু আজ সব বড় মিথ্যে মনে হ'ল। এমন কি যা ও সব চেয়ে ভালোবাসত—সুম্যানের 'এগমন্ট ওভারচার'—তার অপূর্ব সুরের খেলা, অতি বিশুদ্ধ তান লয় ও আজ ছলনা ব'লে মনে হ'ল এই মুহূর্তে। অবশ্য আজ রঙ্গ-মঞ্চের ওপরে যে বস্তু পরিবেশন করা হ'য়েছে তা বিঠোফন সুম্যান-এর নামের লেবেল-আঁটা সাকরেদদের হাতের জগা খিচুড়ী। সঙ্গীতাচার্যদের এই রচনাগুলির মধ্যে—শুধু এগুলির মধ্যেই বা কেন, তাঁদের শ্রেষ্ঠ 'কম্পোজিশন'গুলির মধ্যেও ওর মনে হ'ল কি যেন একটা বিসদৃশ কাঁটার মত খচ্‌ খচ্‌ করছে। কই, এর আগে তো কখনও কিছু মনে হয় নি! এ কি? কেন আজই বা এমন ক'রে কাঁটাটা চোখে পড়ল? কিন্তু খুঁজে দেখতে, বিশ্লেষণ ক'রতে সাহস হ'ল না—ওঁরা যে সুরের গুরু! কিন্তু চোখ বন্ধ ক'রে থাকা তো যায় না; একবার যে দেখে ফেলেছে। তা হোক, আর দেখবে না, কখনও দেখবে না; চোখ বন্ধ ক'রেই রাখবে। কিন্তু অসম্ভব! অসম্ভব। হাত তুলে চোখে আড়াল দিতে যায়, পারে না। দেখে চলে যেমন দেখছিল। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে পিশার ভেরগগনোসার মত।

জার্মান শিল্পের স্বরূপ একেবারে খুলে গেল। ছোট, বড়, প্রতিভাবান আর প্রতিভাহীন—সবার রচনার মধ্যেই কেমন একটা পরিতৃপ্তি-ভরা কোমলতা উচ্চারিত। জোয়ারের মত উপচে পড়া আবেগ; নৈতিক

মহত্ত্ব ধারায় ধারায় ঝ'ড়ছে। হৃদয় বিগলিত হ'য়ে বইছে পাগলা-ঝোরার সহস্র-ধারায়। এই প্লাবন শক্তিমানের আসল শক্তিকে ভাসিয়ে নিয়েছে, দুর্বলকে ডুবিয়েছে ঘোলা জলের নীচে। জলের তলায় তলানী হ'য়ে ঘুমিয়ে আছে জার্মান চিন্তাধারা। মেণ্ডেলসহন, ব্রাহ্‌মস্‌, সুম্যান-এর সাধনা। তার পাশেই তাদের পদ-চিহ্ন-বাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীতকার-এর পানসে চোখের ছল-ক'রে কান্নায় ভেজা 'লাইডার'গুলি! বালির ঘর! বালির ঘর! শক্ত পাথর নয়, কাদার ডেলা যত সব। বালখিল্যের অর্থহীন প্রলাপ। আশ্চর্য হ'য়ে যায় ক্রিসতফ। কিন্তু শ্রোতারা কেন বোঝে না? ওর বিশ্বাস হ'তে চায় না। চার দিকে তাকায়, কেবল কতগুলি হাঁ-করা মুখ; গানগুলি ভারী সুন্দর, এবং শুনে ভারী ভালো লাগা উচিত এমনি একটা সুনিশ্চিত ভাব শোনার আগে থেকেই ওদের বোকাটে মুখেচোখে ছাপ-মারা। সুতরাং স্বাধীন ভাবে বিচার করার অধিকার যে তাদের আছে, তা বোঝার পথ নেই।

বড় বড় নাম শুনলেই ওরা ভক্তিতে গদগদ হ'য়ে ওঠে। কিসেই বা ওদের ভক্তি উথলে ওঠে না? প্রোগ্রাম, মদের গ্লাস, সব কিছুই ওদের ঠাকুর দেবতা, নিজের কাছে নিজেরাও। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যা দিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি হবে তাই ওদের কাছে ভালো লাগে।

ক্রিসতফ একবার তাকায় শ্রোতাদের দিকে, আর একবার কান পাতে পরিবেশিত সঙ্গীতের দিকে। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। যেমন শ্রোতা, তেমনি সঙ্গীত, আবার যেমন সঙ্গীত তেমনি শ্রোতা। ক্রিসতফের দম ফেটে হাসি আসে; চাপতে গিয়ে মুখ বাঁকা হ'য়ে যায় ভ্যাংচানোর মত হ'য়ে। যাই হোক, কোনো মতে চেপে রইল। কিন্তু দক্ষিণীরা এসে যখন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে সমস্বরে গাইতে লাগল, ও আর থাকতে পারল না। হোঃ হোঃ ক'রে চীৎকার ক'রে

হেসে উঠল। চারদিক থেকে ক্রুদ্ধ 'শ্‌শ্‌!' 'শ্‌শ্‌!' উঠতে লাগল। পাশের লোকেরা ভয় পেয়ে ওর দিকে তাকায়। তাদের ভয়-পাওয়া, গো-বেচারা মুখগুলির দিকে তাকিয়ে ওর ভারী মজা লাগতে লাগল। আরো জোরে জোরে হাসতে লাগল ও—হাসতে হাসতে কেঁদেই ফেলল একেবারে। শ্রোতারা ভয়ংকর চ'টে গেল। মার মার ক'রে তারা ক্ষেপে উঠল। ক্রিসতফ হাসি চাপতে চাপতে উঠে চ'লে গেল। ছিঃ ছিঃ-তে মুখর হ'য়ে উঠল হল। ক্রিসতফের সাথে তার স্ব-দেশের বিবাদের সূত্রপাত হ'ল এখানে।

এই অভিজ্ঞতার পর ক্রিসতফ আবার ঘরে বন্দী হ'য়ে খ্যাতনামা সঙ্গীতাচার্যদের রচনা পড়তে লাগল মন দিয়ে। দেখল যাঁরা ওর বিশেষ ভাবে প্রিয় তাঁদের মধ্যে অনেকের রচনাই সব চেয়ে বেশী মিথ্যেয় ভরা। শিউরে উঠল ও। প্রথমে ভাবতে চেষ্টা করল ওর নিজেরই ভুল। কিন্তু না ভুল নয়, কোথাও ভুল নেই। অবাক হ'য়ে বলে—এত বড় শিল্পী, তাঁদের রচনায় এমন সাংঘাতিক ফাঁকি! প্রতিভাই বা কোথায়? মিথ্যের খোলস-দেওয়া একেবারে সাধারণ হাতের কাজ যে! নিজের চোখকেই ওর অবিশ্বাস হ'তে লাগল। আর কত দেখবে! পাতার পর পাতা কেবলি মিথ্যের বেসাতি!

যে-সব মনীষীদের ও শ্রদ্ধা করে, তাদের 'কম্পজিশন' প'ড়তে সুরু ক'রল ভয়ে ভয়ে। কি যেন একটা হ'য়ে গেছে, অথবা হবে এমনি একটা অস্বস্তি মনের মধ্যে। কোথাও স্বস্তি নেই। কারো কারো লেখা প'ড়ে ওর বুক একেবারে ভেঙ্গে যেতে চায়। যেন প্রিয়-বিচ্ছেদ ঘটেছে, এমনি বেদনা; যেন কোন অতি বিশ্বস্ত নিকট বন্ধুর গোপন বিশ্বাসঘাতকতার খবর এই মাত্র পেল ও; কান্নায় বুক ভেসে যায়। রাতে ঘুম নেই। অসহনীয় যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করে; নিজেকে ধিক্কার দেয়, ভুল দেখেছে ও,

না বিচারই ক'রতে পারেনি, সে ক্ষমতাই নেই ওর। নির্বোধ, নির্বোধ; একেবারে নির্বোধ। বোধশক্তি কি একেবারে খোয়া গেছে! না না, তা নয়, হ'তে পারে না। ওর চোখের সামনে প্রতিটি দিন কেমন ক'রে তাহ'লে রূপে রসে ভ'রে উঠছে! সূর্যের আলোয় কোথা থেকে দিনের পর দিন এত রং উথলে উঠছে! কেন ওর মন স্বচ্ছতর দীপ্ততর হ'য়ে উঠছে প্রতিটি দিন। জীবনের যে মহোৎসব দিকে দিকে উৎসারিত, তার ঢেউ যে এসে দোলা দিয়ে যায় ওর বুকে গভীরতর প্রেমে। না না হৃদয় ওকে বঞ্চনা করেনি···।

কিন্তু যাঁরা সর্বোত্তম শ্রদ্ধার পাত্র, যাঁদের ও মহত্তম শুচিতম ব'লে জেনে এসেছে—তাঁদের সামনে ও আর আসতে পারলে না বহুদিন। এত দিনের সঞ্চিত বিশ্বাসকে অত বড় কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রতে গিয়ে ও ভয়ে শিউরে উঠল। কিন্তু সত্য-সেবী নির্ভীক যে মানুষ, সে কি পরীক্ষাকে ভয় পায়! যত দুঃখ আসুক, যত আঘাত লাগুক বুকে, সমস্ত পৃথিবীর স্বরূপ দেখবেই সে দুঃসাহসী। সত্য-সেবীর স্ব-প্রকৃতির নির্মম দাবীকে ঠেকাবে কি করে! সুতরাং আবার ও শ্রেষ্ঠতম শিল্পাচার্যদের রচনা খুলে বসল। প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে—কোনো তফাৎ নেই অন্য আরো দশজনের রচনার সাথে। এতদিন আপ্তবাক্যের মত সসম্ভ্রমে যে বস্তুকে শিরোধার্য ক'রে এসেছে, তা আজ সাধারণের সাথে এক পর্যায়ে নেমে এল। চমকে ওঠে ও। আর এগুবার সাহস হয় না। বারে বারে থেমে গিয়ে, বই বন্ধ ক'রে ব'সে থাকে···।

স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়···ধ্বংস-স্তূপের ওপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকে ও। আকুল হয়ে ভাবে, অন্তর-পোষিত এত কালের স্বপ্ন এমন ক'রে না ভেঙ্গে একখানা হাত ভাঙ্গলেও যে ছিল ভালো। বুকের মধ্যে কান্না উথলে ওঠে। কিন্তু রসের যে গভীর সঞ্চয় ওর অন্তরে, প্রাণের যে প্রাচুর্য ওর

সত্তায়, তার দৌলতে স্বপ্ন ভাঙ্গলেও ওর শিল্পী-মন শিল্প-নিষ্ঠা হারাল না। তরুণ বুকের সহজ বিশ্বাস নিয়ে নূতন উদ্যমে আবার নূতন ক'রে ও জীবন সুরু করে। নূতন শক্তি জাগে। হয় তো বা তারি প্রভাবে, হয় তো বা সত্যিকার কারণই রয়েছে—ওর মনে হয় মানুষের হৃদয়াবেগের যে চেহারাটি রূপ পেয়েছে শিল্পে, তার সাথে যেন তার খাঁটি রূপটির মিল নেই কোথাও। অবশ্যি সকলের রচনায়ই এ দুর্দশা ঘটেছে তা নয়। ব্যতিক্রমও আছে বৈকি। ও নিজেই তো ব্যতিক্রম; ওর ধারণা ও-বিষয়ে ওর মুন্সিয়ানা সব চাইতে বেশী। কিন্তু ধারণাটা যে কত ভুল তা ও জানেনা। বুকের আবেগের রং-এ চোখ ওর রঙ্গীন। সেই রঙ্গীন চোখে নিজের হাতের রচনাকে ওর রঙ্গীন লাগে। কিন্তু বুকের মধ্যে যত রংই থাক, ভাষায় তো সূক্ষ্ম তুলির টান ফোটেনা; একেবারে কাঁচা হাতে মোটা তুলিতে রং ধ্যাব্‌ড়ান। কাজেই রং থাকলেও দীপ্তি ফোটে না। যে-সব শিল্পীদের রচনাকে ও একধারে ঠেলে সরিয়ে রেখেছে তাদের মুস্কিলও ওই ভাষায়। গভীর ভাবকে রূপ দেবার প্রয়াস তাঁরা নিষ্ঠার সাথে ক'রে গেছেন, কিন্তু যে-ভাষায় সে-প্রয়াস অভিব্যক্ত হ'য়েছে সে-ভাষা তাঁরাই হয়ত বুঝেছিলেন।

ও মনস্তাত্বিক নয়, এসব কচকচি নিয়ে ঘামানোর দরকার নেই ওর। যা ফুরিয়ে গেছে তো গেছেই। মরা জিনিষকে নিয়ে টানাটানি আর কেন? ক্রিসতফও যৌবনের দৃষ্টি নিয়ে নিজের পুরানো মত গুলিকে আবার ঝালিয়ে নিতে ব'সল। নির্মম অবিচার ঘটে কিন্তু উপায় নেই। দুর্দান্ত যৌবন—একরোখা তার স্বভাব; নিজস্ব বিশ্বাসে সে অটল, স্থির। অতএব সংসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবিচার কিছুটা ঘটবেই। নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠল ক্রিসতফ। যাচাই ক'রতে ব'সে মনীষী-শ্রেষ্ঠদেরও ও ব'লতে গেলে বিবস্ত্র ক'রে, ওলট পালট ক'রে, পাঁতি পাঁতি ক'রে

দেখলে। এতটুকু দুর্বলতার এতটুকু ত্রুটিরও মার্জনা নেই। মেণ্ডেলসহনের রচনা ওর মন্দ লাগে না। বেদনার ঐশ্বর্য অপূর্ব কল্পনার মাধ্যমে অতি চমৎকার রূপ পেয়েছে সত্য ; কিন্তু কোথায় চিন্তার গভীরতা! হাওয়ায় ফোলান বেলুনের অন্তর-শূন্যতা শুধু।

ওয়েবারের লেখায় কোথায় হৃদয়ের স্পর্শ? উত্তপ্ত মস্তিষ্কের গাঁজান ফেনা ছাড়া আর কিছুই নেই ওতে। অভিজাত ধার্মিক মানুষ বটে লিস্‌ৎ কিন্তু শিল্পীর আসন তাকে দিতেই প্রস্তুত নয় ক্রিসতফ—ও লোকটা একটা আধা ক্লাসিকেল ভবঘুরে। ও তো লেখে না সারকাসী ভোজবাজী দেখায়। সত্যিকার আভিজাত্য যতটা, তার ভান ততটাই, বেশ ঠাণ্ডা রকম আদর্শবাদও রয়েছে তার সাথে, আর বাকীটা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ন্যাকামোর ভেজাল। স্যুবার্ট, ওর মতে ভাবালুতায় ভস্‌ ভস্‌ ক'রছে। কারো রেহাই নেই ক্রিসতফের কাছে। মহামানব হউন, স্বয়ং অবতার হউন, মানবরূপী দেবতা হউন আর ধর্মগুরু হউন। এমন কি আগত অনাগত কালের শ্রেষ্ঠ মানব বাখ্‌-এর মধ্যেও ক্রিসতফ দেখেছে মিথ্যার পালিশ করা ফ্যাশন দুরস্ত মুর্খতা ; বহু সময় এঁর রচনাকে মনে হয়েছে ইস্কুল মাস্টারের বক্তৃতা। যাঁরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, জীবনের মধ্যে যাঁরা তাঁর সত্যকে একান্ত ক'রে অনুভব করেছেন, তাঁদের প্রতিও ওর দৃষ্টি সন্দেহ-মুক্ত নয় ; তাঁদের ধর্ম পিপাসাকে ওর মাঝে মাঝে কেমন যেন আন্তরিকতাহীন উচ্ছ্বাস ব'লে মনে হয়। সমস্ত অন্তর পীড়িত হ'য়ে ওঠে। এর মধ্যেও যাঁদের খাঁটি ব'লে ওর মনে হয়েছে, তারাও যেন বন্ধ ঘরের অন্ধকারে ব'সেই লিখে গেছেন—গুমোট গন্ধটা এখনও তাঁদের অক্ষরে অক্ষরে জড়িয়ে আছে—বাইরের আকাশে যে-বলিষ্ঠ উন্মুক্তির সুর, তা বাজে তাদের সঙ্গীতে! ও সুরকে যারা প্রাণের মধ্যে, গানের মধ্যে পেয়েছেন, হয়ত তারা এঁদের মত অত

বড় ওস্তাদ নন, কিন্তু তারা মানুষ, যার ওপরে আর সত্য নেই। বিঠোফন বা হ্যাণ্ডেলের মত হৃদয়বান, স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ। সব চেয়ে ও ব্যথা পায় রচনার কৃত্রিমতায়, বিশেষ ক'রে ক্লাশিকে—সব যেন ফরমায়েসে তৈরী। অতি গভীর ভাব ও সাজোয়া গয়না প'রে, নেহাৎ মামুলি ছন্দের সাজ এঁটে চিরকেলে কলের পুতুল হ'য়ে ওঠে। ক্রিসতফের সমস্ত বুকটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। মাথা দিয়ে আগুন ছোটে। মাপ জোক করা, বড় বড় পরিকল্পনা আর বাঁধা পথের মধ্যে যে রূপটি আছে তা ওর চোখে লাগে না; বরঞ্চ ওর মনে হয় ওসব মিস্ত্রীর কাজ, শিল্প নয়।

কিন্তু তাই ব'লে রোম্যানটিকদের ওপরও কিছু মাত্র প্রসন্ন নয় ও। কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। এত অবাক ও বুঝি কিছুতে হয় না। কিন্তু সব চেয়ে অসহ্য লাগে ওর সঙ্গীত-শিল্পীদের ছলনাকে—মুক্তি ওদের অন্তরে নেই, বাইরে ওরা ভড়ং করে শুধু। স্যুম্যানের মত উদার সংস্কার-মুক্ত হ'য়ে তিলে তিলে দিনে দিনে যারা নিজকে ঢেলে মিশিয়ে দিয়েছে আপন-আপন সৃষ্টির মধ্যে তাদের ওপরেও ওর রাগ ষোল আনার ওপরে আঠারো আনা। এদের মধ্যে যেন ওর নিজের বয়ঃসন্ধির সময়কার উদ্‌ভ্রান্ত দিনগুলির ছবি দেখতে পায়। হয়তো এই জন্যেই এত রাগ। কিন্তু উদার হৃদয় সুম্যানকে আর যাই হোক মিথ্যের অপবাদ দেওয়া চলে ন। অন্তরে যা অনুভব করেন নি এমন বস্তু তাঁর রচনায় স্থান পায়নি কদাচ। এখন ও বুঝতে পারে জার্মান শিল্পের ফাঁকিটা শিল্পীদের দেউলেপনায় নয়, মনটাই মিছে কথা বলেছে এবং মনের মিথ্যে অনুভূতিকে ভাষায় রূপ দিতে ব'সেই হয়েছে যত মুশকিল। সঙ্গীত আত্মার আসল মুকুর। জার্মান সুর-শিল্পী যতই উদার হ'ন, যতই সরল হ'ন, তার সঙ্গীতে জার্মান আত্মার দুর্বলতা, আর গভীরতার অভাব বড়

লুকানো থাকে না ; তার মিনমিনেপনা অনুদার সংকীর্ণতা, তার মেকী আদর্শবাদ, আত্মদর্শনের এবং নিজের মুখোমুখী দাঁড়াবার সাহসের অভাব আরো বেশী প্রকট হ'য়ে পড়ে। এমন কি ওয়াগ্‌নারের মত মহা মহারথীরাই ওই মেকী আদর্শবাদের পূজো ক'রতে গিয়েই শক্তি খুইয়েছেন। ওয়াগ্‌নারের লেখা পড়তে পড়তে ক্রিসতফ রাগে দাঁত কড়মড় ক'রতে থাকে। লোহেনগ্রীনকে ওর মনে হয় একেবারে নির্জলা মিথ্যে। খানিকটা শিভালরির ঝাঁজাল ফেনা, খনিকটা দেখান উচ্ছ্বাস। ওর নায়কের ভয় নেই, হৃদয় ব'লে পদার্থও নেই। রূপে গুণে দেবতা, কিন্তু অনুভূতিহীন, স্বার্থপর পাথুরে দেবতা—নিজের গুণে নিজেই মুগ্ধ, পরম-পরিতৃপ্ত। ওরা পূজো করে কেবল নিজের প্রতিমাকে এবং ওই প্রতিমার বেদীতে বিনা কুণ্ঠায় বলি দেয় অন্যকে। জার্মান ফারিসীর এ চেহারা একেবারে বাস্তবের মাটিতে দেখেছে ক্রিসতফ। "ফ্লাইং ডাচম্যানের" ভস্‌ভসে উচ্ছাস ; তার মধ্যেকার এক ঘেয়ে গুমোট আবহাওয়ায় ও ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে। 'টেট্রালজির' মধ্যেকার পচা প্রেমের দুর্গন্ধে ওর সারা দেহ ঘৃণায় পাকিয়ে ওঠে। শ্রোতাদের ঘটা ক'রে শুনিয়ে শুনিয়ে নায়ক নায়িকারা চীৎকার ক'রে দাম্পত্য প্রেম নিবেদন করেন। বইখানার আগাগোড়া সব মিথ্যে। ধর্ম, পুরাণ, দেবতা, মানুষ সব ওর মধ্যে মিথ্যে আর মেকী। প্রচলিত সংস্কারকে উড়িয়ে দেবার এমন কুৎসিৎ প্রয়াস আর কোনো থিয়েটারে হয়নি কখনও। কিন্তু চোখ, কান, মনকে ঠকান যায় না। মিথ্যে ধ'রে ফেলে নিমেষে। যদি না পারে তবে বুঝতে হবে, ঠকতেই ওরা চায়—এবং হয়তো সত্যি সত্যি চেয়েছিল। তাই জার্মান জাতি ছিঁচকাঁদুনে খুকুর মত তার জঙ্গলী শিল্প নিয়েই ডুবে আছে।

ক্রিসতফই বা করবে কি ! সঙ্গীতের ধ্বনি শোনা মাত্রই ও সম্বিত

হারিয়ে তার স্রোতে স্রোতে ভেসে যায়। শুধু ধ্বনির স্রোতে নয়, সাথে সাথে গায়কের প্রবল ইচ্ছাশক্তির স্রোতও ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বিবশ ক'রে আরো দশজনের মত। না কথাটা মিথ্যে হল; অন্যরা ভেসে গেছে কিন্তু ও ডুবেছে। অমন ক'রে একেবারে ডুবে যেতে বুঝি ওর মত কেউ পারে না। নেচে উঠেছে ওর বুক, হিল্লোল জেগেছে ওর রক্তের ধারায়, তারি জ্বালা আর রাগ দুই গালে ওর ফুটে উঠেছে। শিরায় শিরায়, পেশীতে পেশীতে যেন রণোন্মাদ লক্ষ সেনার মাতামাতি উঠেছে। ক্রিসতফ ভেবেছে, এই বিপুল প্রাণোন্মাদনাকে যাঁরা হৃদয়ে ধারণ ক'রেছেন কালে কালে তাঁরা নমস্য। যত দোষ যত ত্রুটিই তাঁদের থাক না। শ্রেষ্ঠ শিল্পাচার্যদের রচনা ও আবার হাতে তুলে নেয় কম্পিত বক্ষে—তেমনি ক'রে আগের মতই হৃদয় নেচে ওঠে, দুলে ওঠে; সেই আগ্রহ-ব্যাকুল নিষ্ঠা—মরেনি মরেনি—কিছুই যায়নি···যা ও ভাল-বেসেছে, ওর রস-পিপাসু চিত্তের গভীরে শুভ্র শুচিতায় তা জেগে আছে অনির্বাণ। কণ্ঠ ছেপে ওর উল্লাস উথলে ওঠে। যুগাশ্চর্যের পরম অবদান মহাশিল্পীর দক্ষিণ হস্তের দান ও রক্ষা ক'রেছে ধ্বংশ হ'তে। পরম আনন্দের আকর ওরা। আনন্দের এই বিপুল ভাণ্ডার খুলে গেছে ওরই জন্য। এই ঐশ্বর্যগুলিকে বাঁচিয়ে ও বাঁচিয়েছে নিজেকেই। ওরা যে ক্রিসতফেরই প্রাণ-সত্তার অংশ!—ওর দেহের শোণিত, ওর মজ্জা, ওর চেতনার জগৎ। জার্মান সুর-শিল্পীদের ওপর ও কঠিন হয়েছে, রূঢ় হয়েছে। সে মার পড়েছে ওর নিজেরই 'পর। স্যুবার্ট-এর দানের মূল্য ওর মত এমন ক'রে কে বোঝে আর! কে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে হেডন্-এর শুভ্র শুচিতা, মোসার্ট-এর কোমলতা আর বিঠোফন-এর বিশাল বীর্যবান হৃদয়কে? ওয়েবারের গুঞ্জরিত অরণ্যের আশ্রয়কে কে অমন একান্ত ক'রে বুক পেতে নিয়েছে। মেঘ-চুম্বী শির তুলে উত্তর

জার্মানীর সমতল ভূমির বুকে দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতের মত আলোক-চূড় বিশাল গির্জার শীত-নিবিড় যে ছায়াকে জোহান সিবাস্‌শিয়ান স্বরে বেঁধেছেন তার সাথে অমন ক'রে আর কে আপনাকে মিশিয়ে দিতে পেরেছে! কিন্তু ব্যথা দেয় ওদের মিথ্যেগুলি! অন্তঃস্থলে বেঁধে ছুরির ফলার মত। ভুলতে পারে না ও। ওর মতে মিথ্যা জাতির, আর, প্রতিভা শিল্পীর। কিন্তু ভুল করেছে ক্রিসতফ। যে-জাতির জীবন্ত, সতত-বহমান চিন্তাধারা কাব্য ও সঙ্গীতে মহা-স্রোতস্বিনী হ'য়ে ব'য়ে চলেছে—সারা ইওরোপ যার রস-ধারা গণ্ডূষ ভ'রে পান করছে আকণ্ঠ; তার মধ্যে শক্তির পরিচয় যদি কিছু থাকে সেও যেমন সেই জাতির, দুর্বলতা যদি থাকে তবে তাও তার। ভালো মন্দ দুইএরই সমান অংশীদার সে। যে আদর্শের মাপকাঠিতে আজ ইওরোপীয় কাব্য-সঙ্গীতের ধারাকে ও প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারছে না সে সরল শুচিতা ও কোথায় কোন জাতির মধ্যে পাবে?

এ প্রশ্নের জবাব ওর কাছে নেই। ওর প্রথম জীবনে যা কিছুকে সমাদর ও শ্রদ্ধা ক'রে এসেছে আজ সব কিছুর বিরুদ্ধে এক অন্ধ প্রতিক্রিয়া চলছে ওর চিন্তার জগতে। নিজের ওপর ওর রাগের সীমা নেই, কেন অমন ক'রে কিছু বাকী না রেখে একেবারে সব ঢেলে দিয়ে মাটির প্রতিমাকে পূজো ক'রেছে। একটা বয়স থাকে যখন মানুষ অন্যায়ও করতে পারে বীর্য দিয়ে; যেটা উড়িয়ে ঝড়িয়ে দেবার বয়স। অতএব দাও ফেলে যত পচা বাসি সস্তায় কেনা স্তুতি প্রশংসা; যত সত্য, যত অসত্য—অথবা সত্য হ'লেও যা আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা সত্য ব'লে জানিনি—সব অস্বীকার করো। একটি কণা অবধি। শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রতিটি বস্তু থেকে এত মিথ্যে এত অন্ধ কুসংস্কার শিশুর মনে এসে বাসা বাঁধে জীবনের অতি কঠিন সত্যের

সাথে জড়িয়ে, যে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হ'তে হ'লে বয়ঃসন্ধির কালে সব কিছু ডালি দিয়ে একেবারে ঝোলা শূন্য ক'রে নেওয়া চাই।

বিরাট বিক্ষোভে ক্রিসতফের জীবন ভ'রে উঠেছে। কিন্তু এই বিক্ষোভ সুস্থ জীবনের বিক্ষোভ। একটা সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে ও। জীবন-ধর্মে মর্মের গভীর হতে তাগিদ উঠছে, যা আত্মীয় না হ'য়ে তোর জীবনকে পীড়িত ক'রে তুলছে তাকে তুই ডালি দেরে, ডালি দে।

জার্মান কাব্যে, সঙ্গীতের আসল শিথিল ঝিমুনি, কোমলতার নামে একেবারে গলে-পড়া ভাবালুতা ওপর থেকে বেশ লাগে, কিন্তু জার্মান আত্মাকে বালুচরের মত শোষণ করছে অহর্নিশ। সর্বপ্রথম এই ব্যাধিই দূর করা প্রয়োজন।

আলো! আলো! কোথায় আলো! আসুক রুদ্র আঘাত··· শুক্‌ন ঝড়ে যেমন যেমন বৃষ্টি জাল উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি নিঃশেষে উড়িয়ে নিয়ে যাক 'ঘরে ফেরার আকুতি', 'ওড়া', 'একটি প্রশ্ন', 'কেন'? 'ওগো চাঁদ', 'তারার প্রতি', 'ওগো পাখী', 'বসন্ত', 'রবির আলো', 'বসন্ত সঙ্গীত', 'বসন্ত-বাহার', 'ওই এল মধু-ঋতু', 'বসন্ত-বিহার', 'বসন্ত-রাতি', 'বসন্ত-বাণী', 'প্রেমের বাণী', 'প্রেমাশ্রু', 'প্রেমের দেবতা', 'প্রেমের পূর্ণতা','কুসুম-সঙ্গীত','ফুলের ভাষা', 'কুসুম-বন্দনা','মর্ম-বেদনা', 'মর্মরিয়া ওঠে আমার হৃদয়খানি চোখের জলে', ইত্যাদির মত কবিতা আর 'গোলাপে কন্টক যদি নাহি দিতে গো,' 'কে গো তুমি ললনা?' 'বুড়ো ভাতার, তুমি কি মোর ঘর-বাঁধা ছাতার?' ইত্যাদির মত জিজ্ঞাসার আঁস্তাকুড়···উড়ে পুড়ে যাক···যাক যত এঁদো পাঁকের পূতি গন্ধ, পচা কাব্য, পচা গান, পচা ভস্‌ভসে ভাবালুতা, ঘ্যানঘ্যানানী পচা পান্‌সে চোখের জল···সব যাক···সব যাক। কত সুন্দর বিষয় অশুচি হ'য়েছে ওই পাশ-গাদায় প'ড়ে, কত দুর্লভ বস্তু যেখানে সেখানে

যথেচ্ছ ব্যবহারে হ'য়েছে খেলো। সব নিরর্থক, এত শ্রম সব বৃথা! হাটের মাঝে ঢাক পিটিয়ে নিজের উলঙ্গ প্রচারের এই নিরর্থক প্রয়াস কত বড় শোচনীয়! কত শোচনীয় মানুষের শক্তির এত বড় অপচয়! বলার মত কিছু থাকুক আর না থাকুক—তবু মুখের বিরাম নেই··· কেবলি কথা, কথা আর কথা···শ্রান্তি নেই, শুধু কথা। মাথা খুঁড়ে মর—তবু থামবে না ডোবার জলে ব্যাঙের দলের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর গোঙ্গানী।

প্রেমকে যে-ভাবে কাব্য আর সঙ্গীতে বর্ণনা করা হয়েছে তার মিথ্যা চেহারা সব চেয়ে রূঢ় আঘাত দিল ওকে। প্রচলিত প্রেমের কবিতা ও প্রেম-সঙ্গীতগুলি রীতি-সম্মত, যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি, করুণ-রস-সম্পৃক্ত। তার মধ্যে পুরুষের কামনা বা নারীর হৃদয়ের স্থান নেই। কিন্তু এসব কাব্য আর সঙ্গীতের রচয়িতারা জীবনে নিশ্চয়ই কোনো দিন ভালোবেসেছেন। এই কি তাহ'লে তাঁদের ভালোবাসার রূপ! এ কি সম্ভব! না, না মিথ্যে। মিথ্যে! সম্পূর্ণ মিথ্যে! ওরা মিথ্যে কথা বলে। নিজকেও প্রতারণা ক'রছে ওরা। আদর্শ হ'য়ে সমাজের মাথায় উঠে বসবে এই ইচ্ছে ওদের, আদর্শ!···অর্থাৎ জীবনের প্রতি সোজাসুজি খোলা দৃষ্টিতে তাকাবার, বাস্তবকে বলিষ্ঠ হাতে গ্রহণ করার মত ক্ষমতা নেই ওদের। ওরা ভীরু। সর্বত্র···সর্বত্র ওই ভীরুতা। পৌরুষ দিয়ে স্পষ্ট কথা বলতে পারে না ওরা। ভয়ে জুজু হ'য়ে থাকে আর মিথ্যে কথা বলে। স্বদেশী করায়, মদ খাওয়ায়, ধর্মে, সর্বত্র ঘটা ক'রে গুরু-গম্ভীর সাত্বিকতার মুখোস প'রে থাকে। ওদের পান-সঙ্গীত শুধু মদের পাত্র আর পেয়ালার স্তুতি, গদগদ সুরে 'ওগো, অপার তোমার মহিমা' ব'লে।···বিশ্বাসের উৎস আত্মার গভীরে তা অভাবনীয় মুহূর্তের আকস্মিক দান, হঠাৎ-নামা ঝরণার মত। বিশ্বাস হবে ওই

আকাশের মত মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, তবেই তা বিশ্বাস। কিন্তু এদের বিশ্বাস কারখানার তৈরী মাল, হাটে বিকুবার পণ্য। ওদের স্বদেশী সঙ্গীত শুনলে মনে হয় একসাথে রোদ পোয়াতে পোয়াতে ভেঁড়ারা ভ্যাঁ ভ্যাঁ ক'রে চেঁচাচ্ছে। চেঁচাও···খুব চেঁচাও। কিন্তু এমনি গলা ফাটিয়ে মিথ্যে ব'লবে চিরকাল? সব এমনি ক'রে মেকী আদর্শের ভোল চড়িয়ে থাকবে···? তুমি পাগল হবে না! এই মিথ্যে গলার ফাঁস হ'য়ে তোমায় হত্যা করবে না···?

এর পরিণামে আদর্শ নামের ওপর চরম ঘৃণায় ওর মন বিষিয়ে উঠল। মিথ্যে ও চায় না; নিষ্ঠুর হোক, তবু সত্য ভালো। কিন্তু ওর ভেতরটায় তাকিয়ে দেখ—অত বড় আদর্শবাদী মানুষ পাবে না। যার ফলে, এক কালে ও কঠোর বাস্তববাদী হলেও আজ বাস্তব-বাদীরাই ওর বড় শত্রু।

আবেগে অন্ধ ক্রিসতফ। মিথ্যের ঘন কুয়াশায় ওর চারদিকের আকাশ ঢাকা। ওই আবছায়ার আড়ালে আসল ভাব-বস্তু (idea)গুলি ছায়া-মূর্তি প্রেতের মত দেখায়। চেনা যায় না, কোথাও আলো নেই। ক্রিসতফের দেহ মন আড়ষ্ট হ'য়ে ওঠে। সর্ব-সত্বা আকুল হ'য়ে সহস্র হাত বাড়ায় আলোর দিকে।

মিথ্যে, অথবা ওর ধারণায় যা মিথ্যে তার প্রতি অনভিজ্ঞ প্রাণের স্বাভাবিক ঘৃণায় ও বুঝলে না, যে কোন শক্তির আদিম বন্য স্বভাবকে সংযত ক'রে তাকে কল্যাণমুখী ক'রে তুলতে হলে আদর্শের কত বড় প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনকে সামনে রেখে যে-জাতি একটা বড় রকম আদর্শবাদ [ তা যতই অন্তঃসার শূন্য হোক না কেন] গড়ে তুলেছে তিলে তিলে, তারা গভীর ব্যবহারিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। তোমার খুশি মত শুধু কথায় একটা জাতির চরিত্র বদলান যায় না।

ধর্ম, নীতি শাস্ত্র, গুরু, নেতা, দার্শনিক কেউ পারে না। এ অসাধ্য সাধনের মন্ত্র জাতির নিজের হাতে। যে জাতি বাঁচবে বলে পণ ক'রেছে সেই বাঁচে। বহু শতাব্দীর দুঃসহ দুঃখ, আর অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে পুড়ে তার জীবন গ'ড়ে ওঠে।

ক্রিসতফের হাত তবু থামে না। কেবলি সুর রচনা ক'রে চলে। ও অন্যদের দোষ-ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা ক'রেছে। কিন্তু ওর রচনা যে আদর্শ হচ্ছে তা নয়। কারণ ওর ভেতরে সৃষ্টির দুর্বার তাগিদ, সে কি আর বিদ্যা বুদ্ধির বিধান মানে! সৃষ্টির পথ যুক্তির পথে নয়; তার দাবীর জোরে।

কিন্তু তাগিদের জোরেই যে শিল্প-সৃষ্টি সত্য-সৃষ্টি হ'য়ে উঠবে তাও নয়। অধিকাংশ শিল্পীর চিন্তা ও রচনার মধ্যে তাদের প্রকৃতিগত কৃত্রিমতাই প্রতিফলিত হয়। মিথ্যেকে শুধু চিনতে পারলেই সব হ'ল তা নয়। শুধু চেনার জোরেই তোমার সৃষ্টি শুচি হ'য়ে উঠবে না। চাই সাধনা, সুদীর্ঘ দিনের দুঃসাধ্য সাধনা। বহুযুগ ধ'রে যে শৈথিল্য পুরুষানুক্রমে অভ্যাসের ফলে মানুষের প্রকৃতিগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তার প্রভাব এড়িয়ে একালের সমাজে ব'সে একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি শিল্প সৃষ্টি করা শুধু দুঃসাধ্য নয় অসাধ্য। বিশেষ ক'রে যে জাতি বা যে ব্যক্তি বাক্‌-সংযত হ'য়ে আত্মস্থ হ'তে কখনও শেখেনি, মনে যা ওঠে নির্বিচারে পরিবেশন করে শিল্প, সাহিত্য সৃষ্টির নামে, তাদের পক্ষে আরো কঠিন।

ক্রিসতফ খাঁটি জার্মান। সুতরাং বাক্‌-সংযম ওরও শেখা নেই। ওটা ওর কালেরও ধর্ম। কথা বলতে না পেলে ওর বাবাও হাঁপিয়ে উঠতেন। এ অভ্যেস ওর বাবার কাছ থেকে পাওয়া। সুতরাং ও অত্যন্ত কথা বলে, এবং অত্যন্ত চেঁচিয়ে বলে। নিজের এই ত্রুটি সম্বন্ধে ও সচেতন

এবং ওটি পরিহার করবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। ওই চেষ্টা ক'রতে গিয়েই ওর শিল্প-প্রতিভার একটা দিক যেন ঝিমিয়ে গেছে। উত্তরাধিকার-সূত্রে আর একটি সম্পত্তি পেয়েছে ও ঠাকুর্দার কাছ থেকে। মনের কথা ভাষায় সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে তিনি কখনও পারেন নি। ক্রিসতফও পারে না ; এ জন্য অসুবিধার অন্ত নেই। ক্রিসতফের বাবার নাম ছিল গুণী বলে। সুতরাং গুণী হবার সর্বনেশে আকর্ষণের চেহারাটা ওর জানা ছিল। তীব্র আনন্দের আকর্ষণ—প্রায় দৈহিক আনন্দের মত রোমাঞ্চকর। গুণী হ'তে হ'লে কুশল হাত চাই। দক্ষতার একটা আনন্দ আছে, আছে স্বচ্ছন্দ প্রকাশের আনন্দ। অঙ্গ সঞ্চালনের আনন্দ ; শ্রোতাদের মুগ্ধ ক'রে হাতের মুঠোয় পাওয়ার আনন্দ আছে। এ বিপুল আনন্দের আকর্ষণ কম নেশা নয়, তীব্র সুরার নেশা। এ আনন্দ লাভের জন্য যদি কেউ নেশায় মাতে, তা ক্ষমার যোগ্য। বিশেষ ক'রে তরুণ মনে এ আনন্দ অত্যন্ত নির্দোষ শুভ্র আনন্দ ; কিন্তু শিল্প আর আত্মা উভয়কেই হত্যা করে। ক্রিসতফ এ না জানে তা নয়। কিন্তু ও নেশা ওর রক্তেও রয়েছে।

অতএব একদিকে ওর নিজস্ব প্রতিভা আর একদিকে জাতিগত প্রকৃতি এবং তারও ওপরে র'য়েছে অতীতের নিষ্ফলা ঐতিহ্য। এই তিনের চাপে ক্রিসতফ যেন তলানি প'ড়ে থিতিয়ে থাকে। একটা পুরু আবরণের নীচে চাপা প'ড়ে যায়, ভেদ ক'রে ওপরে উঠতে পারে না ও। হাত পা ছোঁড়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে মাথা তুলতে চায়। ভাবে বুঝি এবারে উঠল। কিন্তু অবাক হ'য়ে যায় যে সব দুর্বলতা, মিথ্যা, দোষ, ত্রুটিকে ও পরিহার ক'রতে চায়, আরো বেশী ক'রে সেই গুলোই ওর লেখার মধ্যে ভিড় জমায়। সুতরাং ওর সমস্ত রচনায় সত্যভাষণের সাথে থাকে অতিভাষণ। প্রতিভার পরিচয়ের সাথে জড়িয়ে থাকে

অমার্জিত-বুদ্ধির স্থূল আত্মপ্রকাশ। প্রাণহীন যে জড়তা ওর সমস্ত গতিকে পঙ্গু ক'রে রাখে কদাচিৎ কোনো দুর্লভ মুহূর্তে তার নিগড় ভেঙ্গে ভাস্বর হ'য়ে ওঠে ওর ব্যক্তিত্ব, ওর স্বরূপ।

একা···ক্রিসতফ সম্পূর্ণ অসহায়। ওকে এই পঙ্ক শয্যা হ'তে উদ্ধার করবার মত কোনো মিত্র নেই ওর পাশে। যখনই ভাবে এবার বুঝি উঠল, পা পিছলে তখনই আবার পড়ে। বৃথা প্রয়াসে অন্ধের মত ও চলেছে, সময় ও শক্তির অপচয় ঘ'টছে শুধু। ভাগ্যের নিষ্করুণ পরীক্ষা চলছে ওর ওপর দিয়ে। একটি মুহূর্তের জন্য রেহাই নেই। ওর কাজ হ'য়ে যায় এলোমেলো, চিন্তা বিস্রস্ত। নিজের রচনার ভালোমন্দ বিচার ক'রে উঠতে পারে না। লিখতে ব'সে কি যে লিখছে তার ঠিক থাকে না; সীমফোনী লিখতে গিয়ে লেখে এই এতখানি লম্বা দার্শনিক কবিতা। কিন্তু যে বিভবে ওর মানস তৈরী ওর হাতে ফাঁকী চলে না। খানিকটা লেখার পরেই বিরক্ত হ'য়ে ছেড়েছুড়ে উঠে পড়ে। কখনও হয় তো দন্তস্ফুট করা যায় না এমনি কোনো কাব্য নিয়ে তাকে ওভারচার-এর সুর দিতে বসে, নয় তো অনধিগত অনায়ত্ব যা খুশি তাই নিয়ে উঠে প'ড়ে লাগে। কখনও বা নাটিকার দৃশ্য লেখে। সব মোটা বুদ্ধি বালখিল্যের কাঁচা হাতের ঢিলেঢালা লেখা। গেটে আর সেক্সপীয়র, হেব্বেল, আর ক্রাইষ্টকে আক্রমণ করে অত্যন্ত অশোভন ভাবে। অথচ তাদের ও সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছে। ওর বুদ্ধির অভাব নেই; অভাব মননশীলতার আর সমীক্ষণের; নিজকে নিয়েই ও ব্যস্ত, অপরকে বোঝার সময় নেই। ওর চোখের সামনে বিশ্ব জুড়ে শুধুই ক্রিসতফ···।

বড় বড় রচনা যা সম্পূর্ণ ওর নিজস্ব সৃষ্টি নয় তা ছাড়াও টুকরো টুকরো অনেক লিখেছে—যা প্রতিনিয়ত ওর অন্তরাকাশে যে নব নব ভাবনার আনাগোনা চলছে তারই সৃষ্টি। অন্যান্য ব্যাপারের মত এ

বিষয়েও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে ও বিদ্রোহী হয়ে ও'ঠে। সুম্যান সুবার্ট-এর মত মহাশিল্পীদের স্বহস্তে সুর দেওয়া কাব্য-সঙ্গীতগুলি নিয়ে ও আবার নূতন ক'রে সুর দিতে বসে। স্পর্ধা সন্দেহ নেই। গেটের মত কবি, 'উইলহেল্‌ম্‌ মাইসতার'-এর বীন্‌কার মিননের মত শিল্পীর স্বরূপকে তার নিত্য-নবায়মানতার মধ্যেও ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। কখনও বা পড়ে প্রেম-সঙ্গীত নিয়ে যা শিল্পীদের দুর্বলতা আর শ্রোতাদের বিকৃত-রুচির সংমিশ্রণে অতি অসুস্থ ভাবালুতারই প্রকাশ। ও সেই ক্লেদ ঘুচিয়ে সৃষ্টিকে সুস্থ শুচি মানব কামনার রং-এ রাঙ্গিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। সংক্ষেপে ব'লতে গেলে ওর পণ মানুষ ও তার হৃদয়াবেগ থাকবে মানুষেরই শাশ্বত রসবস্তু হ'য়ে—জার্মানীর ফ্যাশনেবল সমাজের সস্তায় হাসিকান্নার রবিবাসরীয় সান্ধ্য আসর হ'য়ে নয়।

কিন্তু সাধারণতঃ এমন কি প্রতিভাশালী কবিদের কবিতাতেও ও কবিত্ব খুঁজে পায় না ; শুধু কথার তুবড়ী বাজী ব'লে মনে হয়। ওর ভালো লাগে বরঞ্চ সাধারণ আড়ম্বরহীন পুরানো লাইডার, পুরোনো গান ; ঐ সব থেকেই নিজের রচনার বিষয়-বস্তু বেছে নেয় ও ; নূতন সুরে নূতন ক'রে তার নূতন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। কখনও বা বাইবেল থেকে, কখনও বা লৌকিক উক্তি, অথবা হঠাৎ-শোনা কোনো কথা কোনো আলাপ-আলাপন থেকে ভাষা খোঁজে ; কখনও শিশুর জল্পনা থেকে ধ্বনি আহরণ করে। সবই অমার্জিত, গদ্যধর্মী, কিন্তু ভাবে ঐশ্বর্যময়। এই ভাষাকেই অত্যন্ত সহজ ক'রে আপনার ক'রে ও পায়, এবং এত গভীরে ওকে ডাক পাঠায় সে ভাষা, তার খবর ও আগে জানত না। ওর আগেকার রচনায় তার কোন আভাষ পাওয়া যায় নি।

ভালো হোক আর মন্দ হোক ক্রিসতফের রচনা, একই কথা। মন্দের ভাগই হয় তো বেশী—নূতনও নয়, মৌলিকও নয়। কিন্তু প্রাণ-

শক্তিতে পরিপূর্ণ। মন ওর খাঁটি সোনা। লেখা, ভাব ও তার প্রকাশের মধ্যে কোনো ফাঁকি ওর অসহ্য; ঠিক যে মাধ্যমে ওর ভাবটি একেবারে সত্য হ'য়ে উঠবে, নূতন হোক আর পুরানো হোক, ঐটিই ওর আপনার। অনেক সময় ওর লেখায় প্রাচীন আঙ্গিকের সন্ধান মেলে, তার কারণ ওই। অনেক সময় কেন—ক্রিসতফ কোনো দিক দিয়েই মৌলিক নয় —হতে চায়ও না। ওর ধারণা সাধারণ মানুষেরাই মৌলিক হবার জন্য ক্ষেপে ওঠে। মৌলিক হবার কোনো মোহ নেই ওর। ও সত্য হবে। যা ওর মনে উঠবে তাই কণ্ঠ খুলে বলার অধিকার ওর অক্ষত থাক— যা ও ব'লতে চায়, আগে কেউ তা বলেছে! বলুক! কি আসে যায় তাতে। ও আবার বলবে। নূতন অনুরাগে আর রাগে রাঙ্গিয়ে বলবে। এই তো আসল মৌলিকত্ব! অহংকার ক'রে বলবে পৃথিবীর মাটিতে একবারই তো এসেছে ক্রিসতফ; এখানকার লীলা তো ওই একবারই! যৌবনের ঐশ্বর্যে আর দুঃসাহসে ওর মনে হয় পৃথিবী নিত্য নবীন; তার নবীন প্রাণের ভাষাটি একেবারে নূতন, অনুচ্চারিত বাণী। কিছুই আগে বলা হয়নি, করা হয়নি। বিশ্ব ভুবন ওরই পথের দিকে তাকিয়ে প্রহর গুণেছে। যদি বা কোনো কথা বলা হ'য়ে গিয়ে থাকে— সে যে নিত্যকালের প্রভাতে আবার নূতন ক'রে জন্ম নিচ্ছে। অতএব নূতন ক'রে আবার তাকে বলা চাই। ভরা নদীর মত এই যে ওর দুকূল-ভরা জীবন—অনন্তের দিকে বাহু বাড়িয়ে কেবলি ছুটে চ'লেছে সম্মুখের দিকে, তারই দানে ওর চিত্ত উচ্ছ্বসিত, উচ্ছলিত, এক বিপুল অসঙ্গত সুখে বিভোর। ওর মন নিরন্তর দু'হাত তুলে নাচছে—এক বিচিত্র স্বভাব-নন্দিত অবস্থা! বাইরের আনন্দোপচারের প্রয়োজন নেই। ওর বেদনায়ও ওই এক সুরই বাজে। চেতনার উৎস-মূলে প্রাণ-বহ্নির ভাস্বর শিখা জ্বলছে; তারই মধ্যে রয়েছে যত আনন্দ বেদনার মন্ত্র:

ওই আগুনের মধ্যেই রয়েছে চিত্ত-বিভবের শাশ্বত ভাণ্ডার। বেঁচে থাকা···বেঁচে থাকা···জীবনের পাত্রকে একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ ক'রে বেঁচে থাকা। শিল্পী যে সেই বেঁচে থাকার পরম আনন্দকে অন্তরের মধ্যে লাভ ক'রে শক্তির রসে মাতাল হ'য়ে চরম দুঃখের মধ্যেও বুক ভ'রে বলতে পারে, আমি বাঁচবো···বাঁচবো। যে পারে না, সে শিল্পী নয়। শিল্পীর নিরিখ ওই। আনন্দের মত বেদনাও যখন বুকের তলায় রস হ'য়ে দেখা দেয়, সেই তো আসল মহিমা। এ শক্তি দেবতার দান—মেণ্ডেলসোহ্ন আর ব্রাহ্মস্ পাননি তার স্বাদ।

ক্রিসতফ পেয়েছে তা—এবং তাই ওর আনন্দের প্রকাশ স্পর্ধিত। ও ভাবে কিইবা দোষ এতে! তোমরাও এসো বন্ধু! আমার আনন্দের অংশ গ্রহণ করো। অবাক হয়—কেন অধিকাংশ মানুষ এ ঐশ্বর্যে বঞ্চিত হ'য়ে মরে। বঞ্চিত ব'লেই ওদের যত হিংসে; আনন্দ কাঁটা হয়ে ওদের বুকে খচ্ খচ্ ক'রে বাজে। আর বাকীরা, চুলোয় যাক্। তারা খুশি হ'লো কি হ'লো না, তাই নিয়ে ওর মাথা ব্যথা নেই। নিজেকে ও নিঃসংশয়ে জেনেছে। আপনার হৃদয়ের বিশ্বাসে দীক্ষিত ক'রবে বিশ্বকে। ও জয় ক'রবে। ওর পথ জয়ের পথ। সঙ্গীতাচার্যদের সাধারণ দুর্বলতাকে ও নিজস্ব প্রতিভার মানদণ্ডে যাচাই করে নিজের অজ্ঞাতসারেই। এবং ভাবে এই পথেই ওর শ্রেষ্ঠত্ব সংসার মেনে নেবে অতি সহজেই। শুধু ওকে বাইরে আসতে হবে আড়াল ছেড়ে। বাইরে এল ক্রিসতফ, দাঁড়াল এসে সংসারের হাটের মাঝে।

ওর প্রতীক্ষায়ই ছিল সবাই। ক্রিসতফ কোথাও কিছুই অপ্রকাশ রাখলে না। মনের দুয়ার একেবারে খুলে দিলে। জার্মান ফ্যারিসীয়দের চরিত্র ওর জানতে বাকী নেই। কোনো বস্তুরই স্বরূপ ওরা সত্য দৃষ্টি

দিয়ে কিছুতে দেখবে না। খাঁটি বস্তু ওদের ধাতে সয় না। ওরা মেকীর পূজারী। ক্রিসতফ সত্য হ'য়েই থাকবে অন্তরে বাহিরে; কঠিন আপোষহীন পণ ওর; ক্ষমা নেই নিজকেও।

বাড়াবাড়ি না ক'রে ও কিছুই ক'রতে পারে না। সত্য হওয়ার আড়ম্বরটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের হ'য়ে উঠল। মানুষকে অপমান করে, গাল দেয়। ও ভাবতেই পারে না, এতে অবার কেউ চটতে পারে। আধুনিক কালের অতি-বিখ্যাত কতগুলি প্রেমের কবিতার গলদ আবিষ্কার ক'রে, পেশাদার অপেশাদার যে ওস্তাদের সাথেই দেখা হয়, ডেকে ডেকে শোনায় তার কাহিনী। পরমোৎসাহে হতভাগ্য কবির জন্য অদ্ভূত অদ্ভুত শাস্তির ব্যবস্থা করে। প্রথমে তেমন আমল পায় না; সবাই ওর পাগলামীতে হাসে। কিন্তু ক'দিন না যেতেই বুঝতে পারে সবাই, ক্রিসতফ-এর হাতিয়ার উঠেছে ওদের মাথা লক্ষ্য ক'রেই। এবং আক্রমণের পদ্ধতিটাও বিকৃত রুচির পরিচয় দেয়। ক্রমে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে ক্রিসতফ এক বিপরীত বিশ্বাসের জগতে বাস ক'রছে। আগের মত অত হাসি পায় না আর কারো। কনসার্ট-এর আসরে দাঁড়িয়ে ও চীৎকার করে, বাঁকা ভাষায় টিপ্পনি কাটে; অথবা একেবারে খোলাখুলি-ভাবেই বিশ্ব-ভুবন-খ্যাত সঙ্গীত-গুরুদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ করে।

ছোট্ট শহর। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা পাঁচকাহন হ'য়ে। গত একটা বছর ধ'রে ভারী বাড়াবাড়ি ক'রছে ছেলেটা। মানুষ আগুন হ'য়ে আছে। য়্যাডার সাথের কেলেঙ্কারী ও তার পরিণাম ভোলেনি কেউ। অবশ্যি ও নিজে ভুলে গেছে। ওর আর কি! যে দিন গেল একেবারেই গেল; মনের কোণ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্নে মুছে গেল বিগত দিনের কাহিনী। আজের ক্রিসতফ আর দু'মাস আগের ক্রিসতফ যেন একেবারে দুটো আলাদা মানুষ। কিন্তু ও ভুললেও জন-সমাজ ভোলেনি।

ক্ষুদ্র শহরের সংকীর্ণ পরিবেশে সবাই সবার দোষ-ত্রুটি স্খলনের চুলচেরা হিসাব রাখে, না রাখলে কর্তব্যচ্যুতির প্রত্যবায় ঘটে। কেউ কখনও ভোলে না। সুতরাং চলতি রীতি অনুসারে, ওদের হিসেবের খাতায় আগেকার গুনাহ্‌গারীর সাথে এবারকার এই ব্যাপারও গাঁথা হ'য়ে গেল। আগের ইতিহাসের মধ্যেই ওর এবারকার ব্যবহারের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। সেই যে ওর নীতিবোধে আঘাত লেগেছিল—এবারে যখন ওর শিল্পাদর্শে ঘা লাগল, পুরানো ঘা নূতন ক'রে কাঁচা হ'য়ে উঠল। ওদেরই মধ্যে কেউ একটু নরম সুরে বলে : 'নাম চাইছে ছেলেটা।'

কিন্তু আর সবাই বললে : 'বদ্ধ পাগল। বদ্ধ পাগল।'

একেবারে খোদ গ্র্যাণ্ড-ডিউকের ঘরের কথা, সুতরাং আরো ডালপালা মেলে, আনাচ কানাচ অবধি ছড়াল। আর একটা কথাও ঘুস্‌-ঘুসিয়ে উঠছিল—কথাটা আরো সাংঘাতিক। চাকুরী হিসেবেই গ্র্যাণ্ড-ডিউকের প্রাসাদে বাজাতে যেতে হয় ওকে। কিন্তু মালিককে নাকি গ্রাহ্য করে না ও। ডিউক-পত্নীর প্রিয় ওস্তাদদের নাকি গাল দেয় ও ডিউকের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে। মেণ্ডেলসোহ্‌নের 'ইলাইজাকে' ও বলে পুরুত ঠাকুরের বুক্‌নী। স্যুমান-এর লাইডারকে বলে পাঁচালী। কি সাহস! বাপরে বাপ। ডিউক তো রেগে লাল—ধমকে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন ডিউক :

'থামোহে ডেঁপো ছোকরা। কথা শুনে মনে তো হয় না যে জার্মানীর মাটিতে জন্মেছ।'

স্বয়ং গ্র্যাণ্ড-ডিউকের মুখের কথা! বড় ঘরের বড় কথা পৌঁছুল গিয়ে মাটির তলা অবধি। চটা মানুষের দল আর হিংসুকের দল, আর কোনো ব্যক্তিগত কারণে যাদের বিরাগ ঘটেছে, তারাই খুশি হ'য়ে হাততালি দিলে : ঠিক ঠিক, কে বললে ওটা জার্মান! জার্মান রক্ত

দেহে থাকলে আর অমন কথা মুখে আসে! বেশ নাকি মনেও আছে সবার ছেলেটার পূর্বপুরুষ এসেছিল বেলজিয়াম থেকে। সুতরাং বিদেশীটার বুকে এ দেশের ভালো সইবে কেন?

এই দার্শনিক প্রতিহিংসার আগুনের ইন্ধন জোগায় ক্রিসতফ নিজেও। সমালোচনা যে সইতে পারবে না—সমালোচনা ক'রতে যাওয়াও তার ঠিক নয়। ও যদি আর একটু বেশী চালাক এবং অত সরল না হতো তবে স্পষ্ট ভাষায় সোজাসুজি গাল না দিয়ে একটু মুখ চেপে বলত। বড়দের ওপর আর একটু সম্মান দেখাত। কিন্তু একগুঁয়ে ছেলে কিছুতে কি বুঝবে? বলে কিনা, ঢাক ঢাক গুর গুর কিসের আবার! নিগু'ণকে নিগু'ণ বলেছে। মিথ্যে তো বলেনি! নিজের ক্ষমতা আছে, সে ক্ষমতাকে ও দেখেছে; তাই বুকে জেগেছে আনন্দের ঢেউ; মাতাল ঢেউকে ও দু'হাত দিয়ে ঠেকায়নি; দু'হাতে ও বিলিয়েছে সবাইকে। আনন্দ হয়েছে, দু'হাত তুলে নাচবে। এর মধ্যে লুকোচুরি কেন? লুকুতে ও জানে না। ছোটবেলা থেকেই এমন দরদী বন্ধু ওর কেউ নেই যার কাছে ও বুকটাকে একেবারে খুলে দিতে পারে। সেইজন্য ওর স্বভাব অন্তর্মু'খী। সম্প্রতি আগল ভেঙ্গে মনটা ছুট মারতে চাইছে উধাও হওয়ার পথে। এত আনন্দ ওর ওই টুকু বুকে আর ধরে না। দু'হাতে সবাইকে বিলিয়ে দিতে না পারলে ওর বুক ফেটে যাবে। মন খুলবার মত বন্ধু নেই—সুতরাং ওর অর্কেষ্ট্রায় সহকর্মী দ্বিতীয় তাল নির্দেশক সীগমণ্ড ওথ্ ওর একমাত্র অবলম্বন। মন্দ নয় লোকটা এমনিতে। ভয়ংকর ধূর্ত। ক্রিসতফের নামে ভক্তিতে গদগদ তবে ভক্তিটা অতি-ভক্তি। ক্রিসতফ ওকে অবিশ্বাস করে না একটুও। অবিশ্বাস করলেই বা কি। কি ক'রেই বা জানবে লোকটা বিষকুম্ভ। এবং ভক্তিটা শুধু ওপরকার মধু। এমন লোকের কাছে মন খোলার বিপদ আছে।

ক্রিসতফ ভাবে ওদের সবাইর ওর ওপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ; যা কিছু ও ক'রছে তা তো ওদের জন্যই ! ওর সৃষ্টি শত্রু মিত্র, সবার ঘরে আনন্দ বিলায়। কিন্তু ও জানে না, অনভ্যস্ত সুখ গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে কঠিনতম কাজ। চরম দুঃখ হ'লেও মানুষ পুরানোকেই আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চায়। যে খাদ্য যুগ-যুগান্তর ধ'রে চর্বিত-চর্বন হ'য়ে আসছে তাই ওদের ধাতস্থ ; কিন্তু সুখ যেমনই হোক ওরা কারো কাছ থেকে হাত পেতে নেবে না তা। অপরের কাছে সুখের ঋণ ওরা সইতে পারে না। ওটা অপরাধ ; ক্ষমার অযোগ্য। বড় রকম মূল্য দিয়ে তবে অনেক সময় তার নিষ্কৃতি।

সুতরাং সহস্র কারণে ক্রিসতফ নিজে এগিয়ে গেলেও, ওকে দূরেই থাকতে হ'ল। সীগমণ্ড ওখ্‌ও ওকে দূরে দূরেই রাখল। প্রথম কারণ প্রধান অর্কেষ্ট্রা মাষ্টার-এর কাজ থেকে অবসর নেবার সময় হয়েছে। তিনি গেলে বয়সে কম হলেও ও পদটা পাবার ষোল আনা সম্ভাবনা ক্রিসতফের। ডিউক স্বয়ং ওর পক্ষে, সুতরাং ক্রিসতফই এ পদের যোগ্য ব'লে নির্বাচিত হবে, একথা ওখ্ জানলেও মানে না। নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা উঁচু। ভাবে আগ বাড়িয়ে গিয়ে ও দহরম-মহরম ক'রতে পারেনি, নিজকে দৃশ্যমান ক'রে তুলতে পারে নি। সেইজন্যই হয়ত কেউ ওকে চিনতে পারেনি—নইলে ক্রিসতফের চাইতে ও যে ছোট নয় যোগ্যতায় তা চাপা থাকত না। সুতরাং সকাল বেলায় ও থিয়েটারে আসে, ক্রিসতফের উচ্ছ্বাস শোনে হাসি চাপতে চাপতে ; প্রাণপণ চেষ্টা করে গম্ভীর হ'তে—কিন্তু শত চেষ্টা সত্বেও হাসি ফেটে পড়ে। ঠাট্টার সুরে বলে :

'কি হে, আরেকটা মাষ্টার-পীস নাকি ?'

ক্রিসতফ এগিয়ে এসে হাত ধ'রে বলে : 'ঠিক বলেছ বন্ধু ! এটাই

সব থেকে ভালো হয়েছে—আমার সব রচনার চাইতে ভালো।… একবার যদি শোনাতে পারতাম। যাকগে ছাই…বড় চমৎকার! এত ভালো আমার হাত দিয়ে আর বেরয়নি এপর্যন্ত। বেচারা শ্রোতারা! কিন্তু ভগবান রক্ষে করেছেন। এ পালাটা শুনলে সব শুধু মরবার জন্য ছট ফট্ করত। আর কিছু চাইত না শুধু মরতে চাইত, বুঝলে!'

কান পেতে শোনে সীগমণ্ড। ক্রিসতফের ছেলেমানুষী উচ্ছ্বাসে হাসে, ধমকায় না তাকে; নিজেই ওর সাথে সমান তালে যোগ দেয়। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গটা ক্রিসতফের চোখে পড়ে না। কথায় কথায় ভুলিয়ে ওকে ক্রমেই ফুলিয়ে তোলে। ক্রিসতফ ওর সঙ্গীতের ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দেয়। সীগমণ্ড এমনি বিকৃত ক'রে ওর কম্পোজিশন গেয়ে দিয়ে চ'লে যায় যে রচনাটাই বিশ্রী শোনায়। চারপাশের গাইয়ে বাজিয়েরা হাসে। ওদের মুখ উসখুস করে টিপ্পনী কাটার জন্য। কিন্তু কি টিপ্পনী আর কাটবে—যা করার ওথ ইসারায় সব ক'রে রেখে গেছে।

যাই হোক একদিন পাদপীঠের আলোয় এসে দাঁড়াবার সনদ পেল ওর রচনা। ক্রিসতফ হেব্বেলের 'জুডিথের' ওপর রচিত ওভারচারটি বেছে নিল। এইটেই ওর সব চেয়ে ভালো কম্পোজিশন। জার্মান সঙ্গীতের একঘেয়ে কাঁদুনে সুর শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে 'জুডিথের' বন্য উদ্দামতায় মুগ্ধ হ'য়েছিল ও একদিন; ক্রমে ক্রমে ফিকে হ'য়ে আসছে সেই মোহ— সহজ বুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছে, সর্ব অবস্থায়ই প্রতিভা-বিকাশের এ পথ কৃত্রিম পথ। গাল-ভরা নামের একটা সীমফোনীও জুড়ে দিয়েছে সাথে। ওথ্-এর গানও দু'চারটি আছে—জিনিসগুলি খুব একটা কিছু নয়, মাঝারী স্তরের জেনেও ক্রিসতফ নিজে থেকেই ওথ্‌কে ডেকে এনেছে। সব জড়িয়ে মোটামুটি একটা সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন।

রিহার্স্যাল-এর সময় বিশেষ মুস্কিল হয়নি। অবশ্যি কনসার্ট-এর

বাজিয়েরা বোঝেনি কিছুই। তারা অমনিই বাজিয়ে যায় গৎ সামনে রেখে। ভাবে, 'অবাক হয়ে এ কেমন ধারার কনসার্ট? এ সুর কোত্থেকে আমদানী ক'রল ছেলেটা! প্রকাশ্যে বলেনি কিছু—বলার সুযোগ বা সময়ও হয়নি। তা ছাড়া রায় দেবে জনসাধারণ, তার আগে কিছু বলার অধিকার এদের নেই। ক্রিসতফের নিজের মনে কোনো সংশয় নেই। ওর গভীর আত্ম-বিশ্বাসের প্রভাবে শিল্পীরা জার্মান-অর্কেষ্ট্রা-শিল্পীদের প্রকৃতি অনুসারে অত্যন্ত শৃংখলানুগ রয়েছেন। অতএব বিষয় বস্তু যেমন হোক, ভালো লাগুক, আর মন্দ লাগুক নিঃশব্দে তারা বাজিয়ে যায়। গোলমাল বাঁধল যা কিছু গায়িকাকে নিয়ে। ইনি টাউন-হলের অর্কেষ্ট্রার সাথে যুক্ত। সারা জার্মানীতে খুব নাম ডাক। অতএব গুমর বেশী। ফুসফুসের জোর আছে। গান শিখেছেন ওয়াগনারীয় পদ্ধতিতে—অতএব উচ্চারণ অতি স্পষ্ট; বেশ ফাঁক দিয়ে দিয়ে বিলম্বিত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ; স্বরের উচ্চারণগুলি বিস্ফারিত-বদন শ্রোতাদের ওপর আছড়ে পড়ে গদার মত। এদিক দিয়ে ওয়াগনারীয় পদ্ধতি গর্ব ক'রতে পারে। শ্রীমতী কুশল হাতে এ অস্ত্রটি আয়ত্ত্ব করলেও স্বাভাবিক হবার কলাটুকু শেখেননি। ওঁর উচ্চারণের কোনো ভুল নেই—কোথাও জড়তা বা অস্পষ্টতা নেই; কিন্তু নেই গতিও। বাণী যেন শৃংখলিত পায়ে বোঝার বিষম ভার কোনো মতে টেনে টেনে চলেছেন। প্রতিটি চরণের শেষে পৌঁছেই সে এক করুণ-রসাত্মক ব্যাপার। ক্রিসতফ মিনতি ক'রেছে বারংবার: অভিনয় করার ক্ষমতা তোমার আছে, তাকে সম্মান করি; কিন্তু অভিনয় এখানে নয়। প্রথম প্রথম কোন গোলমাল হয়নি। যা বলা হয়েছে, সে বিনা আপত্তিতে শুনেছে। কিন্তু দরাজ কণ্ঠকে লাগাম ক'ষে রাখবে আর কতক্ষণ? ক্রিসতফ অধীর হ'য়ে ওঠে। সইতে না পেরে মহিলাকে বাঁকা বাঁকা কথা

বলে ও খোঁচা দেয়। অপমানে ওপক্ষের মুখ থম্‌থম করে। হবারই কথা ; তিনিও শুনিয়ে দিয়েছেন : 'ভগবান-এর কৃপায় গানের দু' অক্ষর শিখেছি। বড় বড় জ্ঞানী গুণীদের আসরে গান গেয়েও থাকি মাঝে মাঝে। এই সেদিনও তো আচার্য ব্রাহ্‌মের সামনে তাঁরই একটা লাইডার গেয়ে শুনিয়ে এলাম। মনে তো হল না একটুও খারাপ লেগেছে তাঁর।'

'সে তো আরো সর্বনাশ!'

চেঁচিয়ে উঠল ক্রিসতফ।

'অনুগ্রহ ক'রে শ্রীযুক্ত ক্রিসতফ বুঝিয়ে দিন তাঁর বক্তব্যের অর্থটা।' ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি নিয়ে শ্রীমতী বলেন। ক্রিসতফ বলে—ব্রাহম্‌স্! স্বাভাবিক হওয়া যেন ছেলে খেলা! অনেক নাম? লোকে ওকে যত তারিফই করুক চোখ কান থাকলে বুঝত সে ও প্রশংসা নয়, গালের বাড়া গাল। ঠিকই বলেছেন শ্রীমতী, ভদ্রতা জানে না ক্রিসতফ। কিন্তু তবুও অত বড় শক্ত কথা ওর মুখ দিয়ে বেরুত না কখনও। শ্রীমতী বলালেন, কি করবে ও?

বাক্-যুদ্ধ চলতে লাগল এমনি ক'রে। শ্রীমতী গাইবেন খুশিমত নাটকীয় সুরে। ক্রিসতফ একদিন আর সইতে না পেরে শক্ত ক'রে বলেই ফেললে : 'দেখুন আপনার যা অভ্যেস হয়ে গেছে তা তো আর বদলাবে না। লাইডারটির ঠিক সুর হচ্ছে না। সুতরাং ওটা বাদই দিয়ে দিলাম।'

এদিকে কনসার্ট মঞ্চস্থ করবার দিন প্রায় এসে গেছে। লাইডারটির ওপরেই যা ভরসা ছিল। ওটাই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রাণ। শ্রীমতী ইতিমধ্যে অনেককে শুনিয়ে রেখেছেন যে উনি গাইবেন লাইডার। লাইডারের কতগুলি জায়গা নাকি ভারী চমৎকার। সঙ্গীতের ভালো

মন্দ বিচার করার মত বিদ্যা ওর যথেষ্ট আছে, তবু এত বড় অপমান! কিন্তু চুপ ক'রে রইল, কারণ এই অনুষ্ঠানে তরুণ-শিল্পীর ভাগ্য নির্ণয় হবে। কোন দিক দিয়ে হবে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অতএব উদীয়মান নক্ষত্রের সাথে বিবাদ না করাই প্রশস্ত। ক্রিসতফের সব কথা নত মস্তকে মেনে গেল। এখন তো চলুক। আসল দিনে দেখা যাবে। ও নিজের ইচ্ছামত গাইবে সে-দিন, মনে মনে মৎলব আঁটল।

আজ অনুষ্ঠান। ক্রিসতফের একটুও ভয় ক'রছে না। ও বুঝতে পারছে কতগুলি জায়গা ভালো হয়নি। মানুষ হাসবে। কিন্তু তাতে আর কি? একেবারে খুঁৎ থাকবে না তাই কি আর হয়? শত ভালো লেখাতেও কিছু খুঁৎ থাকে। সভ্যতা, ভব্যতা, বিনয়, ভালোমানুষী, সব সমাজের মিথ্যে পালিশ; তার তলায় আসল মানুষটা চাপা প'ড়ে থাকে। সুতরাং সত্যের একেবারে গোড়ায় পৌঁছুতে হ'লে ঘা দিতে হবে ওই খোলসটার ওপরে। কাউকে ঘা দেবে না অথচ প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রবে, এই যদি হয়—তবে চিরজীবন ভালো ছেলের মত পুরানো পথে গড়িয়ে আর জনতাকে ধাতের উপযোগী সত্যি মিথ্যের মেশান পিটুলী গোলা খাইয়ে খুশি থাকাই ভালো। সারা জীবন হাতে পায়ে শেকল বেঁধে বন্দী থাকবে বন্দীশালায়। যে-মানুষ এ বন্দীশালা ভাঙবার মত বুকের জোর রাখে—সেই বড়। ক্রিসতফ দুনিয়ার এই মিথ্যা দিগ্ দারী পায়ে দ'লে চলবে। সবাই ওকে ছিঃ, ছিঃ ক'রবে, করুক; তবু বোঝা যাবে যে ওরা পাথর নয়। ছিঃ ছিঃ ক'রতে গিয়ে তবু তো একটু নড়বে ওরা। এটুকুই ভরসা ক্রিসতফের। ও দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে ওর দুঃসাহসী হাতের রচনা শুনে বন্ধুবান্ধবদের মুখ বাঁকা হ'য়ে উঠছে। কড়া সমালোচনা হবে ও বেশ বুঝতে পারছে।

হোক। হেসে উড়িয়ে দেবে ও। এখনই তো ওর হাসি পাচ্ছে।

আর যাই বলুক, নিন্দে প্রশংসা যা খুশি করুক, এ যে দুর্বল হাতের লেখা নয় তাতো স্বীকার ক'রতে হবে। নইলে বুঝতে হবে ওরা অন্ধ, কালা ; সত্যকে অস্বীকার করবার জন্যই ওরা চোখ কান বন্ধ ক'রে রেখেছে। ভালো লাগা! নাই লাগল। শক্তি আর তেজ। বাস্... আর কিছু না...বিপুল শক্তিতে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যেমন ভাসিয়ে নেয় রাইনের প্রবল স্রোত...

আর এক দিক থেকে ও ভারী দমে গেল। গ্র্যাণ্ড ডিউক এলেন না। রাজকীয় আসনে কেবল ছিলেন দরবারীদের দল আর কয়েকজন মহিলা। ক্রিসতফের মন বিগড়ে গেল। মনে মনে বললে: 'গাধাটা আমার উপর চটেছে। আমার সঙ্গীত বুঝবার মুরোদ আছে? ভয় পেয়েছে পাছে ভালো ব'লতে হয়।' কিন্তু বাইরে কিছু দেখালে না। এমন কি ডিউক না আসাতে ওর যে মনে লেগেছে তাও বুঝতে দিলে না কাউকে। কিন্তু সবার চোখেই ডিউকের অনুপস্থিতি অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে প'ড়েছে। শিক্ষা হ'লো। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সূচনাতেই এত বড় আঘাত।

জনসাধারণের আগ্রহও গ্র্যাণ্ড ডিউকের চাইতে বেশী বলে মনে হ'ল না। হল্-এর এক তৃতীয়াংশই খালি প'ড়ে। ওর মনে পড়ে ছোট বেলায় যখন কনসার্টএ যেত—হলে তিল ধারণের জায়গা থাকতো না। আর আজ! মনটা তেঁতো হ'য়ে ওঠে। অবিশ্যি আর একটু অভিজ্ঞতা থাকলে আজ মোটেই অবাক হতো না। মন্দ জিনিসের চাহিদাই সংসারে বেশী। ভালো কনসার্টএ সাধারণ লোকের আগ্রহ কমই থাকবে স্বাভাবিক নিয়মে। জনসাধারণের আকর্ষণ সঙ্গীতে নয়। সঙ্গীত-শিল্পীদের ওপর। তাদের দেখতেই আসা। তার ওপরে একটা বালখিল্য যখন শিল্পীর ধরা-চূড়া পরে রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ায় শহর-সুদ্ধ লোক ভেঙ্গে

পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি! মানুষের কৌতূহলের কাছে আলস্য ভেসে যায়!

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ক্রিসতফ—যদি আরও লোক আসে। কিন্তু আর কেউ এল না। হল তেমনি খালি। আরম্ভ ক'রতেই হয়। মনকে বললে, এই তো বেশ! গুটি কয়েক বাছা বাছা সুহৃদ থাকবে, যারা দরদ দিয়ে শুনবে শোনার মত ক'রে। সেই ভালো; সঙ্গীত তো হাটের জিনিস নয়। কিন্তু এই শুকনো সান্ত্বনা বেশীক্ষণ টিকল না।

আলোকিত মঞ্চের উপর ক্রিসতফের রচিত সঙ্গীতের অনুষ্ঠান চলেছে। নিস্তব্ধ হল্। প্রীতি-ভরা গভীর হৃদয়ের একাগ্রতার স্তব্ধতা নয়…এর মধ্যে যে কিছু নেই…প্রাণ নেই, প্রীতি নেই, শুধু শূন্যতা। মহা-সুষুপ্তি। সঙ্গীতের প্রতিটি ধ্বনি ঔদাস্যের অচলায়তনে ঠিকরে শূন্যতায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

শ্রোতাদের দিকে পিছন ফিরে অর্কেষ্ট্রা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ক্রিসতফের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে ধরা প'ড়ছে হলের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। এ প্রকৃত সঙ্গীত-শিল্পীরই বিধি-দত্ত ক্ষমতা। সঙ্গীত শ্রোতাদের মনে কোন ঢেউ তুলল কিনা শিল্পীর অনুভূতির তন্ত্রীতে তার খবর বাজে। কনসার্ট-এ তাল দিতে দিতে ওর সর্ব-শরীর উত্তেজনায় ঝন্ঝনিয়ে ওঠে। কিন্তু পেছনকার বক্স এবং ষ্টল থেকে ওঠে ঔদাস্যের তুষার-বাষ্প। ও যেন মুহূর্তে জমে ওঠে। দেহের পুলক শিহরণ, শোনিতের উল্লোল নৃত্য থেমে যায়…

'ওভাচার' শেষ হয়। হাততালি বাজে। নিষ্প্রাণ…শুধু ভদ্রতার হাততালি। তারপর আবার সব চুপচাপ। একটু ছিঃ ছিঃও না-হয় করতো! একবার…অন্তত একটিবার, বেশী না হয়, একটিবার ধিক্কার দিত! অথবা আরও সাংঘাতিক কিছুই না হয় করত, যাতে ওদের

যে প্রাণ আছে, ওরা যে মৃতদেহ নয়, বেঁচে আছে, ওর সঙ্গীত শুনে ওদের মধ্যে এতটুকু প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা বোঝা যেত।…কই কোথাও তো কোনও চঞ্চলতা নেই…! শ্রোতাদের দিকে চায়। তারা পরস্পরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করে, পরস্পরের মন ও মত বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু বোঝা যায় না কিছু। কোনো মুখে কোনো বিকার নেই। আবার ঔদাস্যে ঝিমিয়ে পড়ে শ্রোতারা।

সীম্‌ফোনী চলে, ক্রিসতফের মনে হয় ও যেন আর কিছুতেই শেষ পর্যন্ত ঠেলে চলতে পারবে না। কতবার ইচ্ছে হয়েছে হাতের তাল-নির্দেশক দণ্ডটি ছুঁড়ে ফেলে ও পালিয়ে যায়। এ বিরূপতা কেন ওদের? ওর মন মুহ্যমান হয়ে পড়ে। কি বাজছে যন্ত্রের তারে তারে কিসের তাল দিচ্ছে ও? কিছুই বুঝতে পারে না। যন্ত্রের মত হাতের দণ্ডটা ওপরে নীচে চলে, ডাইনে বাঁয়ে ওঠে আর পড়ে, নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে। মনে হয় অতল অবসাদের তলায় ও তলিয়ে যাচ্ছে। কতকগুলি জায়গায় শ্রোতারা অন্ততঃ পেছনেও খানিক নিন্দে করবে ওর আশা ছিল। কিন্তু তাও না! তারা প্রোগ্রাম পড়ছে। পাতা ওল্টানোর শুক্‌ন খস্‌খসানী শুধু কানে আসে। আর কিছু না, কোনো ভাব-বিকার নেই। আবার আগের মত চুপচাপ…পাথুরে নিস্তব্ধতা। শেষ হয়ে গেলে আবার সেই ভদ্রতার হাততালি। বেশ বোঝা গেল, শেষ যে হয়েছে তা বুঝতেও পারেনি শ্রোতারা। সবাই থেমে গেছে, কিন্তু চারজোড়া হাত তখনও তালি বাজিয়ে চলেছে। হঠাৎ খেয়াল হ'ল, লজ্জা পেয়ে থেমে গেল। নির্জন হলের শূন্যতা যেন আরো খা খা ক'রে উঠল। ছোট্ট এই ঘটনাটুকুতে প্রমাণ হয়ে গেল আজের এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে শ্রোতারা কোন আনন্দই পায় নি।

অর্কেস্ট্রার মাঝখানে জায়গা ক'রে বসে পড়ল ক্রিসতফ। ডাইনে বাঁয়ে

তাকাবার ওর সাহস নেই। একদিকে ওর বুক ভেঙ্গে কান্না আসতে লাগল, আর একদিকে সর্ব-শরীর কাঁপতে লাগল রাগে। উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে বলতে চায়: তোমরা দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে—যাও যাও বেরিয়ে যাও। সবাই যাও…একজনও থাকবে না… তোমাদের ছায়াও অসহ্য…

গায়িকার পালা এবার। এইবার শ্রোতাদের মধ্যে যেন একটু প্রাণের সাড়া জাগল। এর গান ওরা শুনেছে…সাধুবাদ দিয়েছে—এতে ওরা অভ্যস্ত। ক্রিসতফের এই অদ্ভুত নূতন ধারার সঙ্গীতের মাথামুণ্ড কিছুই খেই পাচ্ছিল না শ্রোতারা। গায়িকাকে পেয়ে ওরা অকুলে কুল পেল। সব কিছু নূতনের মধ্যে গায়িকা ওদের পরিচিত সুনিশ্চিত আপনার ঠাঁই, ফাঁপা বালুচর নয়। কঠিন ভূমি, যেখানে হারিয়ে যাবার ভয় নেই। ক্রিসতফ ওদের মন বুঝতে পারে। তিক্ত হাসি দেখা দেয় ওর চোখে মুখে। শ্রীমতীরও বুঝতে বাকী থাকে না শ্রোতার দল ওরই আশায় বসে আছে: ওর গর্বিত মুখে চোখে স্পষ্ট লেখা আজকের অনুষ্ঠানের বিজয় মালা ওরই কণ্ঠে দুলবে। ক্রিসতফ উঠে এসে ওকে বলে: 'গান গাও, এবার তোমার পালা।' পরস্পরের দৃষ্টিতে জ্বালা। রীতি অনুসারে ওকে বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে এল না ক্রিসতফ, পকেটে হাত পুরে দাঁড়িয়ে রইল; রাগে গড়গড় করতে করতে শ্রীমতী একাই ওর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এলেন মঞ্চের সামনে। বিরক্ত মুখে ক্রিসতফ এল পেছন পেছন। শ্রীমতীকে দেখা মাত্র শ্রোতার দল উল্লাসে কলকণ্ঠে অভিনন্দন জানাল। প্রত্যেকটি মুখ ঝল্‌মল্ ক'রে উঠল খুশিতে। গা ঝাড়া দিয়ে সব সোজা হয়ে বসল; হাতে হাতে গ্লাসের রিণিঝিনি বাজতে লাগল। নিজের ক্ষমতা ভালো ক'রেই জানে শ্রীমতী। পরিপূর্ণ আত্ম-বিশ্বাসে ও লাইডারটাই ধরল—ক্রিসতফের দেওয়া-সুরে নয়, ওর

নিজের ধরনে। ক্রিসতফ সঙ্গে বাজাচ্ছিল ; তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এমনতরো যে ঘটবে তা ও আঁচ করেছিল কতকটা। অন্তরায় এসে ক্রিসতফ জোরে পিয়ানো ঠুকে পেছন থেকে ঝাঁঝিয়ে উঠল :

'আঃ, অমনি নয়, অমনি নয়…'

কে শোনে কার কথা ! ক্রিসতফ রাগে ফোলে আর চাপা স্বরে বলে চলে :

'কানে শুনতে পাচ্ছ না কি বলছি ? অমনি নয়। অমনি নয়… না…না, হচ্ছে না, হচ্ছে না।'

শ্রোতারা কিছু শুনতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু অর্কেষ্ট্রার বাজিয়েরা সবই শুনছে বসে বসে। ক্রিসতফের চেচাঁমেচিতে শ্রীমতী ঘাবড়ে গিয়ে তুৎলে তুৎলে গাইতে লাগল। ক্রিসতফের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে বাজিয়েই চলেছে। শেষকালে একদিকে রইল বাজনা আর একদিকে গান। অবিশ্যি শ্রোতারা ধরতে পারেনি ব্যাপার কি। ওরা শুধু বলাবলি করে ক্রিসতফের বাজনাটা কেমন ভালো লাগছে না ; কানে বড় বেস্থরো ঠেকছে। কিন্তু ক্রিসতফ ভাবছে সম্পূর্ণ উল্টো। ও পাগলের মত মুখ খিঁচোয় ব'সে ব'সে। অবশেষে আর থাকতে পারল না ; একটা কলির মধ্যখানেই ও একেবারে ফেটে পড়ল : 'থামো থামো' চীৎকার ক'রে উঠল ও।

স্থরের টানে আরও খানিক দূর ভেসে গিয়ে গায়িকা থামল।

ক্রিসতফ অত্যন্ত নীরস কণ্ঠে বলল :

'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, আর নয়।'

মুহূর্তের জন্য শ্রোতারা যেন হতবাক হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর ক্রিসতফ আবার কঠোর সুরে হুকুম করে : 'আবার আরম্ভ কর !'

স্তম্ভিত হয়ে মহিলা ওর দিকে তাকায়। হাত কাঁপছে। ক্রিসতফের

ইচ্ছে হ'ল ওর মাথায় ছুঁড়ে মারে হাতের স্বরলিপির বইটা। পরে ও অবাক হয়েছে কেমন ক'রে সে দিন ও সংযত হয়ে ছিল? কি ক'রে হাতের বইটা হাতেই থাকতে পেরেছিল? যাই হোক, ক্রিসতফের দৃপ্ত স্বরের সামনে বিদ্রোহ টিকল না। গায়িকা আবার আরম্ভ করল গান। সম্পূর্ণ গীতাংশটি ও আবার গাইল ক্রিসতফের দেওয়া সুরে। বুঝে নিয়েছে, সামান্য এতটুকু এদিক ওদিক হ'লে বর্বরটার কাছে রক্ষে থাকবে না। আবার হয়ত অপমান ক'রে বসবে। ভাবতেও ওর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

শেষ হ'লে হল্ কাঁপিয়ে হাততালি উঠল। এ হাততালি সঙ্গীত-কলাকে নয়,—[যে কোনো গান গাইলেই ওরা অমনি পাগল হয়ে উঠত]—শিল্পীকে, যার পরিচয় গানে গানে অন্তরঙ্গ হ'য়ে আছে ওদের কাছে এতদিন ধ'রে। শ্রোতারা জানে এ ব্যক্তিকে প্রশংসা করায় কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। তা ছাড়া ক্রিসতফ যে-অপমানটা বেচারীকে করেছে, তার ক্ষতি-পূরণ যদিও হবে না, হয়তো সান্ত্বনা কিছুটা হবে ওদের প্রশংসায়। ঠিক বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝেছে সবাই, কোথাও ভুল ক'রে ফেলেছেন শ্রীমতী। কিন্তু হয়েই যদি থাকে একটা ভুল, না হয় হয়েছে; অমন নাজেহাল করার কি দরকার ছিল! ক্রিসতফের কি খুব ভালো কাজ হয়েছে এটা? 'আবার, আবার' ব'লে চীৎকার ক'রে ওঠে সমস্বরে সবাই। কিন্তু ক্রিসতফ কঠিন হাতে পিয়ানো বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়াল।

এর পরে আবার গাইবার কথা ভেবে চোখে অন্ধকার দেখছিল শ্রীমতী। ক্রিসতফ অমন রূঢ় ভাবে পিয়ানো বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছে, তা ওর চোখে পড়েনি। তার আগে তাড়াতাড়ি মঞ্চ থেকে বেরিয়ে নিজের কক্ষে এসে খিল এঁটে দিল। নিজেকে একলা পেয়ে রাগ আর অপমানের নিরুদ্ধ বন্যা বাঁধ ভেঙ্গে চোখের জলের ঢল নেমে এল। প্রায়

পোনের মিনিট চীৎকার ক'রে কেঁদে বুক চাপড়ে ক্রিসতফকে গাল দিয়ে তবে খানিকটা শান্ত হ'ল।

দরজার ফাঁক দিয়ে শোনা যায় সব। পৃষ্ঠপোষকদের কেউ কেউ এগিয়ে এল। তারা ফিরে যাবার সময় বলে গেল ক্রিসতফটা আস্ত বর্বর। কনসার্ট হলের খবর হাওয়ার আগে ছড়ায়। প্রোগ্রামের তখনও খানিকটা বাকী ছিল। ক্রিসতফ এসে জায়গায় বসতেই শ্রোতাদের মধ্যে যেন তুফান উঠল। বাকী ছিল অথ্-এর জিনিষটাই। প্রোগ্রামে ক্রিসতফই ঢুকিয়েছিল এটা। ক্রিসতফকে জব্দ করবার একটা ভালো উপায় হাতের কাছে পেয়ে গেল শ্রোতার দল; অথ্কে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে অভিনন্দন জানাল তারা। তালি আর থামতে চায় না। ওকে দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠল সবাই। অথ্ বেরিয়ে এসে মঞ্চের সামনে দাঁড়াল। সেদিনকার কনসার্ট-এর অনুষ্ঠান এমনি ক'রে শেষ হ'ল।

ছোট শহরের ছোট পরিধি অতিক্রম ক'রে অনুষ্ঠানের খবর সবিস্তারে সপরিষদ গ্র্যাণ্ড ডিউকের দরবারে পৌঁছুল। যে-সব সংবাদপত্র গায়িকার পক্ষে ছিল তারা সেদিনকার ঘটনা সম্পূর্ণ চেপে দিল। 'লাইডার'-এর নাম আর গায়িকার অপূর্ব সাফল্যের খবর বেরুল সাড়ম্বরে। ক্রিসতফের অন্যান্য সঙ্গীতাংশগুলি সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুচার কথায় প্রায় একই ধরনের সমালোচনা বেরুল সব কাগজে—'সুর-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় বটে শিল্পীর রচনায়, কিন্তু ছন্দের বাঁধুনী নেই, ভাবের গভীরতা নেই। লেখা মস্তিষ্ক-প্রসূত, মর্মোৎসারিত নয়। সেই কারণেই আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। শিল্পী মৌলিক হবার যথেষ্টই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় চেষ্টা ক'রে মৌলিক হওয়া যায় না।' তারপর প্রকৃত মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর মোসার্ট বীঠোফেন, লোয়ে,

লেগেছে ওর ভেতরকার বলিষ্ঠতা, ভাবী কালকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্য উদগ্র ক্ষুধার রূপকে। তারা ওকে বোঝেনি, ওই মুর্খের দল বোঝেনি। ওকে কখনও ভালোবাসেনি তারা। না তখন, না এখন। ওর মধ্যেকার দুর্বলতা, ওর বিকৃত রুচিকেই ওরা ভালোবেসেছে—অর্থাৎ ভালোবেসেছে ওর মধ্যে ওদের ছায়াটুকুকেই—যেখানে ওর নিজস্ব রূপ, যেখানে ক্রিসতফ শুধু ক্রিসতফ সেখানে ওরা কেউ না। ওর সুহৃদ যদি কেউ থেকে থাকে তবে সে সম্বন্ধও ভুলের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

হয়তো এ ওর বাড়াবাড়ি। অনেক সময় ভালো লোকদের অদৃষ্টেও অমনি ঘটে। নূতনকে কিছুতেই ভালো লাগে না, বিশ বছর পুরানো হলে পর তবে তা পংক্তি পায়। দুর্বল ইন্দ্রিয়ের পক্ষে নূতন জীবনের তীব্র ঝাঁঝ সয় না : কালের হাওয়ায় তার ঝাঁঝ নষ্ট হ'লে তখন তা ব্যবহারের যোগ্য হয়। যে কোন শিল্প-সৃষ্টি ধুলোর তলায় চাপা পড়লে তবে তার কদর।

ক্রিসতফ আছে, অথচ ওকে কেউ বুঝছে না। বুঝবে যখন ও থাকবে না। এ অবিচার কিছুতেই মানতে পারে না ও। বেশতো কেউ একেবারেই না বুঝুক। সানন্দে মেনে নেবে। মন বিদ্রোহ করতে চায়। ও বোকা তাই বোঝাতে চেয়েছিল বক্তৃতা ক'রে, তর্ক ক'রে। সব জলে গেল। আগে যুগটার রুচি বদলান দরকার। ভয় কিসের? যে করেই হোক জার্মান-রুচিকে ও সংস্কার ক'রে নেবেই, ওর এই পণ। কিন্তু অসম্ভব পণ। ও জানে না। কথা কয়ে কাউকে বোঝান যায় না; কথা যোগায়ও না ওর। যাওবা যোগায় তা অত্যন্ত রূঢ়। সঙ্গীতাচার্যদের সম্বন্ধে, সামনা-সামনি সকলের সঙ্গে ও কথা বলতে লাগল অত্যন্ত রূঢ়ভাবে। লাভের মধ্যে আরও কয়েকজন শত্রু বাড়ল।

ঠিক এই সময়ে, একেবারে উপযুক্ত সময়ে, ওর গ্রহ—গ্রহ নয় দুগ্র'হ —ওকে আর এক পথে নিয়ে গেল।

এক থিয়েটারের রেস্তর াঁয় ও কয়েকজন শিল্পী বন্ধুর সাথে ব'সেছিল। এঁরা যে-অর্কেষ্ট্রায় বাজিয়ে থাকেন, সেই অর্কেষ্ট্রাকেই ভারী কড়া ভাষায় সমালোচনা করছিল ক্রিসতফ। সবাইর এক মত না হ'লেও ক্রিসতফের গালাগালি শুনে ওরা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। বৃদ্ধ ক্রউস্—যাঁর উদাত্ত কণ্ঠ সঙ্গীতশাস্ত্র আয়ত্ব ক'রেছে, লোক ভাল; ক্রিসতফকে সত্যি সত্যি ভালোবাসেন তিনি। ভদ্রলোক চেষ্টা করলেন কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে। কিন্তু ক্রিসতফ ছাড়বে না। বেচারা ক্রউস্ মনে মনে ভারী কষ্ট পায়। সবাই ভাবে কেন ও অমন ক'রে ওসব বলছে? মনে যাই থাক মুখে কি আনতে আছে সব?

ক্রউস্ ক্রিসতফ-এর কথা ভাবতে চেষ্টা করে। ওর কথায় মনে মনে সংশয় আসে বহু। মন ক্রিসতফকে সমর্থন করতে চায়। কিন্তু ওর স্বীকার করার সাহস নেই; খোলাখুলি ক্রিসতফকে সায় দিতেও সাহস হয় না—ভয়, স্বভাব-বিনয় এবং আত্ম-বিশ্বাসের অভাব।

কর্ণেট-বাজিয়ে উইগল্ কিছু জানতে বুঝতে চায় না। সে সবাইকে সব কিছুকে তারিফ করতে রাজী ভালোই হোক আর মন্দই হোক। ওর কাছে সব সমান। ওর প্রশংসার মধ্যে মাত্রার তারতম্যও নেই। ও শুধু নির্বিশেষে আর নির্বিচারে প্রশংসা ক'রতেই জানে। এ ক'রেই ও বেঁচে আছে। এদিকে বাধা পেলে ওর ভারী লাগে।

কুহ্ এই দলেরই একজন যন্ত্রী। শিল্পী হ'লেও রুচিটা নীচের দিকে। অশ্লীল সঙ্গীত অত্যন্ত প্রিয়; গতানুগতিকে বেশী আকর্ষণ; মনটা পান্‌সে ভাবালুতার ভস্‌ভসে কাদা। তথাকথিত মহাজনদের ওপর শ্রদ্ধা ওর সরল মনের অকপট সত্য; প্রকৃত যোগ্যের ক্ষেত্রে ও যখন ভক্তি-রসাপ্লুত হ'য়ে ওঠে, সেইটে ছলনা; কিন্তু এই ছলনাও ওর সরল মনেরই সহজ সত্য। সুতরাং দেখা যায় ক্রিসতফের বিদ্রূপের আঘাত

যেখানে রূঢ়তম, বিশেষভাবে সেইগুলিই কুহ্-এর পরম সমাদরের বস্তু। অতএব বিশেষ ভাবে মনে আঘাত পেল বৃদ্ধ।

'ব্রাহ্মণেরা' যেমন দেবতার মধ্যে অতীত প্রতিভার ছায়া দেখেন তেমনি শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ বীঠোফেনকে পান ব্রাহম্স্-এর মধ্যে। কুহ্ আরও এগিয়ে গেছে। ও ব্রাহম্স্-এর মধ্যে লাভ করেছে বীঠোফেনকে।

কিন্তু ক্রিসতফের স্পর্ধায় সব থেকে চটেছে স্পিট্জ্। ইনিও একজন যন্ত্রী। ওর শিল্প-বোধ আহত ততটা হয়নি যতটা হয়েছে ওর সহজাত মানসিক দাসত্ব। কে একজন সম্রাট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে চেয়েছিলেন। স্পিট্জের জীবন হামাগুড়ি দিয়ে চলে, মরতেও চায় সে তেমনি হামাগুড়ি দিয়েই। এই ওর স্বাভাবিক প্রকৃতি। সরকারী তকমা আঁটা 'পবিত্র' ব্যক্তিদের পায়ে লুটিয়ে পড়তে পারলে জীবন সার্থক মনে করে।

সুতরাং ক্রিসতফের স্পর্ধায় কুহ্ আর্তনাদ করে, উইগ্ল নৈরাশ্যে হাত পা ছোড়ে, ক্রউস্ তামাসা করে, স্পিট্জ হেঁড়ে গলায় চেঁচায়। কিন্তু ক্রিসতফের গলা সকলকে ছাড়িয়ে যায়—জার্মানী ও জার্মানদের ও যা খুশি ব'লে গালাগাল দেয়।

পাশের টেবিলেই আর একজন যুবক বসেছিল। সে শুনে হেসে কুটিপাটি। কালো কোঁকড়ান মাথা-ভরা ওর চুল, চমৎকার ঝলমলে দুই চোখ, মস্ত বড় নাকটা ডগার দিকে এসে যেন মহা অসুবিধায় প'ড়ে গেছে। ডাইনে যাবে না বাঁয়ে ঠিক করতে না পেরে ডাইনেও গেছে, বাঁয়েও গেছে। ঠোঁট জোড়া পুরু; মুখখানা জীবন্ত—বুদ্ধি আর চাতুর্যে যেন সর্বদা কথা কইছে। ক্রিসতফের প্রতিটি কথা ও শুনছিল মন দিয়ে বিদ্রূপ আর সহানুভূতি মিশিয়ে। ঠোঁট দুটি ঝোলা, কপাল কোঁচকান; কপালের দুই পাশ, চোখের কোন, নাকের দুই পাশ, গাল উচ্ছ্বসিত

হাসিতে কাঁপছে; থেকে থেকে প্রবল ভাবে কেঁপে উঠছে সারা দেহ। কিন্তু প্রতিটি কথা ও কান পেতে শুনছে। দেখছে ক্রিসতফ তর্ক জুড়েছে স্পিট্জ্-এর সাথে—নাস্তা-নাবুদ ক'রে তুলেছে ওকে স্পিট্জ। ঠিকমত কথাটি মুখের কাছে জোগায়না ক্রিসতফের। রাগে ও তোৎলায়, হাঁপায়। অবশেষে কথাটি মুখে এসে গেল; কথা নয়ত মুগুর; শত্রুর গুমর ভেঙ্গে খান খান হ'তে পারে তার একটি ঘায়ে। দেখে ওর ভারী মজা লাগে। উত্তেজনায় ক্রিসতফের দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই। কি যে বলছে ঝোঁকের মাথায়, রাজ্যের যত উল্টোপাল্টা কথা, সে-দিকে তার খেয়ালও নেই।

সভা ভাঙ্গে। নিজের বড়াই ক'রে ক'রে সবাই ক্লান্ত। যে যার পথ ধরল। ক্রিসতফ উঠল সবার শেষে। যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, এমনি সময় সামনে এসে দাঁড়াল এক যুবক। ক্রিসতফ এতক্ষণ দেখতে পায়নি ওকে। কাছে এসে টুপী খুলে সে অত্যন্ত ভদ্রভাবে ক্রিসতফকে অভিবাদন করে দাঁড়াল—আলাপ করতে এসেছে, ধৃষ্টতা যেন গ্রহণ না করে ক্রিসতফ:

'ফ্রাঁজ ম্যানহাইম আমার নাম।'

ওদের কথা এতক্ষণ শুনছিল ও। অন্যায় করে ফেলেছে; ক্ষমা পাবে না! সাবাস ক্রিসতফ, ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে ব্যাটাদের। মনে হলেই ফুলে ফুলে হাসি উঠছে ওর গলা ঠেলে। ক্রিসতফ-এর ভারী ভালো লাগল শুনে; একটু অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। জিজ্ঞাসা করল:

'সত্যি নাকি?'

'নিশ্চয়ই, ঈশ্বরের দিব্যি।'

ক্রিসতফের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল: 'তাহলে আপনি—আপনি তাহলে স্বীকার করছেন আমার সাথে একমত, আমি ঠিক কথাই বলেছি, তাই না?'

ম্যানহাইম বলে : 'দেখুন, গান বাজনার আমি কিছু বুঝি-টুঝিনে। যেটুকু ভালো লাগে, [ আপনাকে বাড়াবার জন্য বলছিনে ] আপনারটাই। আমার রুচিটা খুব খারাপ নয়···কি বলেন !'

ক্রিসতফের বেশ ভালো লাগে, কিন্তু সন্দেহ যায় না : 'কি প্রমাণ হয় ? কিচ্ছু না।'

'আপনাকে খুশি করা তো ভারী কঠিন ! আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ। কিছুই প্রমাণ হয় না, সত্যি। জার্মান কলা-রসিকদের সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলার সাহস নেই ; কিন্তু যাই হোক ও-কথা সাধারণ ভাবে জার্মান জাতটার ওপরেই খাটে ; বিশেষ ক'রে যাদের বয়েস হয়েছে, যত রোম্যানটিক নির্বোধ সব, যত ভস্‌ভসে পচা ভাবালুতা দিয়ে মাথাটি ঠাসা ; ওদের চিরন্তন অতীত যা চিরকাল ছিল, আছে ও থাকবে ; ওদের এই চিরকেলে বুক্‌নী মাথা পেতে শুনে যেতেই হবে !'

ক্রিসতফ বুঝতে পারে না। ম্যানহাইম বলে চলল :

'আমার মতে প্রতি পঞ্চাশ বছর আর্ট ও চিন্তার জগতে যা কিছু আছে সব একেবারে ঝেঁটিয়ে সাফ ক'রে দেওয়া উচিত।'

ক্রিসতফ হেসে বলে : 'একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে।'

'উঁহুঁ একটুও নয়।' ছেলেটি বলে : 'বরঞ্চ পঞ্চাশ বছর, বড্ড বেশী। ত্রিশই ঠিক। আরো কম হ'লেই ভালো। বুঝলেন ! এ স্রেফ একটা স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা মাত্র। পূর্ব-পুরুষদের কেউ আর বাড়ীতে জমা ক'রে রাখে না, মরে গেলে ভদ্র ভাবে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেয় ভালো ক'রে পচবার জন্য। পাথর চাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, আর ফিরে আসবে না। ভাল মানুষ যারা তারা ফুল দেয়। তা দিক। আমি শুধু স্বস্তিতে থাকতে চাই। কাউকে ঘাটাতে চাইনে,

যাটাইও নে। যে যার জায়গায় থাক না জ্যান্ত হোক আর মরা হোক। এই হ'ল আমার কথা '

'কিন্তু কেউ কেউ ম'রে, জ্যান্তের বাড়া হ'য়ে বেঁচে আছে যে হে!'

'বরঞ্চ বেঁচে থেকেও মড়ার বাড়া হ'য়ে ঠিক উল্টো থাকে অনেকেই। এবং এদের সংখ্যাই বেশী।'

'তা হবে। যাই হোক, কত প্রাচীন যে টুসটুসে নবীন হ'য়ে আছেন।'

'যদি থাকে তবে তাকে খুঁজে নেব। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনে এক কালে যা ভালো ছিল, তা অন্য কালেও ভালো থাকবে। একই জিনিস কি আর ভালো লাগে! কালে কালে বদল চাই। সব চেয়ে আগে চাই পুরানো মানুষ এবং পুরানো জিনিস যত আছে সব একেবারে ঝেড়ে ঝুড়ে সাফ ক'রে দেওয়া। ওদের দিয়ে জার্মানী ভরা, ওদের ধ'রে ধ'রে ফাঁসি দাও!'

ক্রিসতফ মন দিয়ে শোনে, আলাপের জন্য ওর মনটা উস্‌খুস করে। ওর নিজের মতের সাথে অনেকটা যেন মিল আছে। অনেকটা ওর মনের কথাই যেন ঠাঁই ভুলে ও লোকটার মুখে চলে গেছে। কিন্তু গম্ভীর, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অমন ক'রে মুখ ভেংচিয়ে হাল্কা করা ওর ভালো লাগে না। মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করে। ও ভেবেছিল সবার কাছেই দুনিয়াটা গুরুমশায়ের পাঠশালা। কিন্তু বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কথাবার্তায়, সব কিছুতেই ম্যানহাইম ওর চেয়ে অনেক বেশী বড়। সুতরাং হয়তো ঠিকই বলেছে ও। ওর নিজস্ব বিশ্বাস অনুসারে একটা যুক্তি-সঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে সে চেষ্টা করেছে। ক্রিসতফই অহংকারী। নিজের ওপর ওর অতিমাত্রায় বিশ্বাস। এই জন্যই তো সবাই ওর ওপর চটে। কিন্তু সত্যি সত্যি ওটা অহংকার নয়

ক্রিসতফের। বরঞ্চ বিপরীত। শ্রদ্ধেয়ের কাছে শ্রদ্ধায় ওর শির সর্বদাই নত। এবং সে বিনয় ওর অকৃত্রিম। বিনয়ের জন্যই অনেক সময়ে ওকে বিপদে পড়তে হয়।

ম্যানহাইম থামে না। একটার পর আর একটা কথা নিয়ে পড়ে, টিপ্পনী কাটে; নিজের রসিকতায় নিজেই হাসে। একটু আলোচনা করবার সুযোগ খোঁজে ক্রিসতফ। ওই ঠাট্টা বিদ্রূপের মধ্য থেকে আসল কথা হাতড়ে বেড়ায়। ওর ভাব দেখে হাসি পায় ম্যানহাইমের। কিন্তু ওর হাল্কা কথাকে এতটা মূল্য দিয়েছে ক্রিসতফ, দেখে কৃতজ্ঞ না হ'য়েও পারে না। লোকটা পাগল, কিন্তু মানুষকে বড় কাছে টানে।

অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। ঘন্টা তিনেক বাদে রিহার্সেল। হঠাৎ অর্কেষ্ট্রা-ঘরের ছোট দরজার ফাঁকে ম্যানহাইমের মাথাটা দেখা যায়; হেসে হেসে নানারকম মুখভঙ্গি ক'রে কি যেন ইসারা করছে ওর দিকে চেয়ে। রিহার্সেলের পর এল ক্রিসতফের কাছে। যেন কত কালের পরিচিত সুহৃদ, এমনি ভাবে ওর হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল ম্যানহাইম। বলল:

'সময় আছে? একটা কথা বলব? মাথায় এসে গেল হঠাৎ! হয়ত ভাববেন আমার মাথা খারাপ হয়েছে...আচ্ছা! সঙ্গীত-শিল্পীদের সম্বন্ধে আপনার অভিমতগুলি লিখে ফেলুন না। দেখুন না একবার লিখে। যা করছেন, কি হবে ওসবে! খালি গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার পণ্ড শ্রমে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছেন, এই তো! আপনার অর্কেষ্ট্রা-পার্টির ওই ভূতগুলো জানে কিছু? বাজাতে বসলে যাদের বাজনা ভেঙ্গে যায়, তাদের জন্য চেঁচিয়ে গলা ভাঙছেন। ওদের জন্য না চেঁচিয়ে, সোজাসুজি চলে আসুন সকলের সামনে। যা বলতে চান, যে নূতন পথ দেখাতে চান, সোজাসুজি বলুন জনসাধারণকে—কাজে লাগবে। এদের মারফৎ কেন?'

'কি বলছেন ? কাজে লাগবে ? লিখতে বলছেন আমায় ? লেখা …ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌! কি লিখব ? আর কখনই বা লিখব। আপনাকে কি ব'লে যে ধন্যবাদ দেব জানি না।'

'শুনুন তাহলে আসল প্রস্তাবটা। য়্যাডালবার্ট ফন্‌ ওয়াল্‌ডহৌস, র‍্যাফায়েল গোল্ডেনরিং, য়্যাডলুফ মাই, লুসিয়েন এহ্‌রেনফেল্‌ড্‌, এবং আমি—আমরা এই কয় বন্ধুতে মিলে একটা পত্রিকা বের করেছি। শহরে যে ক'টা পত্রিকা আছে, তার মধ্যে এটাতেই যা একটু পদার্থ আছে। বুঝলেন ? নাম রেখেছি 'ডিওনিয়স্‌।' শুনেছেন নিশ্চয়ই পত্রিকাটার কথা। আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাঁটি নেই, বেশ মিলে মিশে ঘর-বাড়ীর মত আছি। আপনি আসুন না আমাদের সাথে। খুব ভালো হয় তাহ'লে। সঙ্গীত-সমালোচনা বিভাগের ভারটা তা হ'লে আপনার ওপরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। কি বলেন ?'

এত বড় অযাচিত সম্মান! লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে ক্রিসতফ। 'হ্যাঁ'-টা যেন ওর ওষ্ঠাগ্রে এসে আছে। কিন্তু ভয় হয় যদি না পারে লিখতে!

'ধ্যেৎ!' ম্যানহাইম বলে: 'কে বলেছে আপনি লিখতে পারেন না, শুনি ? আমি বলছি আপনি পারবেন। সমালোচক ব'লে একবার যদি নামটা হয়ে যায়, তখন আর আপনাকে পায় কে ? জন-সাধারণ ? ফুঃ ওদের আবার কেউ ভয় করে নাকি ? ওরা যে কত বড় হস্তী-মূর্খ জানেন না। যা বোঝাবেন তাই বুঝবে। শিল্পী ব'লে নাম করতে আর কি লাগে ? ওতো মুখের কথা। শিল্পীকে ছিঃ ছিঃ ক'রে বসিয়ে দিতে পারো যখন খুশি। কিন্তু সমালোচকের বেলা সেটি খাটবে না। মনের কথা তোমায় মনেই চেপে রাখতে হবে। কিছুটি বলতে পারবে না। ওই তো মজা বোকাগুলোকে নিয়ে।

ওদের যা দেবে লোভীর মত গো-গ্রাসে তাই গিলবে। শুধু হাতে আসতে নেই, কিছু দিয়ে যেতে হবে। এই যা।'

ক্রিসতফকে রাজী হ'তে হ'ল। বিস্তর ধন্যবাদ পেল ম্যানহাইম। খালি শর্ত রইল যে ওর লেখার স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করা হবে না।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' ম্যানহাইম বলে : 'কেউ টু শব্দটি করবে না, দেখে নেবেন। যা খুশি লিখুন না। আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমরা সবাই তাই।'

থিয়েটারে আর একবার এসে ম্যানহাইম ওর সঙ্গে য়্যাডালবার্ট ও অন্যান্য বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিল। অত্যন্ত আন্তরিকতার মধ্যে পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হ'ল।

ওয়ালৃডহৌস সম্ভ্রান্ত বনেদী পরিবারের ছেলে, থাকে কাছেই। ও ছাড়া বন্ধুদের মধ্যে সকলেই ইহুদী, সকলেই পয়সা-ওয়ালা। ম্যানহাইমের বাবা এক ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারী। মাই-এর বাবা একটা ধাতুবিদ্যার কলেজ চালান। এহ্‌রেনফেল্‌ড এক মস্ত জহুরীর ছেলে। এরা সবাই বনেদী ইহুদী সমাজের মানুষ; অত্যন্ত পরিশ্রমী, অত্যন্ত আহরণ আর সঞ্চয়-শীল। জাতির বৈশিষ্ট্য ওদের রক্তে; একনিষ্ঠ উদ্যম দিয়ে ওরা জাতির ভাগ্য গড়ে তুলেছে। কিন্তু বিত্তের চাইতে উদ্যম ওদের কাছে সম্পদ হিসেবে বড়। ওদের পূর্ব-পুরুষেরা যা তৈরী ক'রে গেছেন, এ-পুরুষ তাই ভাঙছে; পারিবারিক ঐতিহ্যকে বিদ্রূপ করে এ-কালের ছেলেরা; হিসেবের ব্যাপারে পিপীলিকা-বৃত্তি তারা সইতে পারে না। নিজেদের ওরা শিল্পী ব'লে প্রচার করে। অর্থ নাকি ওদের কাছে মাটির ঢেলা, জানালা দিয়ে অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু আসলে ওটা ওদের মুখের কথা।

ওদের বৈরাগ্য লোহার সিন্দুক অবধি পৌঁছোয় না। এলোমেলো আজে বাজে কাজে অনেক সময় ওরা নষ্ট করে, কিন্তু ব্যবহারিক বুদ্ধি কখনও খোয়া যায় না। মস্তিষ্কটি সর্বদা অত্যন্ত পরিষ্কার। এছাড়া বাপের কড়া শাসন ও কড়া নজর তো আছেই। ওদের মধ্যে ম্যানহাইমই সব চেয়ে বেহিসেবী মানুষ! ওড়াবার মত ওর ভাণ্ডারে কিছু থাকলে ও সত্যি উড়িয়ে দিতে পারে। কঞ্জুস বলে বাবাকে ও বাইরে গাল দেয়; কিন্তু মনে মনে হাসে আর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, ভাবে: 'বেঁচে থাক আমার বাবার জল-না-গলা হাত!'

একমাত্র ওয়াল্ডহৌস-এর ওপরেই কোন সতর্ক চোখের শাসানী নেই। ওর নিজের এবং সম্পত্তির এখ্তিয়ারী সম্পূর্ণ ওর নিজের হাতে। ওর দরাজ দিল ও দরাজ হাতের দৌলতে ওদের পত্রিকাখানি চলছে। পত্রিকাটির সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করে ওয়াল্ডহৌস একা। আরনো হোলৎস্ এবং ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের অনুকরণে ও 'পলি-মেট্রস্' নাম দিয়ে একখানা কাব্য লিখছে অতি দীর্ঘ চরণের সাথে ঠিক বিপরীত পরিমাপের চরণ সাজিয়ে; আর বিস্তর যতি, অর্ধ-যতি, বিরতি, অর্ধ-বিরতি, যুক্ত-চিহ্ন, তীর্যক লেখা, দুই হাতে ছড়িয়ে। প্রচুর অনুপ্রাস, অনুবৃত্তি, নানা ভাষা থেকে আহরণ করা বিস্তর শব্দ। ওয়াল্‌ডহৌস কবি; পুরানো, পচা, বাসি জিনিসে ওর ভারী লোভ; একদিকে অত্যন্ত ভাবালু, আর একদিকে একেবারেই অনুভূতি-হীন রস-বর্জিত; অত্যন্ত সরল এবং অত্যন্ত চালিয়াৎ। ওর কষ্ট-কল্পিত কবিতায় যে-অবহেলার ভাব সু-উচ্চার, সেটা ওর দুর্বলতা নয়, অহংকার। সংসারী লোকের মানদণ্ডে ও ভালো কবি হতে পারত। কিন্তু অমন কবির ছড়াছড়ি হাটে বাজারে, মাসিক পত্রে। ভিড় থেকে ও সরে এল। তারপর ভাবল উঠে প'ড়ে লাগা যাক সমাজ সংস্কারে।

খুব খানিক বাহাদুরি লোটা যাবে। কিন্তু পঙ্কে যে নিজেই ডুবে আছে, তার পক্ষে পঙ্কোদ্ধারের চিন্তা যে নিছক পাগলামো সে-কথা ওকে বলে কার সাধ্য। 'রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদনা উপলক্ষ্যে ইহুদী বন্ধুদের সাথে ওর মেলা-মেশাটা ইহুদী-বিদ্বেষী বাবা মা পছন্দ করে না। খানিকটা তাঁদের চটাবার জন্য, খানিক বাহাদুরী নেবার জন্যও বটে, নিষিদ্ধ সঙ্গের মাত্রাটা ওর ক্রমেই বেড়ে চলে। বন্ধুদের সাথে ওর সম্পর্ক সমানে সমানের এবং সৌজন্যাশ্লিষ্ট। কিন্তু এহ বাহ্যঃ। মনে মনে ঘৃণা করে ওদের সে। ওয়াল্ডহৌস জানে, ওর বন্ধুত্বের চাইতে ওর নাম ও টাকার প্রয়োজনই বন্ধুদের বেশী। এবং এ-দুটোর ওপর অবাধ অধিকার পেয়েই তারা বেশী খুশি। ও বাধা দেয় না। কিন্তু শ্রদ্ধাও করতে পারে না। অশ্রদ্ধা করার অজুহাত একটা হাতের কাছে পেয়ে ও যেন বর্তে যায়।

অতখানি দিয়েও বন্ধুদের প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করতে পারেনি ও। তারা ভাবে, এই ঔদার্য স্রেফ দেখান, লোকটার পাকা বুদ্ধির চাল। লেনদেন-এর কারবার দু'দিকেই সমান। বন্ধু যেমন দিয়েছে তার নামের ধার, আর অর্থের ভার, তেমনি এপক্ষও দেউলে বসে নেই, তারাও ব্যবসায় বুদ্ধি ও গ্রাহক যুগিয়েছে। ওয়াল্ডহৌসের চাইতে ওর বন্ধুদের বুদ্ধি অনেক বেশী, ব্যক্তিত্ব যে বেশী তা নয়, বরঞ্চ কমই। কিন্তু অন্যান্য শহরের মত এখানেও শুধু জাতি-বৈষম্যের অপরাধে ইহুদী সম্প্রদায় কোনঠাসা হ'য়ে একান্তে পড়ে আছে। দূরে থেকে থেকে ভেতর বাইরের দু'দিকের উভয় দৃষ্টিই খরতর এবং সমীক্ষণ-ধর্মী হয়েছে এদের। চিন্তার দিক দিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় এরা অনেক বেশী প্রগতিশীল এবং এই কারণেই পরিশ্রুত দৃষ্টিতে দেখেছে সমাজ-ব্যবস্থা কতখানি জীর্ণ এবং চিন্তাধারা কালের ধর্মে কতখানি দুর্বল হ'য়ে

দাঁড়িয়েছে। ওদের বুদ্ধি যতখানি মুক্তি পেয়েছে চরিত্র ততখানি উদার হয়নি। কাজেই সমাজের জীর্ণতাকে বিদ্রূপ করলেও, চরিত্রের দুর্বলতায় সংস্কারের পথে এগুতে সাহস পায়নি; বরঞ্চ নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে ত্রুটিগুলো। কৌমিক বিশিষ্ট ধর্মের চাপরাশ ওরা বহন করে। কিন্তু অভিজাত য়্যাডেলবার্টের মতই ওরা ধনী পরিবারের অলস পরগাছা। উন্নাসিক ওদের চাল; ওরা সরস্বতীর সাথে ফ্লার্ট করে। মেকী ময়ুর-পুচ্ছ ফুলিয়ে বাইরের লোকের মন ভোলায়; কখনও বা পালোয়ানী ঢংএ গুমর ক'রে আস্তিন গুটোয়। তবে ওদের মন পাথর নয়। আস্তিন গুটান হাতের মার নির্বিচারে সবার মাথায় পড়ে না। প'ড়ে মার খেয়ে যারা মার ফিরিয়ে দিতে জানে না, বেছে বেছে পড়ে সেই সব লোকের মাথায়। ওরা জেনে রেখেছে আজ যতটা এগিয়ে যাবে কাল ততটা ফিরে আসতেই হবে। আজ যে-সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে আর এক দিন ওখানেই আশ্রয় নিতে হবে। অতএব সেই উপযোগী সমাজ গঠনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজন থাকলেও উদ্যম নেই। কাজেই দু'দিক বজায় রেখে চলাই সুবুদ্ধির কাজ। সুতরাং ছোটখাট দোষ ত্রুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দু' একটু হাঁক ডাক করে; একদা-জনপ্রিয় কিন্তু আজ এমনিতেই যার দিন ফুরিয়েছে এমনি কোন নেতার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে সাড়ম্বরে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে খানিকটা আসরও জমায়। কিন্তু হুসিয়ার সওয়ারী, নদীর পাড়ে উঠে নাওখানার দিকে কড়া নজর রাখে; বিপদ ঘটলে মাঝ দরিয়ায় তরী ভাসিয়ে পৈত্রিক প্রাণ বাঁচায়। ওরা জানে ফলাফল যাই হোক, যুদ্ধ একবার শেষ হ'লে আর বহু দিন বিপদের ভয় থাকে না। অতএব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুন চলবে। কিন্তু বোঝাতে চায় ওরা সত্যি ঘুমিয়ে

নেই, ইচ্ছে করলেই চোখের নিমেষে প্রলয় ঘটাতে পারে, নেহাৎ ইচ্ছেটা করে না এই যা। ওসব হাঙ্গামার চাইতে বরঞ্চ শিল্পী-গোষ্ঠীতে ভিড়ে যাওয়াই ভাল। নাচে গানে, তারকাদের পার্টি দিয়ে সন্ধ্যেগুলো নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে যাবে।

এদের দলে ক্রিসতফ মনের সুখ খুঁজে পায় না। ঘোড়া আর নারী-তত্ত্ব ঘেঁটে ক্রিসতফের জাতের সুখ মেলে না। এদের কথা-বার্তা তেমন ধোপ-দুরস্ত নয়, তার মধ্যে না আছে রস, না বাজে অন্তরঙ্গতার সুর। য়্যাডেলবার্ট কথা কয় অত্যন্ত নীচু স্বরে, অত্যন্ত কেটে ছেঁটে ওজন ক'রে কেতা-দুরস্ত ভাষায়। বেশী রকম কেতা দুরস্ত হ'তে গিয়ে যে বাড়াবাড়িটা হয় তা ইতর জনের পক্ষে অত্যন্ত ক্লান্তিকর। য়্যাডলফ মাই পত্রিকার কর্ম-সচিব। ভারী গড়নের পেটান দেহ, যণ্ড-মার্কা কাঁধ, সাপের মত ক্রূর চোখের দৃষ্টি। ওর মুখ চোখ, চলন-বলনের এমনি ভঙ্গি যেন ওর সব কিছু অভ্রান্ত। ও নিজের আইন নিজে করে, সর্ব-সাধারণের আইন ওর মত মানুষের জন্য নাকি নয়। অপরের সাথে কথা বলার সময় ওর চোখে ফুটে ওঠে এক সুতীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্য। অর্থাৎ ও ছাড়া যত মানুষ আর যত মত কোনটাই দৃষ্টিপাত-যোগ্যও নয়। গোল্ডেরিং শিল্প-সমালোচক। মস্ত বড় চশমার পেছনে চোখ দুটো পিট পিট করে ; সব সময় কোমড়-ভাঙ্গা সাপের মত শরীরটাকে মোড়ায় ; মুদ্রা-দোষ ওটা। বাবরি চুল, বিশিষ্ট ভঙ্গিতে নিঃশব্দে বসে সিগারেট টানে; একদা যে-চিত্রকর গোষ্ঠীতে আনাগোনা করত, সম্ভবতঃ ভঙ্গিটা সেখানকার আমদানী। কথা বলে গুনগুনিয়ে—বলে কি বলে না, সবখানা কথা ঠোঁটের এপারে আসার আগেই ওর মুখ বন্ধ হ'য়ে যায়। কি অর্থে কে জানে বুড়ো আঙ্গুলটাকে সর্বদা শূন্যে আস্ফালন করে।

ছোট্ট মানুষ এহ্‌রেনফেলড্‌—মাথায় টাক, মুখে হাসি, থুতনিতে সু-

কাট, স্থ-ছাঁট দাড়ি। চোখের দৃষ্টি অভিমান আর অবসাদে এলিয়ে-পড়া, শুক-চঞ্চু নাক। পত্রিকায় ফ্যাশনেবল পাড়ার টিকা লেখে ও। ওর কথার স্বর ঝাঁঝাল, অর্থ ধোঁয়াটে। রসিক মানুষ, কিন্তু রসটা তাড়ির গাঁজান রস।

মা লক্ষ্মীর এই আদরের দুলালেরা রাজনীতিতে নৈরাজ্য-বাদী। অত্যন্ত স্বাভাবিক। অসহায় পথিকের সর্বস্ব লুটে তাকে পথের ভিখারী ক'রে, তোকে চাইনে ব'লে তাড়িয়ে দেয় ডাকাত। কোথাও এতটুকু বাজে না। তেমনি সোনার পালঙ্কে শোয়া যে-মানুষ, সমাজ মানিনে ব'লে গুমর করা তারই সাজে। দায়িত্ব এড়ানর চমৎকার পথ।

দলের মধ্যে শুধু ক্রিসতফেরই খালি ম্যানহাইমের ওপর খানিকটা সহানুভূতি আছে। পাঁচজনের মধ্যে এ লোকটারই তবু কিছুটা প্রাণ আছে। কথায় কথায় হাসে। তোমার কথা শুনেও হাসবে, নিজের কথা শুনেও হাসবে। এক নিমেষও চুপ ক'রে স্থির থাকতে পারে না। সর্বদাই বক্ বক্ আর টগবগ করছে। অনর্গল বাজে কথা, অতএব অজস্র ভুল কথা। কিন্তু তর্কের বেলায় হুসিয়ার, কখনও একটি স্থত্রেরও খেই হারায় না। নিজের মনের অলিগলি ওর নখাগ্রে; অত্যন্ত নরম মন, কারো প্রতি হিংসা দ্বেষ নেই; ওপরে ওঠবার চেষ্টা নেই—যে-স্তরে আছে সন্তুষ্ট চিত্তেই আছে। কিন্তু বুদ্ধিটা খুব সরল পথে চলে না সর্বদা। সংসারের রঙ্গমঞ্চে ও যেন সর্বদা আনমনে অভিনয় ক'রে চ'লেছে; আসল মানুষটার খোঁজ মেলে না। কিন্তু নিরীহ লোক, কারো কোন ক্ষতি করার প্রবৃত্তি নেই।

হরেক রকম বিশ্ব-হিতের কাজ নিয়ে ম্যানহাইম অহোরহ ব্যস্ত। আসল লক্ষ্য পরহিত নয়, আত্ম-প্রচার। ওর চরিত্র দুর্বোধ্য,

মন এত সংশয়ী যে কাজে মেতে থাকলেও ওর সন্দেহ ঘোচেনা; মাথা ঠিক রাখা কঠিন হয়। নিজের মতামত সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়া; মত যখন খাটায়, শক্ত হ'য়ে খাটায়—কোন আপোষ চলে না। মেতে থাকবার মত কিছু না কিছু একটা খেয়াল সর্বদাই হাতের কাছে চাই। এ ওর খেলা এবং নিত্য ওর নতুন খেলা চাই। একটা ছেড়ে আর একটাতে তাই হামেশাই দৌড় মারছে। বেশী ক্ষণ মন বসে না কিছুতে। বর্তমানে ও পরোপকারের খেয়ালে মেতেছে। মানুষের দুঃখ দেখলেই মনটা হু হু করতে থাকবে, এবং ঝট ক'রে মস্ত বড় রকমের একটা উপকার ক'রে ফেলবে। ম্যানহাইমের মতে, এও যথেষ্ট নয়। দশজনের জানা চাই। তোমার ঐ বিগলিত হৃদয়ের পরিচয় দশের কাছে পৌঁছোন চাই। দশে জানবে, তবে তো শিখবে। তাই দয়াধর্ম ও মুখে প্রচারও করে, হাতে কলমে আচরণ ক'রে পরকে শেখায়। ওর স্বজাতীয়দের হৃদয়ের স্পর্শ-বর্জিত নীরস নির্লিপ্ততার বিরুদ্ধে ওর অন্তরে ঘোর প্রতিবাদ জমে ওঠে; স্বভাবে জার্মান জাতির গোঁড়ামী, অমার্জিত রুচি এবং জীবনটাকে সামরিক ব্যারাক ক'রে তোলার স্বভাবকে কিছুতেই ও সমর্থন ক'রে উঠতে পারে না। এই দুইয়ের প্রতিক্রিয়ায় ও বর্তমানে যে-পথ গ্রহণ করেছে, তাতে ও টলস্টয়-পন্থী, নির্বাণ-পন্থী, না খৃষ্টীয় পাদ্রী, না বৌদ্ধ-শ্রমণ,—কি যে তা বোঝা এক সমস্যা। ও নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। তবে ও যে এক নব নীতি-ধর্মের অবতার হয়ে বসেছে তাতে, সন্দেহ নেই। অস্থি-মজ্জাহীন, প্রাণহীন মরা নীতি; যার মধ্যে কোন উদ্বেগের আলোড়ন নেই, আছে বিশুদ্ধ শান্তি—জড় মৃতদেহের শান্তি; যার মধ্যে সংগ্রাম-বিমুখ অনায়াস-জীবনের নির্বিচার প্রশ্রয়; যত অন্যায়ের, বিশেষতঃ ইন্দ্রিয় ঘটিত অপরাধের অবাধ এবং সর্বাত্মক নগ্ন সমর্থন। এই হ'ল ম্যানহাইমের নব্য-নীতির এক দিক। অপর দিকে

মানুষোচিত সদ্‌গুণ ও সদাচরণের প্রতি কঠিন ঔদাস্য। নীতির ছদ্মবেশে ইন্দ্রিয়াচার, স্বেচ্ছাচারিতা আর এই স্বজন-তোষণ; সন্ন্যাসীর গৈরিকের আড়ালে অসম্বৃত সম্ভোগের লুব্ধতা। নীতির নামে এই অনাচারে রুচিবান্ মানুষের হৃক্কার আসে। কিন্তু ম্যানহাইম বলে এ-তো শুধু খেলা। এর মধ্যে ও কোনো গুরুত্ব দেয় না; যতক্ষণ না খেয়াল খুশির কোন খোরাক জোটে, একটু ফূর্তি ক'রে সময় কাটানর ব্যবস্থা, এই পর্যন্ত। লাঠি-বাজী হোক, রাজনীতি হোক, পরোপকার বা অন্য যাই হোক, নিয়ে মেতে থাকবার মত কিছু চাই তো! সংসারের রঙ্গমঞ্চে একটা না একটা ভূমিকা ম্যানহাইমের আছেই। অভিনয় ও করে, এবং বঞ্চনা না রেখে নিষ্ঠা দিয়ে করে, যখন যে ভূমিকায়ই হোক না কেন। আপাততঃ ক্রিসতফকে নিয়ে মেতেছে, এ হেন ম্যানহাইম। মহা সোরগোল তুলে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ক্রিসতফের প্রচারে লেগে গেল। ওর প্রশংসা শুনে শুনে ম্যানহাইমের বাড়ীর লোকের কান ঝালা-পালা হ'ল। ওর মতে ক্রিসতফ প্রতিভার বরপুত্র। অসাধারণ মানুষ। সঙ্গীত ও রচনা করেনা, সৃষ্টি করে। ক্রিসতফ কথার শিল্পী, রসের যাদুকর। চেহারাও নাকি, চিকন ওষ্ঠে আর মুক্তা-বিনিন্দিত দন্ত-পাটিতে, কন্দর্পের মত। এও প্রচার করে, ক্রিসতফ ওর পরম ভক্ত। অবাক হ'য়ে একদিন দেখল ক্রিসতফ, ম্যানহাইমের বাড়ীতে ব্যাংকার লোথেয়ার ও তস্য দুহিতা জুডিথের মুখোমুখি হ'য়ে বসে কথা বলছে।

এর আগে আর কোন ইহুদী পরিবারের এমন কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়নি ক্রিসতফ। ছোট শহর হলেও ইহুদীদের সংখ্যা এখানে কম নয়। এবং ধনবল, জনবল ও বুদ্ধির দৌলতে শহরের সামাজিক জীবনে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিও যথেষ্ট; এত কাছে থেকেও তারা দূরে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ইহুদী-বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল। গোপন-

বৈরি চাপা আগুনের মত ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জলে। এ বিষ-বাষ্পের ক্রিয়া হ'তে ক্রিসতফদের পরিবার মুক্ত থাকতে পারেনি। ইহুদীদের ছায়া দেখলে ওর ঠাকুর্দা জলে উঠতেন। অথচ অদৃষ্টের ফেরে তাঁর ভাল ছাত্র দুটিই ছিল ইহুদী। [কালে একজন হয়েছিল প্রসিদ্ধ সুরকার আর একজন হয়েছিল নাম করা ওস্তাদ ] এক এক সময় গুণী শিষ্যদের বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করত গুরুর। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মনে পড়ে যেত এই শয়তানের জাতই যীশুখৃষ্টকে ক্রুশ-বিদ্ধ করেছিল ; প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত হ'য়ে ফিরে আসত। কিন্তু একদিন হৃদয় জয়ী হল। গুণ-গ্রাহী গুরু আর থাকতে পারলেন না। সেদিন মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন, গুণের আদরই করছেন, গুণীর নয়—অতএব মহাপ্রভু মার্জনা করুন। ক্রিসতফের বাবা মেলশিয়রের হৃদয় ছিল অনেক উদার। তাঁর অত শুচিবাই ছিল না। তাঁর মতে হাড়-কৃপণ টাকার কুমীরগুলোর কাছ থেকে টাকা আদায় করো যত পার। তাতে পাপ নেই, বরঞ্চ পুণ্য আছে। সুতরাং একদিকে গাল দিয়েছে, এবং আর একদিকে হাত পেতে টাকা নিতে ওর বাধেনি। ইহুদীর সংসারে রান্নার কাজ করলে পাপ হবে কি হবে না, তা শেষ পর্যন্ত লুইসা স্থির ক'রে উঠতে পারেনি। মনিবদের কাছ থেকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য যথেষ্টই পেয়েছে, কিন্তু মনে কোন বিদ্বেষ পোষণ করেনি। বরঞ্চ ওর ভারী দুঃখ—দুর্ভাগারা ভগবানের অভিশাপ মাথায় নিয়ে জন্মেছে। ওদের ছেলেমেয়েদের প্রাণ-খোলা হাসি-ভরা সুন্দর মুখগুলি দেখে দেখে ওর বুক মমতায় ভ'রে ওঠে। কেবলি মনে হয়, আঃ দেবশিশুর মত সুন্দর এই শিশুর দল ফুটফুটে ফুলের মত রূপ···কিন্তু···। সাংঘাতিক পরিণামের কথা ভাবতেও শিউরে ওঠে। ভয়ে চোখ বোজে।

ম্যানহাইমের বাড়ীতে ক্রিসতফের নিমন্ত্রণ। লুইসা শোনে। মনটা

বড় মুষড়ে পড়ে। কিন্তু ছেলেকে কিছু বলার সাহস হয় না। মনে মনে অবশ্য জানে সব ইহুদীরাই খারাপ হয় না। ভালো লোকও আছে তাদের মধ্যে। তবে ইহুদী হোক আর খৃষ্টান হোক, যার যার মতন আলাদা থাকলেই ভালো।

ক্রিসতফের মন ওড়ে বিপরীত হাওয়ায়। বড় তেঁতো সাংসারের অভিজ্ঞতা। তার ফলে নিষিদ্ধ মানুষেরা আরো বেশী ক'রে ওকে আকর্ষণ করল। এতদিন ও শুধু এ-সমাজের দোকানদার, ভবঘুরে পর্যায়ের ও পল্লী-বিশেষের বাসিন্দাদের সাথে কিছুটা মিশেছে। কিন্তু অভিজাত ইহুদী পরিবারের সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। প্রায়ই কাছাকাছি ইহুদী পাড়ায় যায়—বিশিষ্ট এক শ্রেণীর মেয়েদের দেখে। তাদের গাল বসা, পুরু ঠোঁট, চওড়া চোয়াল, দ্য ভিঁসি-হাসির চরিত্রও খুব ধোপ দুরস্ত নয়। ওর কেমন জানি মমতা হয়। ওরা স্থির হয়ে যখন থাকে, মুখে চোখে ভারী মনোরম একটি শ্রী ফুটে ওঠে। কিন্তু নিরন্তর অপভাষায় আলাপন ও গালাগালি, এবং কর্কশ স্বরে উচ্চ গ্রামে হাসির হাটে সে শ্রীটুকু কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ( মনুষ্য সমাজের আস্তকুঁড় স্বরূপ ) এই অভিশপ্ত জাতটার পুরুষ-গুলোর ধামার মত মাথা, ভাটার মত গোল গোল চোখ, জানোয়ারের মত মুখ, গাঁট্টা গোট্টা চোয়ারে দেহ। ওদের রহস্যময় জীবনের পাঁকাল, অন্ধ-গলির দুর্গন্ধের মধ্যেও যেন থেকে থেকে একটা আলোর ফুলকি দেখতে পায় ক্রিসতফ। কিন্তু আলেয়ার মত এই আছে এই নেই। ওদের কালো চোখের ঘন চাউনি ওর অপূর্ব লাগে। ওদের মনটাকে মনে হয় ইস্পাতের ছুরি—যেমনি তীক্ষ্ণ ধার, তেমনি তার তেজ! যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ। ক্রিসতফ মুগ্ধ হয়ে যায়। ওর কেবলি মনে হয় হতভাগাদের অভিশপ্ত আত্মা অন্ধকারে আঁকু পাকু করছে; সম্ভাবনাময়

অসংখ্য জীবন আকাশের টানে ডানা ঝট্‌পটিয়ে মরছে। ক্রিসতফ এদের চিনবে, জানবে, ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে হাতে হাত রেখে। ওর মন বলে : 'নাই জানি, নাই চিনি, ধর তার পাণি।' কি জানি, হাওয়ায় হাওয়ায় যেন তারা ওকে অলেখা লিপিতে আমন্ত্রণ পাঠায়। কিন্তু ভয় করে তবু। এরা তো এই রকম। এ সমাজের সেরা মানুষ-গুলি কেমন জানি হবে।

ম্যানহাইমের নিমন্ত্রণে প্রবল আকর্ষণ ছিল তাই। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার লোভও আছে। প্রথম মানবকে নিষিদ্ধ ফল দিয়েছিল নারী। সেই নারীরই সৌগন্ধে ফলটির স্বাদ গিয়েছিল বেড়ে। চোখাচোখী হ'তে না হতেই ক্রিস্তফের দৃষ্টি বাঁধা পড়ল জুডিথ ম্যানহাইমের চোখে। এ মেয়েটি যেন দুনিয়ার আর সব মেয়ে থেকে আলাদা, অনন্যা, অসামান্যা এক মেয়ে। লম্বা দোহারা চেহারা, বরঞ্চ একটু রোগাই হবে, আঁট সাঁট গড়ন। মাথায় অনতিদীর্ঘ ঘন কালো কোঁকড়ান চুল কাঞ্চনবরণ প্রশস্ত কপালখানা প্রায় ঢেকে মুখখানি ঘিরে নেমে এসেছে। আয়ত চোখ দু'টির মণি উজ্জ্বল, দৃষ্টি হ্রস্ব। নাক ও তার রন্ধ্র অত্যধিক বড়। গাল ঈষৎ শীর্ণ, ভারী থুত্‌নি। সব মিলিয়ে প্রোফাইলটি জীবন্ত—তার রেখায় রেখায় উদ্যম ও শক্তির স্ফুরণ। মুখখানি নিটোল ; শরতের আকাশের মত তাতে অহরহ রং বদলায় আর ঘন রহস্য জমে ওঠে। ওর সর্ব অবয়ব এক বলিষ্ঠ জাতির পরিচয় বহন করে—যে জাতির চরিত্র অসমঞ্জস, বিপরীত-গুণ-বিশিষ্ট, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, একই কালে সুন্দর ও অসুন্দর উপাদানে গড়া। আসল সৌন্দর্য ওর স্তব্ধ ওষ্ঠ দুটিতে। হয়ত দৃষ্টির হ্রস্বতার কারণেই চোখ দু'টি দুরবগাহ, চোখের চারপাশের বলয়িত নীলে তার মেঘাঞ্জন-ছায়া গাঢ়তর।

কিন্তু সে যেন একটা মানুষের চোখ নয়—একটা সম্পূর্ণ জাতির

বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হ'য়ে আছে ওই চোখে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাছে এলেই ওই চোখের পথে তার অধিকারিণীকে দেখা যায়। বিষাদঘন জ্বালাময়ী দৃষ্টির মধ্যে যেন সমস্ত ইস্রায়েলের আত্মা উদ্ঘাটিত। ওই চোখের দিকে তাকিয়ে ক্রিসতফ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। বারে বারে পথ হারিয়ে তবে ওই পূব-দেশীয়ার কূলে ওর তরী ভিড়েছিল।

জুডিথ তাকিয়ে আছে ক্রিসতফের দিকে। দৃষ্টির অনাবিল স্বচ্ছতায় একটুকু কম্পন নেই। খৃষ্টধর্মী ক্রিসতফের আত্মার মর্মমূলে যেন গিয়ে পৌঁছুল ওই দৃষ্টি। কিছু আর আড়াল রইল না। ক্রিসতফ বুঝতে পারছে ওই মোহময়ীর সামনে দাঁড়িয়ে, এক দুর্বার অসঙ্গত কামনা ওর সর্ব-সত্বায় ব্যপ্ত হচ্ছে অগ্নিস্রোতের মত। কিন্তু এ শুধু স্থূল রক্ত মাংসের প্রমত্ততা নয়, শুচি-শুদ্ধ শ্রদ্ধাবান হৃদয়ের আকুতি। ওকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে নিল জুডিথ। তবু লাস্যময়ী রমণী হ'য়ে পুরুষ ক্রিসতফের মন ভোলাল না। তাহ'লে এখানেই থামত না সে, আরও বহুদূর এগিয়ে যেত, সম্পূর্ণ গ্রাস করত ক্রিসতফকে—সহজ শিকার অমনি এসেছিল হাতে। কিন্তু জুডিথ শুধু জানতে চায় প্রতিপক্ষকে, [ পরিচিত, অপরিচিত প্রত্যেক পুরুষই ওর প্রতিপক্ষ ] চিনতে চায়, বুঝতে চায়, [ প্রয়োজন হ'লে প্রতিপক্ষের সাথে সন্ধি করতেও পারে অনায়াসে ] ক্রিসতফকে ও কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে নিতে চাইল। জীবন শুধু খেলা ; বুদ্ধিমানেরাই এ খেলায় জিততে পারে। নিজের হাতের তাস দেখতে না দিয়ে বিপক্ষের তাস দেখতে পারলেই হ'ল। লাভের নেশায় জেতা নয়, শুধু জেতার নেশায় ও জীবনের খেলায় জিততে চায়। বুদ্ধির প্রতি ওর একটা সহজ আকর্ষণ আছে। শুধু আকর্ষণ নয়, রীতিমত নেশা। জুডিথ

নিজে বুদ্ধিমতী, এবং এতটা বুদ্ধিমতী যে, যে-কোন বিদ্যা ও অনায়াসে আয়ত্ব করতে পারত; কর্মক্ষেত্রে ব্যাংকার পিতার উত্তরাধিকারের দায়িত্ব ও পুত্রের চাইতে অধিকতর যোগ্যতার সাথে বহন ক'রতে পারত। কিন্তু ওসব দিকে ওর মন নাই। বুদ্ধি-বৃত্তি খাটাবার ওই বারোয়ারী পথ ওর ভালো লাগে না। যে-বুদ্ধি দিয়ে মনুষ্য চরিত্রের মর্মভেদ করা যায় সেই সূক্ষ্ম শানিত বুদ্ধিকে আয়ত্ব করতে চায় ও মানুষের মর্মের খবর ও চায়। মানব-চরিত্রের অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা থেকেও তার আত্মার সংকেত মেলে। অদ্ভুত দক্ষতায় ও মানুষের দুর্বলতার সন্ধান ক'রে তার মনোরাজ্যের গহনে প্রবেশ করে। মানুষের ওপর ওর ক্ষমতা যাচাই করতে চায়। কিন্তু জয়ের উল্লাসে ও সময়ের অপচয় করে না। জয়লব্ধ বস্তুতে ওর মোহ নেই। শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করে। তার পর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতন শিকারের দিকে ছোটে। অত বড় শক্তি সৃষ্টি-বিমুখ। অতবড় প্রাণৈশ্বর্যবান সত্বা মৃত্যুর মত নিঃসাড়।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা স্থির দৃষ্টিতে। জুডিথ অত্যন্ত সংযতবাক্। বিশেষ বলার প্রয়োজনও নেই। ওর ওষ্ঠের প্রান্তে সামান্য একটুখানি কম্পন, হাল্কা হাসির ভঙ্গুর এক আধখানা রেখা--ঐটুকুর মধ্যেই সম্মোহনের দুর্জয় মন্ত্র। রেখাটুকু নিমেষে মিলিয়ে যায়, মুখখানি কঠিন হয়ে ওঠে; চোখের দৃষ্টি হয় নির্লিপ্ততায় সুদূর। হঠাৎ খাবার ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে, অথবা চাকরদের গালাগালি ক'রতে আরম্ভ করে কঠিন স্বরে—দেখে মনেই হবে না, এতক্ষণ একটি কথাও শুনেছে। এ যেন সম্পূর্ণ আর এক মানুষ। কিন্তু চকিতে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত চোখ জ্বলে উঠবে; ক্ষুর-ধার দু'চারটে টুকরো কথা ছিট্‌কিয়ে পড়বে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ রেখে দিয়ে যাবে—প্রতিটি কথাই সে শুনেছে, একটি কথাও বাদ পড়েনি।

ভাইএর মুখ থেকে ক্রিসতফের সম্বন্ধে যা শুনতে পেয়েছিল, নির্লিপ্তভাবে তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখে। খাম-খেয়ালী ভাইকে ও চেনে। ক্রিসতফ যেদিন প্রথম এ বাড়ীতে এল, তার দিকে তাকিয়ে ওর চোখে ব্যঙ্গের ফুলঝুরি খেলে গেল। দাদার কথা শুনে ওর প্রথম ধারণা হ'য়েছিল ক্রিসতফ অত্যন্ত সুপুরুষ [ হয়তো সেও বিদ্রূপই ক'রেছিল। আসল জিনিসটা থেকে উল্টো ক'রে দেখাই ওর রীতি ]। কিন্তু কাছে থেকে দেখে দেখে ওর মনে হয়, মিথ্যে বলেনি ফ্রাঁজ্। আরো কাছে আসতে দেখা গেল, অপরিণত অসংহত হ'লেও, এক বিরাট শক্তির প্রত্যক্ষ অঙ্গীকার, দুর্বলতা-হীন, দ্বিধা-হীন, দৃপ্ত, উদ্দীপ্ত, নির্ভীক বীর্য। মুগ্ধ হ'য়ে গেল জুডিথ। শক্তিকে ও চেনে ; প্রতিভা যে কত দুর্লভ তা ওর মত হৃদয় দিয়ে আর কেউ বোঝে নি। নানা কৌশলে ক্রিসতফকে ও কথা বলায়। কথার মধ্য দিয়ে ভালো-মন্দ মেশান আসল মানুষটাকে প্রত্যক্ষ ক'রতে চায়। ও সঙ্গীত-রসিক নয়, তবু ওকে পিয়ানো বাজাতে বলে। সঙ্গীত-রসিক নয় ব'লে যে সঙ্গীত বোঝে না তা নয়। সঙ্গীত শাস্ত্রে ওর গভীর জ্ঞান। ক্রিসতফের বাজনা শুনে ও বিগলিত হয় না, কিন্তু তার মধ্যে অভিব্যক্ত প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানায়। পাগল শিল্পীকে প্রতিদিন দেখে দেখেও ওর কৌতূহল মেটে না। কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে দেখ—যেন পাথরের প্রতিমা—নিরাগ্রহ ঔদাস্যে সুদূর। তবু পাথরের প্রতিমায় ঢাকা পড়েনা মানুষটা ও তার আগ্রহ চঞ্চল হৃদয়। গর্ব বোধ করে ক্রিসতফ। ভাবালুতা-বর্জিত অমন মার্জিত-বিচার যে কত দুর্লভ তা গভীরভাবে অনুভব করে। এই সমাদরটুকুর জন্য ওর লুব্ধতা সকলের চোখে পড়ে। তিন জনেই হাসে। কিন্তু ওর খেয়াল নেই! ও কেবল জুডিথের সাথেই কথা বলে ; ঐখানেই

ওর আনন্দ। ওর চার পাশে কেউ যেন নেই আর। কেউ নেই, কিছু নেই। জুডিথ ওর সর্ব ভুবন জুড়ে আছে।

ও কথা বলার সময় ফ্রাঁজ ওকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করে। ওর প্রতিটি কথা শোনে; চোখ মুখ, ঠোঁটের প্রতিটি নড়াচড়া দেখে পরম আগ্রহে। ওর বাবা ও জুডিথও দুজনেই স্থির হ'য়ে ব'সে শোনে। তাদের চোখ থাকে অন্য দিকে। ওদের দিকে চোখ পড়লেই ফ্রাঁজ হেসে ওঠে জোরে।

লোথেয়ার ম্যানহাইম বৃদ্ধ নন, কিন্তু বয়সটা প্রৌঢ়ত্বের প্রত্যন্ত-ঘেঁষা। দীর্ঘ দেহ, কিঞ্চিৎ সামনের দিকে ঝোঁকা বয়সের ভারে; মুখের রং লাল, মাথার চুল সব পাকা, কিন্তু গোঁফ ও ভ্রূ এখনও কুচ্‌কুচে কালো; দেহ ও মুখের গড়ন অত্যন্ত ভারী ভারী; কিন্তু সব সময়ই স্ফূর্তিতে ঝলমল—প্রাণ-প্রাচুর্যের তরঙ্গোচ্ছ্বাস কান পাতলেই যেন শোনা যায়। খেতে ব'সে প্রথম দিকটায় ভদ্রলোক ক্রিসতফকে বেশ ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রেছেন, এবং বুঝেছেন ছেলেটার মধ্যে একটা কিছু আছে। যদিও সঙ্গীতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, বোঝেনও না কিছু। [ খোলাখুলিই স্বীকার করেন এ কথা, তবে তার মধ্যেও অহংকার থাকে এ ধরণের লোকের ]। ক্রিসতফ পাগল মানুষ, মুখের ওপর এক সময় ব'লে ফেলল অত্যন্ত অভদ্র ভাবে, [ রাগ ক'রে না ] ব্যাংকার ট্যাংকার ওর মোটেই ভালো লাগে না। যাক না, সব্বাই চ'লে যাক, ও এতটুকু দুঃখিত হবে না; শুধু শ্রীমতী জুডিথ যদি থাকেন তাহ'লেই ওর সন্ধ্যা সার্থক হবে। বৃদ্ধের ভারী কৌতুক লাগল। তিনি কাগজখানা হাতে নিয়ে আগুনের ধারে গিয়ে সরে বসলেন। কাগজ পড়তে পড়তে পাগলটার অদ্ভুত কথা-বার্তা ও অদ্ভুত গানের দু'একটা কলি কানে আসতে লাগল অস্পষ্টভাবে।

মনে মনে হাসেন, আর ভাবেন, পাগলটাকে আর তার এই উদ্ভট খাম-খেয়ালী সৃষ্টিকে বুঝবার লোক থাকলে হয় পৃথিবীতে। ওদের কথা শোনবার জন্য বিশেষ উদগ্রীব নন লোথেয়ার। জানেন মেয়ে তার পাকা জহুরী, জহর চিনবে এবং তাকে বুঝিয়েও দেবে তার আসল মূল্য। বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না।

ক্রিসতফ চ'লে যাবার পর জিজ্ঞাসা করল লোথেয়ার : 'খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তো নাকাল করেছিস বেচারাকে। কেমন বলতো ছোকরা-শিল্পী ?'

জুডিথ একটুখানি হেসে, কি জানি হিসেব ক'রে বললে : 'মাথায় একটুখানি ছিট্ আছে। কিন্তু বাজে-মার্কা নয়, ভেতরে জিনিস আছে।'

'আমারও তাই মনে হয় রে,' লোথেয়ার বলেন : 'তা হলে নাম করতে পারবে, কি বলিস ?'

'মনে তো হচ্ছে ক্ষমতা আছে।'

শক্তিমানই শক্তিমানকে আকর্ষণ করে। লোথেয়ার বলেন : 'তাহ'লে তো বেচারাকে একটু সাহায্য ক'রতে হয় আমাদের।'

জুডিথ ম্যানহাইমের গুণে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে বাড়ী ফিরল ক্রিস্তফ। জুডিথ যা ভেবেছে তা নয়; ওর প্রেমে পড়েনি ক্রিসতফ। এ সম্বন্ধে দু'জনেরই ভুল হয়েছে—জুডিথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও ভুল ক'রেছে ; ক্রিসতফের মনের কাজ করে তার অন্তর্জ্ঞান, সেখানেও ভুল হয়েছে। ওর ও প্রেম নয়, মুগ্ধতা ; জুডিথকে যে বোঝা যায় না ; ও যেন একটা ধাঁধা। এই হেঁয়ালী মেয়েটা আর তার অদ্ভুত ক্রিয়াশীল মনই ওকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু বাঁধা প'ড়েছে ওর দৃষ্টি আর বুদ্ধি ; হৃদয় নয়। ওর হৃদয় যে কেমন

ক'রে এ অবস্থায় সরে থাকতে পারল, সে এক আশ্চর্যের বিষয়। কোন প্রশ্ন জেগেছে কি ওর মনে? জুডিথের চরিত্রের কোনও দিক কি ওর মনে কোনও সংশয়ের ছায়াপাত করেছে? অপ্রীতিকর কিছু কি ওর মনকে বিমুখ ক'রেছে? সাধারণতঃ এমনি প্রতিকূল হাওয়ায়ই প্রেমের উত্তাপ বাড়ে। প্রেমাস্পদের আঘাতই প্রেমের সব চেয়ে বড় শক্তির উৎস। ক্রিস্তফ জুডিথকে যদি ভালো নাই বেসে থাকে তার অপরাধ দু'জনের কারো নয়। দু'জনের পক্ষে অপমানজনক হলেও সত্যি কারণ এই যে ক্রিসতফের সমস্ত হৃদয় এখনও জুড়ে আছে এই সে-দিনের ভালোবাসার স্মৃতি। ঠেকে ঠেকে সাবধান হয়েছে তা নয়। য়্যাডাকেই ভালোবেসেছিল সারা প্রাণ ঢেলে। এত বিশ্বাস, এত গভীরতা দিয়ে, এত আবেগ ভরে যে আজ ও দেউলে। নূতন ক'রে প্রেমের ডালি সাজাবার মত আর কোন উপকরণ বাকী নেই ওর ভাণ্ডারে। নূতন ক'রে হোমাগ্নি জ্বালতে হ'লে, নূতন ক'রে তার আয়োজন চাই। সে-আয়োজন যদি না জোটে তবে একদিন তোমার জীবনে প্রেমের যে মহাগ্নি জ্বলেছিল তোমার সমস্ত আকাশকে আলোর রাগে রাঙ্গিয়ে, জেনো তার আয়ু শেষ। দু'একটি ম্রিয়মান কম্পিত-শিখা ইতস্ততঃ ছিটকে-পড়া সমিধের বুকে হয়ত কিছুক্ষণ কোন মতে বেঁচে থাকবে, এবং তার আলোয় আঁধার হয়তো ক্ষণিকের জন্য জ্বলেও উঠবে। কিন্তু তারপর সমিধের অভাবে, ধীরে ধীরে নিঃশেষে নিভে যাবে। আর অন্ততঃ ছ' মাস পরে যদি জুডিথের সাথে ওর দেখা হ'ত, তবে তার প্রেমে ও পাগল হ'ত। কিন্তু আজ জুডিথ শুধু ওর সুহৃদ। ওকে দেখে ক্রিসতফের মন বরঞ্চ আরো বিকল হয়, স্বস্তি পায় না কিছুতে। ও চেষ্টা করে সহজ হ'তে। কিন্তু য়্যাডার কথা মনে পড়ে। মনে ক'রতে ও চায় না, সে-স্মৃতিতে আজ আর

মাদকতা নেই। যে-জুডিথ সবার থেকে আলাদা হ'য়ে অদ্বিতীয়া হয়ে আছে, ওর মুগ্ধ হৃদয়ের অঞ্জলি তার জন্য, আরো দশটা মেয়ের মত সাধারণী জুডিথের জন্য নয়। এমন দীপ্তিময়ী মেয়ে ওর জীবনে প্রথম। জুডিথ শুধু সুন্দরী নয়। ওর রূপ শুধু রূপ নয়, ওর পরিমার্জিত বুদ্ধির আলো। ওর সর্বাঙ্গে দীপ্তি। ওর ওষ্ঠের কুঞ্চনে, চোখের তারায়, ওর হাতে, ওর দেহের তনিমায়, শাণিত বুদ্ধির ঝলক। ওটুকু না থাকলে জুডিথ সাধারণ মেয়ের মত গড্ডালিকা প্রবাহে হারিয়ে যেত। প্রকাশে আর বিকাশে অমন ক'রে সহস্র দল হ'য়ে উঠত না। অনেকের কাছেই ওর চেহারাটা নেহাৎ পানসে লাগে। জুডিথের বুদ্ধিকে হয়ত ক্রিসতফ অনেকখানি বাড়িয়ে দেখেছিল। তার মধ্যেকার ফাঁকি অথবা ফাঁকা যাই বলো, হয়তো চোখে পড়েনি। ক্রিসতফ-এর সমস্ত হৃদয় চায় ওর কাছে আপনাকে খুলে ধরতে, বুকের স্বপ্নকে ওর কাছে ঢেলে দিতে। আজ পর্যন্ত দুর্ভাগার স্বপ্ন-ভরা বুকের ভাষা শোনবার জন্য কেউ কান পাতেনি। তাইতে সবার মাঝ থেকে সরে এসে ও শম্বুকের মত আপনার মধ্যে গুটিয়ে ব'সে ছিল। আজ বন্ধুর বেশে নারী এসে ওকে ডাক দিল। বুকের মধ্যে আনন্দের শত-লহরের দোলা জাগল। ওর বোন নেই। ভারী দুঃখ ছোটবেলা থেকেই। ভাইরা ওকে বোঝে না, সে থাকলে নিশ্চয়ই বুঝত ওকে। জুডিথকে দেখে বুকের সেই খালি জায়গাটা ভ'রে উঠল। মনে হল এ স্নেহ ছেড়ে চায় না ও প্রেম। জুডিথ বুঝতে পারে। কাঁটা বেঁধে মনের মধ্যে। ও নিজেও ক্রিসতফকে ভালোবাসতে পারেনি। কিন্তু শহরের তরুণ-দলের কাঁচা বুক গুলিতে ওর জন্য আগুন

জলছে। ধনে মানে জ্ঞানে গুণে ওদের পায়ের কাছে লাগে না এ-ছেলে। ক্রিসতফ যদি ওর প্রেমে প'ড়ত তবে তা নিতান্ত স্বাভাবিক সাধারণ ঘটনা হ'ত। কিন্তু না পড়াটাই অসাধারণ। অতএব ছুরির ফলার মত গিয়ে বিঁধল মর্মে। ক্রিসতফ ওকে তার গভীরতম বিশ্বাসের মান দিয়েছে। জীবনের আশা, ভরসা, ভাবী জীবনের পরিকল্পনা, স্বপ্ন—নিঃশেষে মেলে ধরে ওর সামনে। নিঃসন্দেহ খুশি হয় জুডিথ, কিন্তু অবাক হয় না। ওর মন ভরে না, ব্যথা লাগে—ক্রিসতফ কি ধরা দেবে না? শুধু দার্শনিক সম্পর্ক? তার বেশী ধারাল শায়ক নেই ওর তূণে? [ মেয়েরা অবশ্য ইনটেলেক্চুয়েল সম্বন্ধ নিয়ে সন্তুষ্ট নয় ] না, সত্যিকার কোন জোরই হয়তো নেই ক্রিসতফের উপর। সে ওরই মন চায়। উল্টো কথা! তরুণের দল ওর প্রচণ্ড আকর্ষনী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে এসেছে চিরকাল—ওর আত্ম-দানের দাবী ওঠেনি কোনো তরফ থেকে। তাদের কোমল মনগুলি নিয়ে ও যেমন খুশি ভাঙ্গা গড়া খেলে এসেছে। এই তো ঘটে এসেছে ওর অভিজ্ঞতার ইতিহাসে। কিন্তু দুর্বল শিকার যেখানে আপনি ধরা দিয়েছে. ও হাত গুটিয়ে নিয়েছে। দুর্বলকে মারায় তৃপ্তি নেই। ক্রিসতফ দুর্লভ, দুঃসাধ্য শিকার। সেজন্য ওর এত কৌতূহল। ক্রিসতফ কবে কি করবে না করবে, ওর হাজারো পাগলামীতে জুডিথের কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু ওই পাগলের মৌলিক প্রতিভা তার বিরাট শক্তি ও দেখেছে; দেখেছে সেই অসম্বৃত শক্তির তরঙ্গ-বিক্ষোভের মধ্যে বিপুল সম্ভাবনার অঙ্গীকার। ওই শক্তিকে সৃষ্টিময়ী ক'রে তুলতে চায় জুডিথ আপনার হাতে, আপনার মত ক'রে। ক্রিসতফের আপনার পথে নয়। ক্রিসতফের স্বরূপকে কখনও বুঝতে চেষ্টা করেনি। জুডিথ বুঝেছে, বিনা সংগ্রামে ওর পথ পরিষ্কার

হবে না। ক্রিসতফের মধ্যে বহু ছেলেমানুষী, অন্যায় অযৌক্তিক বহু খেয়াল আছে। এই সব আগাছা বেছে তবে মূল ও মৌল বস্তুকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু জুডিথের সব শ্রম বুঝি ব্যর্থ হ'ল। অত্যন্ত কঠিন মানুষ ক্রিসতফ। ও প্রেমে পড়েনি, তাই সর্বস্ব জুডিথের হাতে তুলে দিতে পারেনি।

সুতরাং প্রবল শিকার পেয়ে ও খেলায় মেতে উঠল। মাঝে মাঝে প্রায় হার মানে ক্রিসতফ। মিঠে কথায় পুরুষের মন গলে। বিশেষ ক'রে অভিমানের স্থানটিতে যদি কোমল হাতের স্পর্শ পড়ে। তার ওপরে শিল্পী—সে মাটির পৃথিবীর আত্মীয় নয়, স্বপ্ন-লোকের ডানা-মেলা পাখী। এই বোকাদের নিয়ে কাজ আরো সহজ। ক্রিসতফকে পথে আনতে হবে মিঠে কথায় ভুলিয়ে। সুতরাং জালটা ভালো ক'রে বিছানো চাই। কিন্তু, দু'দিন না যেতেই ক্লান্তি আসে। এতদিনে ও বুঝতে পারছে, এ-মানুষকে হাতের মুঠোয় পেয়েও লাভ নেই। এখন ক্রিসতফকে দেখলেই ওর মন বিরস হ'য়ে যায়। মানুষটা হেঁয়ালী। কিছুই বোঝা যায় না। একেবারে বোঝা যায় না তাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। খানিক দূর পর্যন্ত বোঝা যায় না; তারপর আবার বেশ, একেবারে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, স্পষ্ট। তারপরে আবার সব কুয়াশা। ও ছেলেকে বুঝতে হয় হৃদয় দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে নয়। আর নইলে সেই বস্তু দিয়ে যার মহিমায় একটা আজানা অচেনা মানুষও আর একজনের দৃষ্টির সামনে রাজরাজেশ্বর হ'য়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রেম। ক্রিসতফ-এর উগ্র ভাষার সমালোচনা, গালাগাল, টিকা টিপ্পনী বেশ বুঝতে পারে, কারণ, ওর নিজের দৃষ্টি ভঙ্গিও মতামতের সাথে মিলে যায়। কিন্তু মূর্খ এটা বোঝেনা, মনের মধ্যে যাই থাকুক না কেন তা

নিয়ে চেঁচামেচি ক'রে হাট বাঁধাতে হবে, তার কোন অর্থ নেই। বিশেষ ক'রে যেখানে ব্যবহারিক জীবনে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, সেখানে না হয় একটু চুপ ক'রেই থাকা গেল। এই যে ক্রিসতফ দুনিয়ার বিরুদ্ধে 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে আস্তিন গোটাচ্ছে তাতে কি লাভ হচ্ছে? ক'আনা? ওকি ভাবছে ওর ধমকেই পৃথিবীর মানুষগুলো গুটিসুটি মেরে রাতারাতি ভোল বদলে ব'সবে? আর না হয় তাই হলো, তাতেই বা লাভ কি? সমালোচনা কে আর কার না করছে। সবাই সব করছে, গাল দিচ্ছে, ঠাট্টা করছে, মুখ ভ্যাংচান, ঘৃণা প্রশংসা সব করছে। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা সামনা-সামনি না ক'রে ঘরে ব'সে করে। নয়তো ঘসে মেজে পালিশ ক'রে করে। যাতে কালোটাকে ঝট ক'রে কালো মনে না হয়। মানুষকে পোষ মানাতে হয় অমনি ক'রে। চিন্তার জগৎ আলাদা, কাজের জগৎ আলাদা। কাজের জগৎটা বাস্তব। ভাবো যা ইচ্ছে, কিন্তু তা কাজে করতে গেলে সাবধান। মানুষগুলো বোকা। বড় বড় ভাবনা দিয়ে মগজকে যাদুঘর বানিয়ে রেখে কোন্ পরমার্থ লাভ হবে? ওরা বোকাই, সত্য সইবার মত পদার্থ ওদের চরিত্রে নেই। কেন নিরীহ বেচারাদের ওপর অনর্থক অত্যাচার। কারো কোন দুর্বলতা দেখ, বেশ তো অন্ততঃ বাইরে মেনে যাও। মনে মনে হাসো, হাততালি দাও, ছিঃ ছিঃ করো—যা খুশি। আড়ালে বসে স্ফূর্তি করো, আনন্দ করো। আনন্দ? কেমন আনন্দ? বুদ্ধিমান ক্রীতদাসের দল যে আনন্দ পায় সে রকম? নয়তো কি? সারা দুনিয়াই তো গোলামের কারখানা! প্রত্যেকটি মানুষ দাগী গোলাম। ও-শেকল ভাঙ্গবার নয়। মিছে মাথা খোঁড়া। তার চেয়ে বরং চুপ-চাপ থাকো। প্রতিবাদ ক'রো না, বিদ্রোহ করো

না। খুশি হ'য়ে দাসত্বের শেকলটি অঙ্গে জড়াও। কোন গোলমাল থাকবে না। মানুষ তার নিজেরই গোলাম। গোলাম তার নিজের বিশ্বাস ও মতবাদের। সব বিকিয়ে দিয়ে বসে থাকে। ও-বাঁধন ছাড়াবে কে? মিছে এই আত্ম-প্রবঞ্চনা কেন? জুডিথ দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে, জার্মান-আদর্শ, শিল্প, সাহিত্য—অর্থাৎ তার গোটা চিন্তা-জগতের বিরুদ্ধে ক্রিসতফের এই বিদ্রোহের ফল শুভ নয়। আপোষ করতে যদি না পারে ছেলে, তবে সমস্ত জার্মানী ওর বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠবে। এমন কি আজ যারা ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তারাও। কেন নির্বোধ অমন ক'রে জেদ ক'রে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে। এতে কি আনন্দ পাচ্ছে ও?

ওকে বুঝবার মত চোখ থাকলে দেখতে পেত জুডিথ, ক্রিসতফ সংসারে পদ চায় না, চায় না মান, যশ। শুধু চায় আপন বিশ্বাসে সত্য হতে। শিল্প ওর জীবনখানি জুড়ে; আপনার শিল্পাদর্শে এবং নিজের ওপরে ওর পূর্ণ বিশ্বাস। এ ছাড়া ওর জীবনে বাস্তবতর বা সত্যতর নেই আর কিছু। জুডিথের কথায় মাঝে মাঝে ও ভয়ানক চটে গিয়ে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। জুডিথ জবাব দেয় না, শুধু ঘাড় বাঁকায়। পাগলের প্রলাপ ও গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। ওর ভ্রাতাটিও প্রায়ই এটা করব সেটা করব ব'লে মস্ত মস্ত ফিরিস্তি আর প্ল্যান নিয়ে হাঁক ডাক করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। জুডিথ ভেবেছিল, ক্রিসতফও ফ্রাঁন্জের মত হাওয়া-পোরা বেলুন। কিন্তু দেখল, তা-নয়; ও পাগল যা বলে, তা ওর গভীর অন্তরেরই কথা; অনুভূতিতে সত্য ব'লে যা লাভ ক'রেছে তাই। এবং তার কাজ ও কথায় তফাৎ নেই। পাগল, পাগল, বদ্ধ পাগল ছেলে।

এর পর থেকে আড়াল আর রইল না। ক্রিসতফের সামনে জুডিথের স্ব-রূপ পুরোপুরি জুডিথ-রূপ খুলে গেল। আরো দশ

জনের মতই ও জার্মান-জুডিথ। হয়তো বা বর্তমানে ওর জার্মানত্ব একটু বেশী উগ্র হয়েই উঠেছে। ইহুদীদের সম্বন্ধে অখ্যাতি আছে। ওরা নাকি শুদ্ধ জাতি নয়, 'নেশন' বলতে যা বোঝায় তা নয় ওরা। সম্প্রদায় বলা যেতে পারে। সারা পৃথিবীতে যত ইহুদী আছে সব এক সম্প্রদায়-ভুক্ত। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার, ধর্ম, ভাষা ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে থেকেও নাকি ওরা সম্পূর্ণ আলাদা হ'য়ে শম্বুকের মত আপন খোলসের মধ্যে বাস করে। কোনো দিকের কোনো প্রভাব নাকি ওদের স্পর্শ করে না, করতে পারে না। কিন্তু এ শুধু মিথ্যে অপবাদ। সত্যি যদি দেখ, দেখবে ওদের মত অত বড় গ্রহণ-ধর্মী জাতি নেই। দেশ কালের প্রভাবে অমন ক'রে সাড়া দিতে কেউ পারে না। যেখান দিয়ে ওরা যায়, তার পরিচয়কে ওরা আত্মস্থ ক'রে আপনার ক'রে নেয়। একজন জার্মান ইহুদীর মধ্যে এবং একজন ফরাসী ইহুদীর মধ্যে হয়তো সম্প্রদায়গত বহু সাদৃশ্য আছে বটে। কিন্তু পার্থক্য রয়েছে আরো অনেক বেশী। স্থান-বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেক দেশের ইহুদী বিশিষ্ট হ'য়ে আছে। যখনই যে নূতন দেশে ওরা পা দেয়, তার জল মাটি, মানুষের ধর্ম ওদের একেবারে আপনার হ'য়ে রক্ত মাংসের সাথে মিশে যায়। মন বদলাতে সময় লাগে। কিন্তু রীতি নীতি আচার ব্যবহার বদলায় বড় তাড়াতাড়ি। অভ্যাসই মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব এই উক্তি সর্বজন-সম্মত হ'লেও ইহুদীদের বেলা তার ব্যতিক্রম আছে। অভ্যাস ওদের দ্বিতীয় স্বভাব নয় একেবারে আসল স্বভাব। রক্তের ধর্ম। সুতরাং কোনো দেশের আদিম অধিবাসীরাও ইহুদীদের জাতীয়তা বোধ নেই ব'লে নিন্দে করতে পারে না। কেননা, ওদের মত অমন নিরেট জাতীয়তা তাদের নিজেদেরও আছে কিনা সন্দেহ।

নারী জাতির ওপর বাইরের প্রভাব সহজে পড়ে। ওরা আশ্চর্য-রকম পারিপার্শ্বিকের সাথে মানিয়ে চলতে পারে। প্রয়োজন হ'লে মুহূর্তে অত্যন্ত সহজে নিজেকে বদলে নিতে পারে। সমস্ত ইউরোপে দেখলে দেখতে পাবে, যেখানেই ইহুদী মেয়েরা থাকুন না কেন, সেখানকার সামাজিক এবং নৈতিক রীত-করণ ওরা আপনার ক'রে গ্রহণ করেছে; অনেক ক্ষেত্রে বরঞ্চ বাড়াবাড়িই দেখা যায়। অথচ এতটুকুও খোয়া যায় নি ওদের অদ্ভুত জাতীয় বৈশিষ্ট্য যা একাধারে তরল এবং কঠিন, এবং যা অহোরহ মনকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে থাকে। ক্রিসতফের তো তাই মনে হয়। ম্যানহাইমদের ওখানে ওদের মাসী, পিসী, আত্মীয় কুটুম্ব, জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব মেলাই সব আসেন। তাদের গাঢ় আগ্রহ-ভরা চোখের দৃষ্টিতে জার্মানীর কোনো পরিচয় নেই; নাক বেঁকে প্রায় ঠোঁটের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, প্রতিটি অবয়ব প্রখর, কটা রং-এর পুরু চামড়ার তলায় বইছে লাল রক্তের ধারা। কোনটাই জার্মানীর নিজস্ব মাটির দান নয়—তবু এরা সবাই অত্যন্ত বেশী রকম জার্মান—একই জার্মান ধাঁচের কথা বলে, এক ধরণের বেশ, আর তার জার্মান উগ্রতা। জুডিথই ওই দলের মধ্যে সব থেকে আলাদা। ওর স্বকীয়তা নিয়ে ও এই তাসের রাজ্যে বিশিষ্ট হ'য়ে আছে। ওর পরিমার্জিত বুদ্ধির মধ্যে যা অসাধারণ তা আরো দীপ্ত হ'য়ে জ্বলছে। কিন্তু দোষ ত্রুটিও অন্যদের মতই রয়েছে ওর চরিত্রে। অন্য মেয়েদের মত নৈতিক বাতিক নেই অত। সেদিক থেকে ওর মন একেবারে মুক্ত। কিন্তু অন্যদের মত সমাজকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি ও। ওর ব্যবহারিক বুদ্ধি তার প্রতিবন্ধক হ'য়েছে। ও সমাজকে তো মানেই, শ্রেণী-সমাজকে মানে, সমাজের যত কুসংস্কারকে মানে। অভিজ্ঞতায় দেখেছে, আখেরে ভারী স্থবিধে হয়। জার্মান-বৈশিষ্ট্যকেও বিদ্রূপ করে না। খাঁটি

জার্মানদের মতই ওর জার্মানপনা ওর বুদ্ধি-শানিত দৃষ্টির সামনে প্রখ্যাত শিল্পীদেরও দৈন্য গোপন থাকেনি। তাদের সামনে অবশ্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে প্রশংসা করে। যে-হেতু শিল্পী যে-সে লোক নন, দেশ-জোড়া যশের সঞ্চয় রয়েছে তাঁর। ব্রাহ্মের সঙ্গীত ও একটুও পছন্দ করে না। ওর বিচারে ব্রাহ্ম দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী। কিন্তু ভদ্রলোক শিল্পী ব'লে প্রখ্যাত এবং জুডিথও পাঁচ ছ' খানা চিঠি পেয়েছে তাঁর কাছ থেকে। তাই তার স্বীকৃতির তকমা বেচারার কপালে জুটেছে। ক্রিসতফ যে কত বড় গুণী আর লেফটেনাণ্ট ফিশার যে কত বড় অপদার্থ তা ওর বুঝতে বাকী নেই। কিন্তু লেফটেনাণ্ট সাহেবের টাকা আছে, আর জুডিথের জন্য সে বুঝি জানও দিতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে ক্রিসতফের মত মানুষের নিরামিষ বন্ধুত্ব নেহাৎ ফিকে মনে হবেই।

রাজ-কর্মচারীদের মাথা নিরেট হলেও আভিজাত্যে তারা কুলীন। লোকগুলির গুমর কত। মেয়েরা কাছেই ঘেঁষতে পায় না; তার ওপর ইহুদী মেয়েদের তো কথাই নেই। কিন্তু ও-সব সামন্ত-তান্ত্রিক চাল গ্রাহ্য করে না জুডিথ। লেফটেনাণ্টকে ও যদি বিয়ে করতে রাজী হয় তবে তা লেফটেনাণ্টরই সৌভাগ্য। এ ও ভালো করেই জানে। এতটা জানা সত্ত্বেও মরা শিকারকেই আবার শিকার ক'রতে কোমর বাঁধে। নানা রকম ছলা কলা দিয়ে লোকটার মন ভোলাতে গিয়ে উঁচু মাথাটা একেবারে ধুলায় লুটিয়ে দিল ব্যাংকার লোথেয়ার ম্যানহাইমের গর্বিতা মেয়ে জুডিথ ম্যানহাইম। গর্ব করা এ মেয়েরই সাজে। তাই এতদিন মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়েদেরও ঘৃণা ক'রে এসেছে। কিন্তু আজ তাদেরই সাথে সমান ভূমিতে নেমে এল জুডিথ।

নূতন পরিচয়ের এই অভিজ্ঞতা বড় বেশী দিন স্থায়ী হ'ল না।

জুডিথের সম্বন্ধে ভুল ভাঙ্গতে বেশী দিন লাগল না। যাচ্ছে যাক্। ওকে ধ'রে রাখার কোনও চেষ্টা ক'রলে না জুডিথ। জুডিথেরা করেও না। পুরুষকে যে-মুহূর্তে বুঝে নিলে সে-মুহূর্তেই সে-পুরুষ ফুরিয়ে গেল ওদের কাছে। ক্রিসতফও ফুরিয়ে গেল একদিন অমনি করে। যায় যাক। পেছন ফিরে চাইবেনা জুডিথ; দেখবে না মুখ তুলে। কুকুর বেড়ালের কাছে বিবস্ত্র হ'তে মানুষের যেমন লজ্জা নেই; ফুরিয়ে-যাওয়া পুরুষের কাছে আপনার স্বরূপকে বে-আব্রু ক'রে খুলে দিতে পারে মেয়েরা তেমনি অচঞ্চল নির্বিকার চিত্তে। কোথাও বাধে না। বাধল না জুডিথেরও। ক্রিসতফের সামনে এ যেন আরেক জুডিথ। কি অহংকার! কি অহংকার! নিরুৎসুক, নির্বিকার, নির্লিপ্ততায় সুদূর। ওর ঔদাস্যের হিম-শৈলে পৃথিবীর বক্ষ-স্পন্দনের দোলা লাগে না। প্রথম দেখার সে-দীপ্তিময়ীকে কোথাও আর খুঁজে পাওয়া গেল না। যে আছে সে বৈশিষ্ট্যহীন নিতান্ত সাধারণ এক মেয়ে। ক্রিসতফ জুডিথের মধ্যে আপনাকে খুইয়ে ফেলেনি; সে সময় হয়নি। কিন্তু তবুও হারানোর বেদনায় ওর বুক জ্বলতে থাকে। সাধারণী বিলাসিনী জুডিথকে হারিয়ে ওর কোন ক্ষোভ নেই। জুডিথ যা হ'তে পারত, যা হওয়া উচিল ছিল, বিলীয়মানা সেই সম্ভাবিত প্রতিমাকেই ওর মুগ্ধ হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলী। জুডিথের অপূর্ব চোখ দু'টি কি এক গভীর বেদনা-ভরা রোমাঞ্চের রংএ ওর হৃদয়কে রাঙ্গিয়ে রেখেছে। ও-চোখ ভুলবার নয়। কিন্তু ওই বর-রুচি, সাগরের মত গভীর দৃষ্টির আড়ালে যে এত বড় দীন কৃপণ আত্মা লুকিয়ে ছিল, তা ও কেমন ক'রে জানবে। জেনেছে আজ। আজও তো প্রথম-দেখার দিনের অসামান্যা কন্যার সেই অসামান্য আলোকাম্বর রূপই ওর সমস্ত মানস-লোক ছেয়ে আছে। সমস্ত দৈন্য ছাপিয়ে এক ষড়ৈশ্বর্য-শালিনী প্রতিমা

আজও যে ওর চোখ ভ'রে আছে। এও প্রেমেরই আলেয়ার লীলা। শুধু আলেয়ার ছলনা ; আলো নেই। মনে হয় বুঝি প্রেম, কিন্তু প্রেম নয়, শুধু শান্তি···প্রেমস্পর্শহীন···। সাধারণতঃ শিল্পীর জীবনেই এ ভ্রান্তি ঘ'টে থাকে। এমন এক একটা সময় আসে যখন শিল্পীর জীবন ভ'রে ওঠে না তার শিল্পের ধ্যানে। শিল্প-সাধনা জীবনের একান্ত সাধনা হ'য়ে উঠবার মত রসদ পায় না। সেই ফাঁকখানি বেয়েই ওই ভ্রান্তির আনাগোনা। আলেয়াকে মনে হয় আলো। মনে হয় ওই যে বুক দুলে উঠল, ওই যে চোখে লাগল রং—ও প্রেমেরই দোলা, প্রেমেরই রং। কিন্তু ভুল। প্রেম নয়। প্রেম নেই বুকের তলায়। আছে শুধু শিল্পী-মানসের সৃষ্টির আকৃতি। পথে যেতে যেতে চলতি মানুষের ভিড়ে কোন অজানা পথিক হঠাৎ শিল্পীর অন্তর-বীণা খানাকে ছুঁয়ে গেল। অমনি তার তারে তারে সুর বাজল, 'আজু রজনী হম ভাগে পোহাইনু, পেখনু পিয়া-মুখ চন্দা···' কিন্তু উদাসী পথিক পিয়া-মুখ-চন্দার সুধার খবর রাখেনি। সে তার আপন পথে অমনি চ'লে গেল। কিন্তু সুধা ঢেলে রেখে গেল শিল্পীর মানস-লোকে। উদাসী বৈরাগী পাগলা ক্ষ্যাপাটা মনের মানুষ হ'য়ে তার অন্তরে আসন পাতল। কিন্তু পথিকের যে অত রূপ ছিল তার খবর সে নিজে রাখেনি, আর কেউ তা দেখেনি, দেখবে না। লোক-চক্ষুর আড়ালে একদিন তা অমনি ঝ'রে যেত। এক দিন যে এ রূপ সত্য হ'য়ে জীবন্ত হ'য়ে মাটির গেরুয়াকে সুধায় ভ'রে ছিল, সে-খবর কেউ রাখবে না। তাই তো শিল্পীর অত প্রেম সেই অবহেলার ধনের 'পর।

হয়ত ক্রিসতফ আত্ম-প্রবঞ্চনাই করেছে। জুডিথ জুডিথই। তার বেশী কিছু সে হ'তে পারে না। কিন্তু তাকে বিশ্বাস ক'রেছিল ও। সে-মোহ এখনও চোখে লেগে। তাই আজ ও জুডিথকে

যে-মন দিয়ে বিচার করছে তা নিরপেক্ষ সত্য বিচার হ'তে পারে না। যে-সুষমা ও তার মধ্যে দেখেছিল সেদিন, ও জানত তা জুডিথেরই। অশুভ যা ওর মধ্যে তার জন্য দায়ী তো সে নয়। জার্মানী ও ইহুদী এই দুই সংস্কৃতির সংঘাতের ফল তা। জার্মান জাতটার উপর ওর রাগ বেশী, কেননা অশেষ দুর্ভোগ ওকে ভুগতে হ'য়েছে ও জাতটার জন্য। আর কোন দেশ ও দেখেনি। অপর কোন জাতির কোন মানুষের সাথে পরিচয়ও হয়নি। দুর্ভাগা দেশটাকে পেয়েছে ও হাতের কাছে। পৃথিবীর যত পাপের বোঝা চাপিয়ে হাল্কা হবার মত একটা অজুহাত পেয়ে ও হাঁফ ছাড়ে। জুডিথ যে নিষ্ঠুর হাতে ওর স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিল, তার জন্য এতটুকু দোষ দিল না ওকে। সে অপরাধও হতভাগা দেশের হতভাগ্য জল হাওয়ার। ওই ঐশ্বর্যবতী মেয়ের আত্মাকে যে-দেশ অমন ক'রে হত্যা করেছে তাকে ও কিছুতেই ক্ষমা ক'রতে পারে না।

অনেক আশা ছিল ওর ইহুদী সমাজের কাছ থেকে। ভেবেছিল, শক্তিমান জাতি; আর কিছু না হোক ওর শিল্প-সংগ্রামে অন্ততঃ সে-শক্তি ওর সহায় হবে। কিন্তু কাজে হ'ল বিপরীত। ওকে আশা ছাড়তে হ'ল। ওর অন্তর্জ্ঞান অন্ত্যত আবেগধর্মী ও প্রসরণশীল। তারই ক্রিয়ায় ও কেবলি ছিট্‌কে ছিট্‌কে বেড়ায় এ প্রান্ত থেকে বিপরীত প্রান্তে। মুহূর্ত কোথাও ওর স্থিতি নেই। ইহুদীদের সম্বন্ধে এতদিন যা ভেবেছিল, আবেগ-প্রবণ মনোধর্মেরই ক্রিয়ায় আজ সে-মত বদলে গেল। আজ ওর মনে হয়, কোথায় শক্তি? অত্যন্ত দুর্বল জাতি ইহুদীরা। যা ভেবেছিল তা নয়। বাইরের প্রভাব অতি সহজে ওদের পরিবর্তন ঘটায়। প্রকৃতিগত দুর্বলতা তো ওদের আছেই, তার ওপরে পথ চলতে চলতে দুনিয়ার মানুষের কাছ থেকে আরো কত

এসে জুটেছে। সুতরাং ঐ দুর্বল জাতের কাছ থেকে কি সাহায্য আর পাওয়া যাবে! বরঞ্চ ওদের সাথে থাকলে মরুভূমির বালিতে খোয়া যাবার যথেষ্ট ভয় আছে।

অতএব বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ ও ম্যানহাইমদের ওখানে যাওয়া ছেড়ে দিল। বারংবার ডাক এসেছে, কিছু না বলে অমনি ক্ষমা চায় যেতে পারছে না ব'লে। ক'দিন আগেও একটি দিনও না গিয়ে থাকতে পারে নি, ছট্‌ফট করেছে। অতএব ওর এই হঠাৎ পরিবর্তন অনেকের চোখেই ঠেকল। তারা বললে খেয়াল। শুধু ম্যানহাইমরা ভাবল জুডিথই কিছু একটা করেছে।

খাবার টেবিলে জুডিথ ঘার বেঁকিয়ে বলে: 'বেশ তো। অত আর সাধাসাধি কেন? আসবার হয় আসবে।'

এদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে ক্রিসতফকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টার কিছু বাকী রাখলে না ও। ওকে চিঠি লিখলে সঙ্গীত বিষয়ে এমন একটা খবর জানতে চেয়ে যা ক্রিসতফ ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না। শেষের দিকে একটু অনুযোগও রইল আজকাল ক্রিসতফ তেমন আসা যাওয়া করে না ব'লে। এক দিন এলে ভারী খুশি হবে জুডিথ। এই উত্তরে প্রার্থিত সংবাদটি পাঠিয়ে দিলে ক্রিসতফ, সেই সাথে জানিয়ে দিলে, সে ভারী ব্যস্ত আজকাল। থিয়েটরে দেখা হয় কখনও কখনও। ক্রিসতফ জোর ক'রে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। জুডিথ তৈরী হ'য়েই থাকে, ক্রিসতফের চোখে চোখ পড়লেই হাসিতে মধু ঢেলে স্বাগত করবে ওকে। কিন্তু ক্রিসতফ যেন দেখেই না ওকে। জুডিথের ধৈর্য থাকে না বেশীদিন; কেন মিছে সাধছে অত। কি এমন দায় পড়েছে। আসার হ'লে আসবে। নইলে ব'য়েই যাবে। ওকে না হ'লে যেন দুনিয়া চলবে না ...

সত্যি ব'য়েও গেল না, ম্যানহাইমদের সান্ধ্য আসর ফাঁকাও হ'য়ে গেল না। জুডিথ আমল দিতে চায় না অপদার্থটাকে, কিন্তু তবু মনে পড়ে, তবু রাগ হয়। ক্রিসতফ যখন ছিল, ওকে নিয়ে মাথা ঘামাত না জুডিথ; কিন্তু তার রাগ যে এতদূর গড়াবে শেষ পর্যন্ত একেবারে সম্পর্কই শেষ ক'রে দেবে ক্রিসতফ, তা ভাবতে পারেনি ও। ওর মনে হয় ক্রিসতফের এ শুধু গুমর। ভালো বাসলে এমন কঠিন প্রাণ হ'তে পারে? জুডিথের নিজের না হয় বহু দোষ আছে, কিন্তু তা অন্যের মধ্যে কেন থাকবে? ও কিছুতেই ক্ষমা ক'রতে পারে না।

ক্রিসতফের চলা ফেরা, কাজ, লেখা তীব্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে জুডিথ। ভাইয়ের সাথে গল্পগুজব করার সময় ক্রিসতফের প্রসঙ্গ ওঠে; কার কৌশলে বলাই বাহুল্য। যেন ও কিছুই বলছে না এমনি ভাবে অতি কৌশলে কথার মোড় ঘুরিয়ে ওই এক প্রসঙ্গে নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম টিপ্পনী কাটে যাতে ও ধরা না পড়ে।

কিছুদিন পত্রিকার কাজ চলল মন্দ নয়। ওর তুলনায় সহকর্মীরা কিছুই নয় তা ও প্রথমে বুঝতে পারেনি। পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে ক্রিসতফ একজন। তারা ওকে প্রতিভা ব'লে সম্মান দেয়। ম্যান-হাইমই ওকে আবিষ্কার করে প্রথম। সুতরাং ক্রিসতফের কোন লেখাই না প'ড়ে ও ব'লে বেড়ায় সর্বত্র যে ক্রিসতফ পণ্ডিত সমালোচক। এও ব'লে: ক্রিসতফ পথ ভুল ক'রে ভিড়ের মধ্যে পচছিল। ওই তাকে আবিষ্কার ক'রেছে। কৌশলে ঘোলাটে ভাষায় ওর লেখার বিজ্ঞাপন দেয়—সকলে উৎসুক হ'য়ে ওঠে। তারপর প্রথম লেখা যখন বেরুল—যেন জলের বুকে কেলিরত হাঁসের দলের মধ্যে ঢিল ছুঁড়ল কেউ। ক্রিসতফ লিখল:

"সঙ্গীত সঙ্গীত করিয়া যে প্রকার মাতামাতি চলিয়াছে,

তাহাকে ঔদরিক-বৃত্তি বলিলেই ঠিক বলা হইবে। ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকুক আর না থাকুক, প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক কেবলি খাইয়া চলিয়াছে ঔদরিকের দল। ইহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে: এই ক্ষুধা অসুস্থের ক্ষুধা—খাদ্যের উপর শুধু অন্ধ লোলুপতা। সুতরাং খাদ্যাখাদ্য যাহাই সম্মুখে আসিতেছে—বিঠোফেন, ম্যাসক্যাগনী, য়্যাডাম, বাখ, পুসিনি, মোজার্ট, মার্শনার—যাহাই হউক না কেন, লোভীর দল নির্বিচারে তাহারই উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে, এবং দুই হাতে মুখে পুরিতেছে। একবার নির্বোধেরা তাকাইয়া দেখেওনা উহা কি বস্তু। কোনও মতে মুখে পুরিয়া দিতে পারিলেই হইল। ইহাকে আহার করা বলে না গোগ্রাসে গলাধঃকরণ বলে। খাওয়ার আনন্দ হইতে দুর্ভাগারা বঞ্চিত। যে-কোন কনসার্টের আসরে গেলেই এই সত্য অতি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। যাহারা সেখানে যায় তাহারা রস-বেত্তা হিসাবে রস-বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে যায় না, শুধু স্ফূর্তি লুটিতে যায়। কিন্তু সত্যিকার স্ফূর্তি করিতে উহারা জানে না। কালাকাল, স্থানাস্থান নির্বিশেষে হো হো করিয়া হাসিয়া মাতলামি করে শুধু। ইহাকেই বলে জার্মান-স্ফূর্তি। উহাদের হাসি যেমন, কান্নাও তেমনি বৃষ্টির মত ঝর্ ঝর্ করিয়া হামেশাই ঝরে। উহাদের আনন্দ ঠিক ধূলার সামিল। না আছে তাহাতে প্রাণ, না আছে বলিষ্ঠতা। মুখে অর্থহীন হাসি টানিয়া নির্লিপ্ত ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সঙ্গীতের আসরে বসিয়া ইহারা শুধু কতগুলো শব্দই গিলিয়া যায়। না কিছু ভাবে, না বোঝে। একেবারে যেন স্পঞ্জ। বোতলের ছিপি খুলিয়া মদ ঢালিতে পার যখন খুশি ; কিন্তু মানুষের হৃদয়ের সত্য আনন্দ, বেদনা, শক্তির বেলা সে ব্যবস্থা চলে না। বরঞ্চ উহারাই এমনি প্রবল হইয়া উঠিবে যে, তোমাকে অভিভূত

করিয়া ফেলিবে। তারপর যখন চলিয়া যাইবে তখনও তোমার হৃদয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়া যাইবে। ওই পূর্ণতার মধ্যে অন্য সব স্বাদ বিলীন হইয়া যাইবে। তোমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না।

"সঙ্গীত লইয়া যথেষ্ট মাতামাতি করিয়াছেন আপনারা। আপনারা পরস্পরকে হত্যা করিতেছেন, সঙ্গীতকে হত্যা করিতেছেন। খুনাখুনি যত খুশি করুন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। আপনাদের ব্যাপার, উহা লইয়া আমি মাথা-ব্যথা করিব কেন? কিন্তু সাবধান! সঙ্গীতে হাত দিতে আসিবেন না। সঙ্গীতের নামে যে যথেচ্ছাচার চলিতেছে, তাহা বরদাস্ত করিব না। দেবতার নৈবেদ্যকে আপনারা আস্তাকুঁড়ের আবর্জনার সহিত এক পাত্রে রাখিতেছেন। এই ঘোর অনাচার আর চলিতে দেওয়া হইবে না। নিজেদের সঙ্গীত-রসিক বলিয়া হাঁক ডাক করিয়া যাঁহারা আস্ফালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলিবেন কি কোন্ জাতীয় সঙ্গীতে তাঁহারা রস-বোধ করিয়া থাকেন? ভালো জিনিসটিই তাঁহারা ভালো বাসেন, না পচা গলা দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসে তাঁহাদের রসনায় রস-সঞ্চার হইয়া থাকে? ভালো মন্দ সব ক্ষেত্রে সমভাবেই আপনাদের করতালি বাজিতে দেখা যায়। যাহাই হউক, একটা পথ বাছিয়া লউন। কোন্ জাতীয় সঙ্গীত আপনারা চান, তাহা স্থির করিয়া লওয়া প্রয়োজন। সম্ভবতঃ আপনারা নিজেরাই জানেন না আপনারা কি চান, জানিবার বাসনাও আপনাদের নাই। কোনও একটি দিকে গিয়া দাঁড়াইতে আপনাদের ভয়...ভীরু! ভীরু! ভীরু কাপুরুষের দল! আপনারা নিজেকে দলগত মতবাদের ঊর্ধ্বে বলিয়া গলাবাজী করিয়া থাকেন! ইহা কি নির্দলীয় হইয়া থাকার প্রমাণ না তাহার বিপরীত?"

বিখ্যাত জার্মান লেখক ও কঠোর সমালোচক গটক্রিড কেলার-এর লেখা থেকে উদ্ধৃত ক'রে আপন পক্ষ সমর্থন করে ও: "দলগত মতবাদের ঊর্ধ্বে বলিয়া যাহারা অহংকার করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই উক্ত মহাপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।"

ক্রিসতফের কলম চলে: "ভীরুতা ছাড়িয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ান। কঠোর হইলেও সত্যকে অকুণ্ঠে প্রকাশ করিবার সাহস চাই। নিকৃষ্ট সঙ্গীতই যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে অকপট চিত্তে তাহা স্বীকার করুন। আপনারা সত্যকার রূপে সহজ হইয়া সকলের সম্মুখে নির্ভীক ভাবে দাঁড়ান। সর্বপ্রকার ছলনা, দ্বিধা হইতে চিত্তকে মুক্ত করুন। নির্মল জলে আত্মাকে ধৌত করিয়া পরিশুদ্ধ করুন। সম্ভবতঃ শীঘ্র আরশিতে নিজের চেহারা আপনারা দেখেন নাই। হে সঙ্গীতকার, সুরকার, গুণী, শিল্পী, গায়ক আর শ্রোতৃবৃন্দ, আপনাদিগকে আমি আত্মদর্শন করাইব...আপনারা সত্য হউন; যাহাই ঘটুক সত্য হউন, ছলনা দ্বারা আপনার স্ব-রূপ আবৃত করিবেন না। শিল্পই হোক, আর শিল্পীই হোক...সর্বক্ষেত্রে সত্য...সত্যকে স্বীকার করুন। আমার দিকে চাহিয়া দেখুন, সত্যের জন্য আজ কি নিদারুণ দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছে আমাকে। শিল্প এবং সত্য—দুই এক সাথে যদি বাঁচিতে না পারে তবে শিল্প নিঃশেষ হইয়া যাক। মিথ্যা মৃত্যু...সত্যই জীবন। সত্য শিব, সত্য সুন্দর।"

স্বভাবতঃই চারদিকে একেবারে হৈ হৈ প'ড়ে গেল। কিন্তু ক্রিসতফ সাধারণ ভাবেই সমালোচনা করেছে, কোন ব্যক্তি বিশেষকে নয়, সেজন্য প্রথম কেউ অতটা গায়ে মাখল না। পাগলের প্রলাপ বলে অবহেলায় পাশ কাটিয়ে গেল। সুতরাং বিশেষ প্রতিবাদের ভয় রইল না। তা ছাড়া কে করবে প্রতিবাদ? কে যেচে গিয়ে ওই অপবাদ গায়ে

মাখবে ! নিজের চোখে সকলেই দেবতা, এবং সেই দেবত্ব সকলেই সাড়ম্বরে প্রচার করেন। ক্রিসতফের লেখার বিষয়-বস্তু ততটা নয়, কিন্তু লেখার মধ্যেকার উদ্ধত সুরটা সাধারণ ভাবে সকলেরই অভিমানে গিয়ে বাজল। ক্রিসতফকে শিল্পী-সমাজ এখনও পংক্তি দেয়নি। একজন ভুঁইফোঁড় এসে ওদের চোখ রাঙ্গিয়ে যাবে—এ ধৃষ্টতা কি ক'রে সওয়া যায়। তা ছাড়া যা বোঝা যাচ্ছে ও এখানেই থামবে না। কয়েকজন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং কড়া প্রতিবাদও করলেন। কেউ কেউ, গোঁয়াড়টা আবার কি না কি ব'লে বসে সেই ভয়ে ওর সাহস ও স্পষ্ট ভাষণের জন্য মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা ক'রে ওর মুখ বন্ধ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফল একই। ক্রিসতফ ঝাপ দিয়েছে, ওকে থামায় কার সাধ্য। কাউকে ও ছাড়লে না।

কিন্তু অর্কেষ্ট্রা সম্পর্কে শুধু সাধারণ মন্তব্যেই শেষ হ'ল না। যে যেখানে আছে একেবারে সবার নাম ধ'রে ধ'রে এল আক্রমণ। নাম কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে উহ্য থাকলেও, ইঙ্গিত হল এত স্পষ্ট যে কারো বুঝতে বাকী রইল না, লক্ষ্য স্বয়ং দরবারী ওস্তাদ বৃদ্ধ য়্যালো ফন্ ওয়ারনার। সাবধানী মানুষ, খেতাব পেয়েছেন মেলা। সব কিছুতে ভয়ে কুঁকড়ে থাকেন। অতএব পালিয়ে আর এড়িয়ে বেড়ান। কাউকে কিছু বলেন না সাহস ক'রে। তাইতে সাহস পেয়ে যা খুশি তা করার অবাধ অধিকার পেয়েছে অধস্তনের দল। অর্কেষ্ট্রার প্রোগ্রামে অতি হিসেব ক'রে এমনি সব জিনিস রাখেন যার পেছনে অন্তত গোটা কুড়ি বছর ধরে হাততালির খুঁটি আছে, অথবা আছে একেবারে সরকারী স্বীকৃতির তক্‌মা। ক্রিসতফ ওর বীরত্বকে বাহবা দেয় বুক ঠুকে; নিভুর্ল হাতের ওস্তাদীকে তারীফ করে শতমুখে; মিনতি ক'রে লেখে কখনও : 'অত পরিশ্রম করবেন না, শরীরটার একটু যত্ন নিন। শরীরটা দেখুন।'

বিঠোফেনের কোনও সুরকে হয়ত সে বেচারা নিজস্ব ধরনে অর্কেস্ট্রায় প্রয়োগ করেছে। ক্রিসতফের কঠিন লেখনী বারুদ বর্ষায় :

"আনো আনো কামান আনো! কামান দাগিয়া এই অপদার্থের দলকে উড়াইয়া দাও। মানুষের এই নিদারুণ মূঢ়তা আর নির্লজ্জতার সাথে অহরহ লড়াই চলিতেছে শক্তির; যে শক্তি বীরদর্পে ওই মূর্খতাকে পদতলে দলিয়া পিষিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। আপনারা জানেন না ইহা। কি করিয়াই বা জানিবেন ? এই সংগ্রাম যে আপনাদেরই বিরুদ্ধে। শক্তি আপনাদের আছে, কিন্তু তার সবটাই ক্ষয় হয় বিঠোফেনের 'ইরোয়কা' হাঁই না তুলিয়া [ জানি আপনাদের ভীষণ বিরক্ত লাগে··· স্বীকার করিলেই তো হয় কথাটা!] শুনিবার এবং বাজাইবার কসরৎ করিতে করিতে এবং রাস্তা দিয়া কোন 'বড় লোক' যাইবার কথা শুনিলেই, তাহাকে সেলাম ঠুকিবার জন্য রোদে জলে খালি মাথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে। তাই আপনাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম!"

যাঁরা অতীতের মহাচার্যদের রচনাকে ক্ল্যাসিক আখ্যা দিয়ে থাকেন তাদের প্রতি ওর বিদ্রূপ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু যথেষ্ট কড়া ভাষা খুঁজে পায় না।

ক্রিসতফ লেখে: "ক্লাসিক্যাল! নামেই বেশ বোঝা যায় ও কি বস্তু। হৃদয়ের সহজ আবেগের ঝাড়া-পোছা ইস্কুল সংস্করণ! জীবনের ওই যে নিঃসীম মহা প্রান্তর, অহরহ যাহার বুকের ওপর উন্মত্ত বায়ুর দাপাদাপি চলিতেছে, প্রাচীর-ঘেরা পাঠশালার খেলার মাঠে পরিণত হইয়াছে তাহা তোমাদের ওই ক্লাসিক্যাল-এ। বেদনা-মথিতের হৃৎস্পন্দনে যে বলিষ্ঠতা, যে মর্যাদা, তাহাই হইয়া উঠিল, কালের স্কন্ধে ভর করিয়া নির্বিকার চিত্তে দুলিতেছে ওই যে ঘড়ির দোলক, তাহারই টিক্‌টিকানি! সমুদ্রের স্বাদ পাইতে চাও তোমার ওই রঙিন মাছ-ভরা

কাঁচের পাত্রের জলে ?—জীবনকে হত্যা করিয়া তোমরা জীবনের পরিচয় লও।”

ভ্রাম্যমান অর্কেষ্ট্রার দল যারা নামী ওস্তাদের নাম নিয়ে বুক চিতিয়ে বেড়ায় তাদের ওপর ও আরো নির্মম হ'য়ে উঠল। তাদের হাতের প্যাঁচে নিতান্ত চেনা জিনিসের চেহারাও এমনি বদলে যায় যে, আর চেনা যায় না। 'সি মাইনরে' সীমফোনী বাজাতে গিয়ে ওরা ডিগবাজী খায়। ক্রিসতফ ওদের বলে জিপ্‌সী। ওরা শিল্পী নয়, বাজীকর, দড়ির ওপর নাচের কসরৎ দেখান ওদের কাজ।

এই সব গুণীদের দেখে দেখে ওর লেখার রসদ জোটে প্রচুর। ও বলে, ওরে বাস্‌রে, এহেন ওস্তাদদের সমালোচনা করার ওর সাধ্য কি? ওই সব কায়দা-দুরস্ত কসরতী প্যাঁচ কি আর সঙ্গীত সমালোচনার আওতায় পড়ে! ও সব শিল্প-বিস্তালয়ের জিনিস। সমালোচনা দিয়ে কি আর অত মেহনতের ওজন হয়? সে বরং চার্ট করো —কটা প্যাঁচ পড়ল, কতখানি লম্বা ক'রে টানা হ'লো বেহালার ছড়, মিড়-গমকের খেলা কোথায় কতটা। অংকের হিসেবে গুণীর গুণের আর মেহনতের ওজন-দর ঠিক হ'য়ে যাবে। নাম-করা বাজিয়ে ঘন্টা দুই ধ'রে কনসার্টে বাজালেন মোজার্টের একটা নেহাৎ ছেলেমানুষী গৎ; ওষ্ঠের কোণে ফুটে উঠেছে মুস্কিল আসানের হাসি। চুলের গোছা এসে পড়েছে চোখের ওপর। ক্রিসতফ একে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। কিন্তু বিঘ্ন-জয়ের আনন্দটুকুকে অস্বীকার করলে না। কারণ, এ-আনন্দের স্বাদ ও নিজে পেয়েছে—জানে দুঃখ-সাধন জীবনের কত বড় ঐশ্বর্য। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে তার বীর্যকে বাদ দিয়ে শুধুই স্থূল দিকটাকে দেখা কেমন জানি ওর হীন মনে হয়।

গাইয়েরাও বাদ পড়ে না ; সঙ্গীতের নামে বর্বর গলাবাজী, আর

আস্ফালনকে গাল দেবার ভাষা খুঁজে পায় না ও। সম্প্রতি ওই বিখ্যাত গায়িকাটিকে নিয়ে ওর রাগ। ওকে যে ফ্যাসাদে প'ড়তে হ'য়েছিল ভেবোনা রাগ ঐ জন্যই। তা নয়। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাই ওকে কঠোর করেছে। যত অনুষ্ঠান ও দেখেছে, শুধুই পীড়িত হয়েছে। পীড়াটা কানের হয়েছে বেশী, না, চোখের, তা বলা কঠিন। পরিকল্পনা, সংযোজনা, সাজ-সজ্জা—সবখানেই দেখেছে এমনি স্থূল রুচির পরিচয়। রসিক মনকে পীড়া দেয়। পোষাকের রং অস্বাভাবিক উগ্র—মনে হয় তারা যুদ্ধং দেহি ব'লে চোখ রাঙ্গিয়ে আছে। রস-বস্তুর অমন মোটা হাতে পরিবেশন আর ওর চোখে পড়েনি। তারপর অভিনয়ের নামে কেবল বিচিত্র মুখ-ভঙ্গি আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রবল আস্ফালন; কিন্তু অভিনেতারা নির্লিপ্ত; ভূমিকার সাথে তাদের বা অভিনয়ের কোনও যোগ নেই। দেখে ও স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। নানা ভঙ্গীর হাঁক ডাক লম্ফ-ঝম্পের মধ্যে অভিনেতাকেই অত্যন্ত বেশী ক'রে দেখা যায়; আসল নাটকের পাত্র-পাত্রীকে কোথাও দেখা যায় না। ওদের অঙ্গ-ভঙ্গি এবং মুখ-ভঙ্গি ভাবের অভিব্যক্তি নয়, ফরমুলায় ফেলা পেশী-সঞ্চালন মাত্র। স্থূলাঙ্গিনী প্রৌঢ়া অবলীলায় 'কারমেন' আর 'যশলডির' ভূমিকায় নেমে প্রেক্ষা-গৃহ মাতিয়ে তোলেন। এদিকে যাই হোক—সংগীতাংশের অনাচার ওর সহ্য হয় না; বিশেষ ক'রে ক্ল্যাসিক্যাল অংশ—সুর-সঙ্গতি ও মাধুর্যই যার প্রাণ-বস্তু। অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গীত বিশুদ্ধ তান লয়ে গাইবার মত শিল্পী জার্মানীতে বিরল। অত মেহনৎ ক'রে এ সাধনা করবার মত মানুষ নেই। গ্লাক্, মোজার্টের বিশুদ্ধ সুনির্দিষ্ট সঙ্গীত ধারায় গ্যেয়টের কাব্যের মত ইতালীয় আকাশের আলোর স্বচ্ছতা। কিন্তু তার পরবর্তীকালে ধারা বদলে গেল। ওয়েবারের যুগে সঙ্গীত

যেন ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল রাগের জেলুসে। এই রীতিকেই পরবর্তী কালে 'ক্রোসিয়েটো'র রচয়িতা প্রচুর বিদ্রূপ করলেন, প্রচুর মুখ ভ্যাংচালেন এবং অবশেষে হ্বাগনারের প্রতিষ্ঠার সাথে তার একেবারে মৃত্যু হ'ল। এখন আর কেউ গায় না, সুর ক'রে কবিতা বলে। সুরের সূক্ষ্ম কারু-কার্য থাকল বা না থাকল তাতে কিছু যায় আসে না। বেসুরো হ'লেও ভ্রূক্ষেপ নেই। এখন হাল আমলের আমদানী ভাব-প্রধান। শুধু ভাব চাই…

"ভাব! বেশ তো সেই কথাই আলোচনা করা যাক। কিন্তু কয়জন বোঝে ভাব?" ও লেখে: "যাই হোক, বোঝ আর নাই বোঝ, ভাব স্বয়ং যে বাহন খুঁজিয়া নিয়াছে তাহার অমর্যাদা করিও না। সঙ্গীত সঙ্গীতই হোক, এবং সঙ্গীতই থাক।"

ভাব এবং ব্যঞ্জনা নিয়ে জার্মান সঙ্গীত-কারদের এতখানি উদ্বেগে ওর বেশ মজা লাগে। ভাব? ব্যঞ্জনা? মাইকেল এ্যান্‌জেলোর ভাস্কর্যই বল আর এক লাছি উলই বল, সব খানেই চাই ভাব আর ব্যঞ্জনা। কোথাও পক্ষপাত নেই। সব গানই ওরা গায়, সবসুর বাজায় সমান আগ্রহে। ক্রিসতফ বলে দরাজ গলায় সুর ক'রে খানিকটা হট্টগোলকেই ওরা সঙ্গীত ব'লে দু'হাত তুলে নাচে। জার্মানরা সঙ্গীত অত্যন্ত ভালোবাসে। সঙ্গীত-প্রীতি জার্মানীর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ওদেরও তো ওই কণ্ঠ-স্বরের জিম্‌ন্যাস্‌টিকই। যতটা পারো ফুস্‌ফুস্‌ ভ'রে হাওয়া নিয়ে, অনেকক্ষণ ধ'রে টেনে রেখে, গায়ের জোর দিয়ে গিটকিরী গমক নানান কায়দায় খেলিয়ে সেই হাওয়াটাকে বের ক'রে দেওয়া। কোনো একজন ওস্তাদ গাইয়েকে একদা সার্টিফিকেট দিয়েছিল ও স্বাস্থ্যবান ব'লে।

শিল্পীদের চাবুক মেরেই ক্রিসতফ শান্ত হয় না। শ্রোতাদের গাল

দেয় আদেখলে ব'লে—যেন কোন দিন গান শোনেনি তাই এসব শুনতে ছুটে আসে হাঁ ক'রে। মানুষ এই হঠাৎ আক্রমণে হক্‌চকিয়ে যায়। হাসবে না রাগ করবে স্থির ক'রে উঠতে পারে না। আক্রমণটাকে অন্যায় ব'লে মনে হয় এবং প্রতিবাদ ক'রতেও ইচ্ছে হয়। কিন্তু ওস্তাদী লড়াই থেকে ওরা দূরে থাকতে চায়। তাই সন্তর্পণে এক পাশে দাঁড়িয়ে সব ওস্তাদকেই নির্বিচারে হাততালি বাজিয়ে প্রসন্ন রাখতে চেষ্টা ক'রে। নইলে আবার কোন ফেরে প'ড়বে কে জানে। কিন্তু অর্বাচীনটা না বুঝে গাল দিলে। বলে কিনা তালি দেওয়াই নাকি অন্যায়। যদি ব'লতো ভালো মন্দ সব কিছুকেই চোখ বুজে তারিফ করা অন্যায়, তা হ'লেও বা বোঝা যেত। কিন্তু সর্ব-জন-পূজ্য সঙ্গীতাচার্যদের সাধুবাদ দেওয়া ও সইতে পারে না। আঘাত ক'রে লেখে ক্রিসতফ:

"নির্বোধের দল। প্রচণ্ড উৎসাহে কর্ণপটাহ বিদারণ করিয়া তালি পিটাইয়া আমাদের বুঝাইতে চাও; উহা তোমাদের প্রকৃত রস-গ্রাহিতার অভিব্যক্তি! কিন্তু অত কষ্ট করিয়া উৎসাহ দেখাইবার প্রয়োজন নাই। যাহা তোমরা প্রমাণ করিতে চাও, কাজের দ্বারা ঠিক তাহার বিপরীত প্রমাণ করিতেছ। তারিফ যদি করিতেই চাও অপদার্থকে করিও না। গদ্‌গদ হইয়া তালি পিটাইয়া সাধুবাদ দিবার বস্তুর অভাব নাই। বিঠোফেন যাহাদের 'লম্বকর্ণ' বলিয়াছেন, তাহাদের জন্য তৈরী পুরো-দমী কাওলাতী শুনিয়া যত খুশি হাততালি দাও। কিন্তু যখন বিঠোফেনের 'মিসা সলেমনিজ' বাজিয়া গেল··· হায়রে হতভাগ্যের দল!···সে যে এক পরম ও চরম ক্ষণ! 'গ্লোরিয়ার' উদাত্ত ঝংকার যেন সমুদ্রের বুকে তুফান তুলিয়া যায়। আলোড়িত আবর্তিত ভয়াল্‌ গহ্বরের সৃষ্টি করিয়া ওঠে জলস্তম্ভ···মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত

হইয়া থাকিয়া উৎক্ষিপ্ত হয় আকাশের দিকে—দুই হাতে আঁকড়াইয়া থাকে জলের বুককে। তারপর ভীমবেগে আছড়াইয়া পড়ে শূন্যে। ঝড়ের বেগ ঘুর্ণী জাগাইয়া শোঁ শোঁ করিয়া বহিয়া যায়…তারপর যখন চরমে পৌঁছায় চকিতে সব উদ্দামতা শান্ত হইয়া যায়…সুরের এক অপূর্ব দীপ্তি ঘোরো-আকাশের কালোকে বিদীর্ণ করিয়া নীচে ধূম্র-সাগরের বুককে দীপ্তিমান করিয়া ঝরিয়া পড়ে। প্রলয়ের দূত থমকাইয়া দাঁড়ায়—বজ্রের আঘাতে নিশ্চলতার দু'খানি ডানা। চারিদিক গুঞ্জিত, শিহরিত। চোখের দৃষ্টি এক অনির্বচনীয় আবেশে স্থির হইয়া থাকে সম্মুখের দিকে। বুক দুরু দুরু, নিশ্বাস শুদ্ধ, সমস্ত অঙ্গ অবশ…। কিন্তু সুরের রেশ মিলাইয়া যাইতে না যাইতেই তোমরা উল্লাসে মাতিয়া ওঠ—চিৎকারে হাসিতে হাততালিতে আর সমালোচনায় হাট বসাও। এমনি করিয়া সুরকে হত্যা কর তোমরা। হায়রে হতভাগ্য! কিছুই দেখিলে না তোমরা, কিছুই শুনিলে না, কিছুই বুঝিলে না…কিছু না…কিছু না…তোমাদের অন্তর এতটুকু দুলিল না। অনুভূতিতে এতটুকু ছোঁয়াও লাগিল না? শিল্পীর বেদনা তোমাদের কাছে শুধু চটকদার দেখার জিনিস। বিঠোফেন হেন শিল্পীর গভীর বেদনার অশ্রু তোমাদের কাছে শুধুই রং-এর বাহার। ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া মহামানব খৃষ্টের রক্ত ঝরে—সেই রক্ত দিয়া গাঁথা সঙ্গীত শুনিয়া উল্লাসে 'আবার' 'আবার' বলিয়া চিৎকার করিতে তোমাদের বাধে না। এক মহামানব সারা জীবন ধরিয়া যে দুঃখ-ব্রত সাধন করিলেন তাহা শুধু তোমাদের অপরাহ্নের অলস-অবসর বিনোদনের উপকরণ হইয়া রহিল।…"

গ্যেয়টের মত সে উন্নত প্রশান্ত মর্যাদা না থাকলেও মহাকবির বাণীই যেন ক্রিসতফের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল ওর অজ্ঞাতসারে। গ্যেয়টেও ওই কথাই বলেছেন: "গভীর রস-বস্তুর মর্যাদা বোঝে না সাধারণ মানুষ।

কিন্তু তাহারা যদি ইহার আসল চেহারাটা দেখিতে পাইত, হয়ত সহিতে পারিত না।"

কিন্তু যাই হোক, ও যদি আর অগ্রসর না হয়ে এখানেই আসত তবু রক্ষা ছিল। কিন্তু ও ঝড়ের মত এগিয়ে চলল, চারদিকে জেগে উঠল বিক্ষোভের ঘূর্ণী।

সাধারণ মানুষের সৃষ্টির ক্ষমতা নেই; সে সমালোচনা করে। ঐ তার আশ্রয়, প্রশ্রয়, বাঁচার পথ, তীর্থ—সব কিছু। জনসাধারণের এই পবিত্র অধিকারের ওপরেও ও হামলা দিল। ওর সহকর্মীদের একজন তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার নবীন ধারার সব চাইতে প্রগতিশীল প্রতিনিধি হাসলারকে উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরাচারী ব'লে বিরুদ্ধ সমালোচনা করে। ক্রিসতফ জ্বলে উঠল। ওর মনে পড়ে ওর শৈশবের এক পরম প্রভাতের ছবি। ওর জীবনের পূব দিগন্তে সবে প্রতিভার অরুণাভাস দেখা দিয়েছে। ঠাকুরদা ওর হাত ধ'রে এসে দাঁড়ালেন শিল্পগুরুর সামনে। হাসলারের স্বীকৃতি হবে শিল্পী-সমাজে ওর পরিচয়ের ললাটিকা। পরম সমাদরে তিনি সেদিন ওকে গ্রহণ করেছিলেন। আজও কৃতজ্ঞতায় ওর মনের গোপন রস-ভাণ্ডখানি পূর্ণ হ'য়ে আছে। এক মূর্খের কলমে এ হেন হাসলারের বিরুদ্ধ সমালোচনা চরম দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা বলে মনে হ'ল ওর। তীব্র ভাষায় ও প্রতিবাদ লিখল:

"নিয়ম নিয়ম, শৃঙ্খলা শৃঙ্খলা বলিয়া তোমরা চিৎকার করিতেছ। তোমরা জান শুধু পুলিশী নিয়ম-তান্ত্রিকতা। কিন্তু জানিয়া রাখিও প্রতিভা অপরের বাঁধা পথে চলে না; আপন পথ আপনি রচনা করে সে। অপরের আইন তাকে বাঁধে না, তার আইন তার ইচ্ছায়।" এমনি ক'রে ধমকানোর পর চলল ব্যক্তিগতভাবে সমালোচকটির সমালোচনার সমালোচনা। তার লেখার ভুল ত্রুটি, লেখার মধ্যে

কোথায় অত্যন্ত মূর্খতার পরিচয় দিয়েছেন শ্রীমান তার চুল-চেরা সমালোচনা ক'রে সংশোধন সম্বন্ধে উপদেশ পর্যন্ত দিয়ে ছাড়ল।

সমস্ত সমালোচক সমাজে গিয়ে বাজল অপমানটা। এতদিন দ্বন্দ্ব-ভূমি থেকে তারা সাবধানে সরে ছিল অপমানের ভয়ে। ক্রিসতফের কলমের ধার ও ভার দুই এরই সাথে ওদের পরিচয় আছে। এও জানে ক্রিসতফের মত তেজী ছেলে অন্যায় বরদাস্ত করবে না। কেউ কেউ আড়ালে দুঃখও করে অতবড় শক্তিমান সুর-শিল্পী সমালোচনায় নেমে অব্যাপারে অনর্থক শক্তি ক্ষয় ক'রছে। ক্রিসতফ সম্বন্ধে ওদের মত [যদি ও পদার্থ আদৌ থেকে থাকে ওদের] যাই হোক ক্রিসতফের কাছ থেকে এমনি যত গালাগালিই থাক না কেন, এক বিষয়ে ওরা নিশ্চিন্ত ছিল। সমালোচকেরা সমালোচনা করেন। কিন্তু তারা সমালোচিত হবেন না, তাঁরা জানেন এইটে তাঁদের পবিত্র অধিকার। এই অধিকারের মর্যাদা ওরা ক্রিসতফের ক্ষেত্রে নিজেরা রেখেছে, এবং ভেবেছিল ক্রিসতফও রাখবে। কিন্তু তা রাখেনি লোকটা। নিষ্ঠুর হাতে ও সেই বিশ্বাসের ওপর আঘাত ক'রেছে। ওদের বিচারে এ সামাজিক আইনের ব্যাভিচার, এবং জাতীয় ঐতিহ্যের অপমান। অর্বাচীনের এই স্পর্ধার উত্তর দিল ওরা সমবেত প্রতিবাদের কণ্ঠে। চারদিক আলোড়িত হ'য়ে উঠল। কাগজের পাতায় জ্বালাময়ী ভাষায় লম্বা চওড়া প্রবন্ধ লিখে এক ঘায়ে শত্রু নিপাত অতি সহজেই করতে পারত ওরা। কিন্তু সে-পথে গেল না। প্রতিপক্ষের বক্তব্য-নিরপেক্ষ হ'য়ে, এমন কি তা একবারও না প'ড়েই তা নিয়ে সংবাদপত্রের স্তম্ভে টিপ্পনী লেখার বিশেষ অধিকার ও যোগ্যতা সাংবাদিকের আছে। তবুও কলম নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে নামবার সাহস ক্রিসতফের প্রতিপক্ষ দলের হ'লো না, যেহেতু শত্রু অনেক বেশী

প্রবল। সুতরাং অন্য পথে চলল। দিনের পর দিন অসীম ধৈর্যে প্রচ্ছন্ন ভাষায় ব্যাঙ্গাত্মক টিপ্পনী লিখতে লাগল। মূল লক্ষ্য রইল অলক্ষ্যে। কিন্তু ইঙ্গিত এত স্পষ্ট যে কারো বুঝতে কষ্ট হ'ল না। সুতরাং বেচারা ক্রিসতফ বারোয়ারী বাঁকা-হাসির লক্ষ্য হ'য়ে উঠল। ওরই মুখের কথা ভাষার প্যাঁচে বিকৃত হ'য়ে ও পক্ষের হাতিয়ার হ'য়ে উঠল। সত্যি-মিথ্যায় মিলিয়ে এমনি সব বিচিত্র কাহিনী ওর নামে রাষ্ট্র হ'ল যে সমস্ত শহর, [ এবং আরো সাংঘাতিক ] ডিউক অবধি ক্ষেপে আগুন হ'য়ে উঠলেন। ইসারায় ওর চেহারা, গড়ন, পোষাক পরার ধরনটি অবধি শত্রুপক্ষ এমন নিখুঁৎ ভাবে বর্ণনা ক'রে ইঙ্গিতটাকে স্পষ্ট ক'রে তুলল যে আভাসে আর কিছু রইল না। সব দিনের আলোর মত স্পষ্ট হ'য়ে গেল।

ক্রিসতফের বন্ধু-বান্ধবদের কিছুই যেত আসত না। 'রিভিউ' এই ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়লে এই গোলমালটাতে খানিকটা বিজ্ঞাপনের কাজ হ'ল। 'রিভিউ'কে জড়াবার কোনো ইচ্ছা ছিলনা কারো। বরঞ্চ ক্রিসতফকেই সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। পত্রিকাটির সুনাম এমনি ভাবে বলি দেবে ও এ ভাবতেই পারেনি কেউ। এমন আভাসও পাওয়া গেল সমালোচক-গোষ্ঠি হ'তে যে, যদি এর কোনো ব্যবস্থা না করা হয়, অবিলম্বে সম্পূর্ণ সম্পাদক-মণ্ডলীই দায়ের ভাগী হবেন। য়্যাডলফ মাই এবং ম্যানহাইম-এর ওপর আক্রমণের আভাষ পাওয়া গেল। ম্যানহইম অবশ্য হাসে। ওর বাবা, কাকা এবং বিরাট পরিবারের প্রত্যেকটি প্রাণী ও কি করে না করে তার ওপর শ্যেন দৃষ্টি রাখেন। এ ব্যাপারে তাঁরা আগুন হয়ে উঠবেন। কিন্তু য়্যাডলফ মাই অত হালকা ভাবে নিতে পারলে না। ও চটে গেল—ও 'রিভিউ'-এর খ্যাতি নষ্ট করার কৈফিয়ৎ চাইল ক্রিসতফের। ক্রিসতফ ধমক দিয়ে ওকে বসিয়ে দিলে।

চালিয়াৎ মাই, এর ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা কেটে যাওয়ায় যারা মাথা বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে ছিল তারা হেসে নিলে। ওয়ালডহৌস মনে মনে খুব উপভোগ করে। বাইরে বলে : 'দু'চারটে মাথা টাথা ভাঙ্গবে, তবে তো লড়াই !' স্বভাবতঃই ওর নিজের মাথাটা না ভাঙ্গে সেদিকে সতর্ক হ'য়ে রইল। তবে ভয় বিশেষ নেই ওর। কারণ ওর পারিবারিক যে প্রতিষ্ঠা, এবং চারদিকে এত আত্মীয় স্বজন রয়েছে যে খাটাবার সাহস কারো হবে না। সুতরাং ইহুদীদের ওপর দিয়ে ঝড়টা যদি বয়ে যায়, যাক না। বেশ তো তামাসা হবে। এহ্রেন ফেল্ড্ আর গোল্ডেনরিং এতদিন পর্যন্ত একেবারে চুপচাপ একপাশে সরে ছিল। ওদের গায়ে কোন আঁচ লাগেনি। কিন্তু ক্রিসতফ ওদেরও ছাড়ল না। মহিলা বন্ধুদের জড়িয়ে অনবরত ওদের খুঁচিয়ে চলল। প্রথম প্রথম ওরা বেশ উপভোগ করলো, ক্রিসতফের জোরালো কলমকে খুব তারিফ করলে। ভাবলে : চলুকনা, শুধু একটু লাগাম টেনে রাখলেই হবে। একটু ব'লে দেওয়া ছোকরাকে যাতে কয়েক জনকে কিছু না বলে। কিন্তু ক্রিসতফ ও ধার দিয়ে গেল না। কারো কথা শুনে চলবে সে-মানুষ ও নয়। ও উন্মত্তের মত দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে ছুটেছে এক দিকে। কিন্তু এভাবে ওকে চলতে দিলে এখান থেকে বাস ওঠাতে হয়। এমনিতেই মহিলা বন্ধুরা 'রিভিউ'-এর আফিস চড়াও হ'য়ে চোখ রাঙ্গাতে আর চোখের জল ফেলতে শুরু ক'রেছেন। অফিস প্রায় নাট্য-শালা হ'য়ে উঠেছে। ওরা চেষ্টা করে আর কিছু না হোক কলমটা একটু সামলে চলুক ছেলেটা। কিন্তু কল-কৌশল সব ব্যর্থ—এতটুকু নরম হ'ল না ও। একটা অক্ষরও বদলাবে না ও। এর পর রাগারাগির পর্ব, সপ্তমে চ'ড়ে উভয় পক্ষের বাদ বিসংবাদ। ক্রিসতফ এক চুলও নড়ল না। বান্ধবীদের দুর্দশায় ওয়ালডহৌস মনে মনে খুব

হেসে নিলে। এবং তাদের কাঁচা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে পক্ষ নিলে ক্রিসতফের। এতগুলি অতি নিখুঁত মানুষের মধ্যে ওই এলোমেলো ক্ষ্যাপা, জংলী লোকটাকে লেলিয়ে দিয়ে ম্যানহাইমও খুব উপভোগ ক'রতে লাগল। ক্রিসতফ যেমন ঠুকছে, তেমন গুতোনীও খাচ্ছে। ভারী মজা। বোনের কথা শুনে শুনে ও বিশ্বাস করতে সুরু ক'রেছে লোকটার মস্তিষ্কের স্ক্রু কোথাও কোথাও ঢিলে আছে। কিন্তু আবার ঐ কারণেই ওকে ওর আরো বেশী ভালো লাগে। অতএব ওয়ালডহৌস্-এর সাথে সেও ক্রিসতফের পক্ষ নিলে।

বাইরে যাই করুক না কেন, কাণ্ড-জ্ঞান বর্জিত ছিল না ম্যানহাইম। ও চিন্তা ক'রে দেখল প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হ'য়ে থাকাই ক্রিসতফের পক্ষে কল্যাণকর।

জার্মানীর অধিকাংশ শহরের মত এ-শহরেও হ্বাগনার সম্প্রদায় ছিল। এরাই ছিল প্রগতির বাহন। অসুবিধা হয়নি কেননা হ্বাগনারের স্বীকৃতি সর্বত্র। অপেরা হাউসগুলির প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানে হ্বাগনারের সঙ্গীত থাকবেই। কিন্তু তবু মনে হয় হ্বাগনারের এত প্রতিষ্ঠা যেন বেশীর ভাগ গায়ের জোরে, গুণের জোরে নয়। সবাই যে খুব পছন্দ করে তা নয়। মনের দিক দিয়ে জনসাধারণ বেশীর ভাগই অত্যন্ত সনাতন-পন্থী। বিশেষ ক'রে এই সব ছোট শহরে আধুনিক প্রগতির ঢেউই এসে পৌঁছয় না, এবং তার ফলে, পুরানোকেই আঁকড়ে থাকে মানুষ। তার ওপরে জার্মানরা অত্যন্ত সংশয়ী—নূতন নামেই ওদের ভারী সন্দেহ। কয়েক পুরুষ ধ'রে কষ্টি-পাথরে যা যাচাই হ'য়ে, পরিপাক হ'তে হ'তে এসেছে তা ছাড়া আর সব কিছু, কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজী নয়। হ্বাগনার সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নের স্থান নেই বটে—কিন্তু হ্বাগনারীয় ধারায় রচিত নূতন সংগীত-পদ্ধতি সম্বন্ধে

জার্মানদের উৎসাহের অভাব ও দ্বিধা-জনক ব্যবহারে ওদের মনের কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। নূতন শিল্প-প্রতিভা বা মৌলিক শক্তির অঙ্গীকারই খুঁজে বেড়ায় হ্বাগনার শিষ্যেরা। অত্যন্ত শক্ত কাজ। কিন্তু তাই ব'লে ওরা থেমে থাকেনি। নবীন-শিল্পীর মধ্যে কোন শক্তির পরিচয় দেখলেই ওরা দলে টেনে নিয়ে আসে। ক্রিসতফের ওপরে ওদের চোখ ছিল বহু দিন থেকেই। অতি সন্তর্পণে ওরা এগিয়েছে, কিন্তু ক্রিসতফ ধরা দেয়নি। দলে ভিড়বার কোন দরকার নেই ওর। নাচ গান, শোয়া বসা সব কিছুতে ওর বন্ধুদের দল চাই। কেন যে দল ছাড়া ওরা চলতে পারে না, তা ওর বুদ্ধির অগম্য। ওই দল টল ওর একটুও ভলো লাগে না। কিন্তু ওরই মধ্যে হ্বাগনার শিষ্যদের ওই দলটার ওপরে ও কতকটা প্রসন্ন। অন্ততঃ ওদের কনসার্টগুলো একরকম মন্দ লাগে না। শিল্পাদর্শ হিসেবে হ্বাগনারীয় ধারাকেই যে সকলে অনুসরণ করে তা নয়। কিন্তু অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা হ্বাগনারের সাথেই তবু যেন ওর অন্তরের সুর মেলে কতকটা। হ্বাগনারীয়রা আবার ব্রাহম ও তৎশিষ্যদের বিরোধী। এ বিষয়ে হ্বাগনার-পন্থীদের সাথে ওর নিজের রুচির মিল আছে। সুতরাং বিশেষ আপত্তি হ'ল না ওর। ম্যানহাইমএর সঙ্গে ওদের সকলের পরিচয় আছে। নিজে সঙ্গীতজ্ঞ না হ'লেও তাদের সমিতির সভ্য। ওদের কর্তারা সবাই মন দিয়ে 'রিভিউ' পড়ে। ক্রিসতফের সাম্প্রতিক বীর-লীলার খবর তাঁরা সব রেখেছেন। ওর অমিত বিক্রমে বিপক্ষ-শিবিরের বীরের দল ধরাশায়ী হয়েছেন দেখে তারা ওর সম্পর্কে অন্ততঃ আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠল। অমন তেজী ছেলেকে দলে পেলে দলের বুনিয়াদ শক্ত হবে। ক্রিসতফ ওদের ছেড়ে কথা বলেনি। তবে তেমন ভয়ানক আক্রমণ নয়। কিছু নয় ব'লে মনকে বুঝিয়ে ওরা নিজেরাই চোখ বন্ধ ক'রে থেকেছে। কিন্তু

ক্রিসতফকে বিশ্বাস নেই, কখন যে ও হুংকার ছেড়ে চোখ লাল ক'রে ওদের মাথা লক্ষ্য ক'রে গদা ছুঁড়বে তার ঠিক ঠিকানা নেই। তার আগেই ওকে দলে এনে ছাপ মেরে দিলে ফাঁড়া কাটতে পারে। সুতরাং ওকে দলে ভিড়াবার জন্যে ও পক্ষ ভারী ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। একদিন সরাসরি এসে প্রার্থনা জানালে, ওর কয়েকটা রচনা ওরা ওদের আগামী অনুষ্ঠানে বাজাতে চায়। আত্ম-প্রসাদ অনুভব করে ক্রিসতফ মনে মনে। একটুও ইতস্তত না ক'রে অনুমতি দিয়ে ফেলল, অনুষ্ঠানে গেল এবং ম্যনেহাইমের সনির্বন্ধ অনুরোধে সমিতির সভ্য হ'য়ে গেল।

হ্বাগনার সমিতির তৎকালীন দু'জন কর্ণধারের মধ্যে একজনের নাম ছিল জোসিয়াস ক্লিং। এঁর লেখক ব'লে কিছুটা নাম আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন সুর-নির্দেশক। জোসিয়াস হ্বাগনারের একটি অভিধান সংকলন করেন—যার সাহায্যে মহাশিল্পীর যে-কোন রচনা চোখের নিমেষে হাতের কাছে পাওয়া যায়। এই অভিধানখানি জোসিয়াস্‌এর সারা জীবনের সাধনা। এক একটা গোটা অধ্যায় ও মুখস্ত ব'লে যেতে পারে। হ্বাগনার ও আর্য ভাবধারা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ও লিখেছে নানা পত্রিকায়। ওর মতে হ্বাগনার বিশুদ্ধ আর্ট ও সংস্কৃতির প্রতীক। জার্মান জাতিই ফরাসী সংকর থেকে এই ধারা বাঁচিয়ে রেখেছে। ফরাসী সঙ্গীত পদ্ধতিকে গাল না দিয়ে ও জল-গ্রহণ করে না।

ছোটখাট এতটুকু মানুষটি ক্লিং : ষোড়ষী মেয়ের মত একটুকুতেই লাল হ'য়ে ওঠে।

দ্বিতীয় কর্ণধারটির নাম এরিখ লবার। আগে কোন্ একটা রাসায়নিক কারখানার ম্যানেজার ছিলেন। বছর চার হ'ল সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সঙ্গীত-সাধনা করছেন। অর্থ আছে, ইচ্ছেও আছে, তাই লক্ষ্মীর সাধনা ছেড়ে সরস্বতীর সাধনা সম্ভব হ'য়েছে। কিন্তু ওর ভয় কিছুতেই

যায় না। যে মানুষ এত প'ড়েছে, এত ঘুরেছে, নানারকম কাজ ক'রেছে; এবং যেমন তেমন করে নয়, উদ্যম, দক্ষতা, ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে; সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সে-মানুষ কেমন ক'রে এমন পেছনে প'ড়ে রইল সে এক আশ্চর্য। ও যে সবার চাইতে ভোঁতা এইটে প্রমাণ ক'রতেই যেন ওর সমস্ত মৌলিকত্ব নিঃশেষ হ'য়ে যায়। সঙ্গীত সম্বন্ধে নিজের হৃদয় ও মস্তিষ্কের ওপর ওর আস্থা নেই। হ্বাগ-নারের সঙ্গীতকে ও প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সুরের কাজ সহ আয়ত্ব ক'রেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তা দরবারী ওস্তাদদের মত যান্ত্রিক ভাবে। মাইকেল এঞ্জেলোর এক অন্ধ ভক্ত শিল্পীর ছবির অনুলিপি ক'রতে, গিয়ে কালের ধর্মে রংএর গায়ে যে ফাটল ধরেছিল, তাও বাদ দেয়নি, যেহেতু অতি ভক্তি-ভাজন শিল্পীর ছবির রংএর ফাটল, কাগজের ভাঁজ অবধি ওর কাছে পবিত্র। লবারকে দেখে সে-কথা মনে হয়।

এ লোকগুলিকে ক্রিসতফের খুব একটা ভাল না লাগলে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। কারণ, অত্যন্ত ঘরোয়া ধরণের ঢিলে ঢালা আমুদে মানুষ ওরা। লবার সব বিষয়েই কথা কইতে, আসর জমাতে পারে, এক সঙ্গীত ছাড়া। কেমন একটু পাগলাটে ধরণ ওর। পড়াশোনা করেছে প্রচুর। খাপছাড়া লোকদেরই ক্রিসতফের বেশী ভালো লাগে। মেপে জুখে যারা চলে, কথা বলে যুক্তি দিয়ে ওজন ক'রে, অমন মানুষদের ভিড় থেকে স'রে এসে এই পাগলদের মধ্যে ওর প্রাণটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। যুক্তি-হীন মানুষ যে কত বিপজ্জনক হ'তে পারে তা ওর জানা ছিল না। তারপর, নিজেদের মৌলিক ব'লে হাঁক ডাক ক'রে এরা যে আসর জমিয়ে আছে, নিংড়ালে এক বিন্দু মৌলিকত্ব কারো মধ্যে পাওয়া যায় না; সমস্ত চিন্তা এদের দম-দেওয়া কলের মত চাবির সাথেই বাঁধা, এ ক্রিসতফ এখনও বুঝতে পারে নি।

জোসিয়স ক্লিং ও লবার ক্রিসতফএর পৃষ্ঠপোষকতা পাবার আশায় স্তব স্তুতি ক'রে যত রকমে পারে ওকে প্রসন্ন করবার চেষ্টায় মেতে উঠল। আবেগময়ী ভাষায় ক্লিং ওর সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে প্রশস্তি ছাপালে। সমিতির কনসার্টে ওর গৎ বাজান হ'ল সম্পূর্ণ ওরই নির্দেশ অনুসারে। ক্রিসতফের বড় ভালো লাগে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সব বৃথা গেল নিজেদের বোকামীতেই। ওকে কেউ তারিফ ক'রল ব'লেই যে ও গদগদ হ'য়ে উঠে, তাকে স্বর্গের দেবতা ব'লে পূজো ক'রবে সে ছেলে ও নয়। ভারী কড়া এ বিষয়ে। ও যা নয় তাই ব'লে লোকে ওকে মাথায় তুলে নাচবে—তা কিছুতেই সহ্য করবে না ও। বন্ধুদের ও শত্রু মনে করে—এটা ওর মজ্জাগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লিং নিজেকে হ্বাগনারের শিষ্য ব'লে পরিচয় দিল এবং ক্রিসতফের কোনো কোনো রচনার সাথে হ্বাগনারের বিশিষ্ট কোনো সুরের সাদৃশ্য আবিষ্কার ক'রে ওরা গদ গদ হ'য়ে উঠল। যদিও এক আধটা টান ছাড়া সত্যিকারের সাদৃশ্য কোথাও ছিল না। ওদের এই অতিশয়োক্তি ক্রিসতফের ভালো লাগল না। হ্বাগনারের একটি সুদীর্ঘ নাটকের দুইটি অংকের মাঝখানে ওর একটা গৎ বাজান হ'ল, আর একটা বাজে গৎএর সাথে। শিল্পগুরুর তথাকথিত কোনও শিষ্য তাঁর অনুকরণের একটা হাস্যকর চেষ্টা ক'রেছিল, তারই ফল ওই গৎ। সমন্বয়টা খুবই বিসদৃশ লাগল ওর কাছে।

দু'দিন না যেতেই ক্রিসতফের যেন দম বন্ধ হ'য়ে এল ওই সংকীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে। শিল্পের জগতে এ'রা সম্প্রতি পা দিয়েছেন; সুতরাং গোঁড়ামী এবং পরমতে অসহনশীলতা এঁদের আরো তীব্র। শিল্পের আঙ্গিক ও চিন্তা-জগতের যে কিছু মাত্র মূল্য আছে সে-সম্বন্ধে ওর ভুল ভাঙ্গতে লাগল। এতদিন ও বিশ্বাস ক'রে এসেছে—বৃহৎ ভাবনা নিজের দীপ্তিকে বহন করে নিজের অভ্যন্তরে। এখন দেখতে

পাচ্ছে—ভাবনার জগৎ বদলালেও বদলায় না মানুষ। শাশ্বত সে; সবার ওপরে মানুষই প্রধান, ভাবাদর্শ যাই হোক না কেন। সাধারণতঃ হীন পরিবেশে জন্মগ্রহণ ক'রলে প্রতিভাও জীবনের পথ চলতে চলতে ধীরে ধীরে তার ঐশ্বর্য হারায়। এক যুগের বীর-সাধকের শেকল ভাঙ্গার গানই উত্তর কালে দাসত্বের বিনতি হ'য়ে দেখা দেয়। আকুল হ'য়ে ওঠে ক্রিসতফ। হৃদয়ের আবেগে মনের দ্বার খুলে যায় অবারিত হ'য়ে। শিল্পের ক্ষেত্রে অন্ধ বস্তু-রতিকে ও বিদ্রূপের ঘায়ে জর্জরিত ক'রে তোলে। দৃপ্ত স্বরে বলে, কোন ক্ল্যাসিকের প্রয়োজন নেই। হ্বাগনারের ভাবধারার উত্তরাধিকারের অধিকার একমাত্র ওর—ক্রিসতফের, যে হ্বাগনারকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাবার সাহস রাখে; এবং রাখে বলেই তার পথের বাঁধন ঘোচে এবং জীবনকে সে পায় একান্ত ক'রে। ক্লিং-এর নির্বুদ্ধিতা ওকে হিংস্র ক'রে তুলল। হ্বাগনারের যত দোষ ত্রুটি অসঙ্গতি ওর চোখে পড়ে, টেনে বের ক'রে আনে হাটের মাঝখানে। হ্বাগনার-শিষ্যের দল ক্ষুব্ধ হয়, গাল দিয়ে বলে—এটা ওর হিংসে। কিন্তু ক্রিসতফ জানে যারা আজ মৃত হ্বাগনারকে স্বর্গের দেবতা ব'লে পূজো করছে—শিল্পী বেঁচে থাকলে তারাই হয়ত তাকে টুটি টিপে মারত। হয়ত ক্রিসতফের ভুল। ক্লিং, লবারের মত মানুষেরও জীবনে একদিন আলো জ্বলেছিল। সেদিন ওরা ধ্বজা উড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছিল অনাগতের পথে। সে প্রায় বিশ বছর আগের কথা—তারপর আরো দশজনের মত থেমে গেছে হঠাৎ মাঝ পথে। মানুষ এত দুর্বল, এত দীন—একটু চড়াই হ'লেই হাঁপিয়ে পড়ে—দম ফুরিয়ে যায়। এগিয়ে যাবার মত ফুসফুসের জোর আছে আর ক'জনের!

নূতন বন্ধুদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটল দু'দিনেই। গোঁড়ামী ও জেদ ও

ছাড়তে পারে না। সহানুভূতি পারস্পরিক। ও বস্তুর এক তরফা কারবার চলে না। বেশ বোঝা গেল, ক্রিসতফ আপোষ করবে না। সুতরাং এক তরফা উৎসাহ বেশী দিন টিকল না। ওদের উপাস্য দেবতা, উপ-দেবতার দলকে ক্রিসতফ পূজো দিল না ব'লে তার নিজের বরাদ্দী পূজোও বরবাদ হ'ল। ওর রচনায় আগেকার মত আর আগ্রহ নেই কারো। বরঞ্চ মাঝে মাঝে প্রতিবাদ ওঠে—অনুষ্ঠান-সূচীতে ক্রিসতফের নামের এত ছড়াছড়ি কেন। পেছনে ওরা টিটকারী দেয়, সমালোচনা করে। ক্লিং, লবার তাতে প্রতিবাদ করে না। বরং পরোক্ষ সমর্থনটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ক্রিসতফের সাথে বিবাদ এড়িয়ে যেতে চায় ওরা। কারণ, প্রথমতঃ রাইনের তীরবাসী জার্মানরা কুটিল পথের পথিক। সমস্যার পরিচ্ছন্ন সমাধান তারা চায় না। দ্বিতীয়তঃ, যাই ঘটুক না কেন, ক্রিসতফকে কাজে লাগাবার আশা ওরা ছাড়েনি। বুঝিয়ে না যদি বা হয়, অন্ততঃ শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে হাল ছেড়ে সে পথে আসবেই।

কিন্তু তার সময় দিলে না ক্রিসতফ। পদে পদে ও অনুভব করেছে, কেউ ওকে পছন্দ করে না। কিন্তু মুখে কেউ প্রকাশ করে না। ওর সাথে খাতির রেখে চলতে চায় সবাই। কিন্তু ওরা শত্রু এই কথাটাই ও প্রমাণ ক'রে তবে ছাড়বে। সে-দিন হ্বাগনার সমিতির অধিবেশনে ভণ্ডদের বাড়াবাড়ি ওর আর সহ্য হ'ল না। কথা না বাড়িয়ে লবার-এর কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলে। লবার বুঝতেই পারল না ব্যাপার কি। ছুটে এল ম্যানহাইম। কোন কথা মানবে না ক্রিসতফ। কিছু ব'লতেই দিল না কাউকে। মুখ খুলতেই ক্রিসতফ ফেটে পড়ল :

'না না না না…। ওই অপদার্থগুলির কথা আমার কাছে উচ্চারণও

ক'রো না। ওদের মুখ-দর্শন ক'রব না আমি। আমি আর সইতে পারছিনে, সব বিষিয়ে উঠেছে। মানুষ দেখলেই আমার গায়ে জ্বালা ধরে…।'

ম্যানহাইম হেসে লুটিয়ে পড়ে। ক্রিসতফকে বোঝাতে এসেছে, ভুলেই গেল সে-কথা। অমন চমৎকার তামাশাটা মাটি হবে। বললে :

'আরে সে তো জানিই, ওরা সব রূপের কার্তিক এক এক জন। ওদের মুখের দিকে তাকালে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। সে তো আর নূতন কথা নয়। কিন্তু নূতন ক'রে আবার হ'ল কি হে! বলো না খুলে।'

'কি আবার হবে! যথেষ্ট হয়েছে, বাস্‌। কর কর, যত পার ঠাট্টা কর। সবাই জানে আমি পাগল। বুদ্ধিমান তোমরা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে কাজ কর। আমি একদম আলাদা। আমি নিয়মে বাঁধা কাজ ক'রতে পারিনে। আমার পথ আমার খেয়ালে বাঁধা। আমার ভেতরে বিদ্যুৎ জমে, বুঝলে! কোন কাজে লাগিয়ে সেই বিদ্যুৎএর পথ খুলে দিতে হয়, নইলে আমি পাগল হ'য়ে যাই। কিন্তু অন্য কেউ ছুঁলেই বিপদ হে। সেই জন্যই তো সমাজে থাকবার যোগ্য নই আমি। এখন থেকে একেবারে দূরে চলে যাব শুধু নিজেকে নিয়ে একান্তে সরে থাকব আমি।'

'তাই নাকি? দুনিয়া থেকে সরে গিয়ে একা কতক্ষণ থাকবে হে? পারো একা থাকতে? কক্‌খনও পারো না। পারো একা অর্কেষ্ট্রা বাজাতে? পারো না। গাইয়ে লাগবে, বাজিয়ে লাগবে, সুর-নির্দেশক লাগবে, শ্রোতা লাগবে, হাত তালির জন্য ভাড়া করা লোক…'

ক্রিসতফ চিৎকার ক'রে ওঠে: 'না না না না…।' শেষের কথা ক'টি শুনে লাফিয়ে উঠল। 'কি ব'ললে, আবার বল! ভাড়া করা লোক…?'

'আরে টাকা দিয়ে ভাড়া করার কথা বলছিনে। [আর তা ছাড়া উপায়ই বা কি। শ্রোতাদের কাছে গুণীর গুণ বোঝানর ওই পন্থা।] ও তোমার রাখতেই হবে, নইলে চলবে কেন? প্রত্যেক শিল্পীরই আছে; নিজের হাতে রীতিমত ট্রেনিং দেয়া। প্রত্যেক লেখকেরও থাকে তালি-পেটানোর দল। আর বন্ধু-বান্ধব থাকাই বা কেন তাহ'লে!'

'চাইনে আমি বন্ধু-বান্ধব।'

'তাহ'লে আর হাত-তালিটা কপালে জুটবে না, হিস্ হিস্ ক'রে বসিয়ে দেবে দেখো।'

'বেশ তাই দিক। তাই চাই আমি। লোকের ছি ছি-ই চাই।'

ম্যানহাইম যেন সপ্তম স্বর্গে ছিল! বলল: 'ও ফূর্তি বেশী দিন থাকবে না হে। কেউ বাজাবেই না তোমার জিনিষ, দেখো।'

'বেশ তো। হোক তাই। তোমরা ভাবছ, প্রশংসার কাঙ্গাল আমি? প্রসিদ্ধ হবার জন্য হাপিত্যেশ ক'রে বসে আছি?...হ্যাঁ তা যথেষ্ট করেছি। শক্তিতে যা কুলোয় করেছি। কিন্তু বোকামী! বোকামী! বোকামীর একশেষ করেছি ওই ক'রে...এই যে এত সইলাম, এত নিন্দে, এত অপযশ, অসম্মানের সাথে আপোষ, এই হীনতা—এত যে দুঃখ সওয়া, এই দেহ-মন-ভরা শ্রান্তি—মনের অহংকারটা তৃপ্ত হ'লেই তার ক্ষতি পূরণ হল! খ্যাতির এত বড় মূল্য?......থাক তাহ'লে, এখানেই শেষ। খ্যাতি আমার চাইনে। ঘরের কোণায় থাকব—একজন সাধারণ নাগরিক হ'য়ে নিজকে আর যাদের ভালোবাসি, তাদের নিয়ে...। তাদের জন্যই বাঁচা আমার সার্থক হোক।'

বাঁকা ক'রে জবাব দেয় ম্যানহাইম: 'বেশ! বেশ! তা একটা জীবিকা তো খুঁজে নিতে হবে! জুতো তৈরী ক'রো।'

'খুব ভালো হ'ত যদি তাই পারতাম। অত বড় গুণী সাথ্‌স-এর মত মুচি হতাম যদি, কত সুখী হতাম! জীবন আমার আনন্দে ভ'রে থাকত। সারা সপ্তাহ হাতে জুতো তৈরীর সরঞ্জাম। রবিবারটা শুধু গান গাইতাম আপন মনে, আমার কুঁড়েঘরের নিভৃত কোণে ব'সে। আসর নয়, আলো জ্বালা নয়···শুনবো নিজে আর শুনবে যারা আমায় ভালেবাসে···আঃ, সে জীবন যদি পেতাম!···আমি পাগল! উন্মাদ! কতগুলি মূর্খ আমার সঙ্গীতের ভালোমন্দ বিচার ক'রবে—সেই আশায় পরম আনন্দে নাচছি! এত বড় অধঃপতন! কয়েক হাজার নিরেট-মস্তিষ্ক গর্দভের দল নাই বা দিল আমায় হাততালি; তাদের সমালোচনার অপমান নাই সইলাম। তার চেয়ে, দু'একজন সাচ্চা লোক আমায় ভালোবাসুক, আমায় বুঝুক, সেই আমার স্বর্গ···আমার পুরস্কার। আমি যশ চেয়েছিলাম। গুমর হয়েছিল আমার। তা আমার ভেঙ্গেছে। একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। তোমরা দেখে নিও।'

'বিশ্বাস ক'রছি।' ব'ললে ম্যানহাইম। কিন্তু মনে মনে ব'ললে: 'এক ঘণ্টার মধ্যেই আবার বাছাধন উল্টো গাইবেন।'

'আমি যাচ্ছি তাহ'লে। হ্বাগনার-সমিতির সব মুস্কিলের আসান হোক।···আমি বলছি তোমায় এখানে আর পদার্পণ করছিনে। হ্বাগনার সমিতিই বল আর যে সমিতি বল, আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। সভা তো নয় কতগুলো ভেড়ার পাল জুটে গলা ছেড়ে ব্যা ব্যা করে। যাও যাও ভেড়াগুলোকে বলোগে, আমি ভেড়া নই, ঘাস খাইনে। আমার দাঁত আছে···।'

'বেশ তাই বলছি গিয়ে।' ব'লে ম্যানহাইম চ'লে গেল। ভোরের পালাটি, চমৎকার হ'ল! মনে মনে ভাবতে লাগল 'পাগল! পাগল! একেবারে বদ্ধ পাগল ছেলেটা!'

ব্যাপার শুনে ওর বোন বলল: 'পাগল! বলছ কি? আমাদের সামনেই ও পাগল সেজে থাকে। ওটা ওর ভান। পাগল নয়···ও বোকা···অহংকারী। অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না ওর···।'

ওয়ালডহৌস্-এর 'রিভিউ' পত্রিকায় জোর কলম চালালে ক্রিসতফ। তবু ও আনন্দ পায় না। বরঞ্চ তার বিপরীত। ইচ্ছে হয় সব তুলে নিয়ে সমুদ্রের তলায় বিসর্জন দিয়ে আসে। কিন্তু ছাড়তে পারছে না যে-হেতু শত্রু পক্ষ ওকে ছাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। জেদ চেপে গেছে ওর। হার মানবে না—কক্‌খনও না। মানবে না হার।

ওয়ালডহৌস্-এরও কেমন অস্বস্তি লাগল। ভালই ছিল এসব গোলমালের আওতার বাইরে ছিল ও—অলিম্পিকের চূড়োয় ব'সে দেবতার মত নির্বিকার চিত্তে ও শুধু দেখেছে। কিন্তু নির্বিকার হ'য়ে থাকা টিকল না বেশী দিন। কয়েক সপ্তাহ ধ'রে মনে হচ্ছে ওর, যেন একটা বেসুর বাজছে অন্যান্য সংবাদ-পত্রে। এতদিন ওর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল সর্বত্র। এখন সর্ব-জন-স্বীকৃতির মধ্যে যেন ফাটল দেখা দিচ্ছে। কাগজগুলোতে একটা বিরুদ্ধতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পত্রিকাগুলো লেখক ওয়ালডহৌস্‌কে অহংকারী ব'লে এমনি ভাষায় গাল দিচ্ছে যা এত দিন ওর ধারণার বাইরে ছিল। ওয়ালডহৌস্-এর দৃষ্টি আরএকটু ধারাল হ'লে— অতি সহজে বুঝতো, কোন বন্ধুর হাত আছে এর পেছনে। সুকৌশলে এহরেনফেলড ও গোল্ডেনরিং প্রচ্ছন্ন থেকে কলকাঠি নাড়ছে। এ ছাড়া উপায় ছিল না আর। খোঁচা খেয়ে ওয়ালডহৌসের যদি হুঁস হয়, তবে হয়ত ক্রিসতফের কলম বন্ধ করার চেষ্টা ক'রবে। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ গেল না। ক্রিসতফের ওপর ওয়ালডহৌস্ চ'টে গেল। 'রিভিউ'-এর কর্মচারীরা ওকে থামাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু শিকার ধরেছে যে কুকুর তার

মুখে ঠুলি পরালে যেমন হয়, ওরা কিছু বললেই ক্রিসতফকে ক্ষেপে ওঠে। উল্টে ওদের ভীরু বলে গাল দেয়। জেদ করে, বলবেই, যা উচিত তা বলবেই—ওর মুখ বন্ধ করে কার সাধ্য।

ছাড়িয়ে দিতে চায় দিক না। সারা শহর জানবে—অন্যান্য কাগজের মত 'রিভিউ'-ও ভীরু। ভালোই হবে। তবে নিজে ও ছাড়বে না।

অসহায় দৃষ্টিতে ওরা ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে শুধু চাওয়া-চাওয়ি করে। ম্যানহাইমকে খুব গাল দেয়, কেন এমন পাগলকে লেলিয়ে দিয়ে মানুষকে বিপদে ফেলে। ম্যানহাইম হাসে। ক্রিসতফকে সামলাতে চেষ্টা করে নিজেও। সবাইকে আশ্বাস দেয় পরের প্রবন্ধে ক্রিসতফের অত ঝাঁঝ থাকবে না। দেখে নেয় যেন তারা। বিশ্বাস হয় না কারো। কিন্তু সত্যি সত্যি দেখা গেল ম্যানহাইম মিছে বলেনি। এবারে যে প্রবন্ধ লিখল্‌ ক্রিসতফ, তা একেবারে সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা না হ'লেও কারো বিরুদ্ধে একটি উগ্র শব্দ কোথাও নেই। বিশেষ কিছু করতে হয়নি ম্যানহাইমকে। অতি সহজ সরল প্রক্রিয়া। সবাই অবাক হ'য়ে ভাবলে এই সোজা কথাটা এর আগে মনে হয়নি কেন! ক্রিসতফ 'রিভিউ'তে যা লেখে তা কখনও নিজে দ্বিতীয়বার পড়ে না। প্রুফও দেখে তাড়াহুড়োয় যেমন তেমন ক'রে কোনো মতে। য়্যাডলফ মাই অনেকবার সাবধান করেছে, ছাপার ভুল থাকা পত্রিকার পক্ষে কলঙ্ক। কিন্তু সমালোচনাও যে একটা শিল্প একথা ক্রিসতফ কখনও বুঝতে চায়নি। উল্টো শুনিয়ে দিয়েছে: 'হয়েছে হয়েছে—গাল দেবে তার আবার অত! গালটা যাকে লক্ষ্য ক'রে, সে ঠিক বুঝে নেবে।' ম্যানহাইম সায় দেয়। ছাপার ভুল সংশোধন করা মুদ্রাকরের কাজ, সম্পাদকের নয়। যাই হোক নিজের হাতে তুলে নিতে চাইল ও

কাজটা। ক্রিসতফ ভারী কৃতজ্ঞ। সবাই ওকে বুঝিয়ে দিল, এই ব্যবস্থাই ভালো, এতে অনেক সাহায্য হবে, সময়ও বাঁচবে। অতএব ক্রিসতফ তার প্রুফগুলি ম্যানহাইমের হাতে তুলে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সাবধানে সংশোধন করবার উপদেশ দিয়ে ও নিশ্চিন্ত হ'ল। ম্যানহাইম ও এই চাইছিল। প্রথমে তেমন বেশী হাত দিত না, সামান্য দু'চার কথা এদিক ওদিক করত মাত্র, বেশী কড়া কিছু থাকলে তাকে একটু মোলায়েম ক'রে নিত, ওই পর্যন্ত। বেশ সুফল দেখা গেল। সাহস বেড়ে গেল ম্যানহাইমের। আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। এখন আর একটু আধটু নয়; গোটা এক একটা অংশই বাদ পড়ে; বেমালুম অর্থ বদলায় অতি নিপুণ হাতের কারিগরিতে। ভাষার ওপরকার চেহারা ও বৈশিষ্ট্য যতদূর সাধ্য বজায় থাকে, কিন্তু মূল বক্তব্য একেবারে বিপরীত হ'য়ে দাঁড়ায়। অদ্ভুত দক্ষতা। ক্রিসতফের লেখার ভোল পাল্টাতে গিয়ে যে পরিশ্রম ওর হ'তে লাগল, নিজে লিখলে হয়তো তার এক ভগ্নাংশও হ'ত না। এত পরিশ্রম কখনও করেনি ম্যানহাইম। পরিশ্রম যাই হোক চমৎকার ফল ফ'লল। যে সমস্ত শিল্পী ও সুরকারকে ক্রিসতফ কিছুদিন আগে বিদ্রূপ ক'রেছে, তারা অবাক হ'য়ে গেল, ক্রিসতফ-এর পরিবর্তন দেখে। ক্রিসতফ তাদের স্তুতিতে মুখর। 'রিভিউ'-এর কর্মীরা খুশি। ম্যানহাইম নিজের কারিকুরী জোরে জোরে প'ড়ে শোনায়। হেসে লুটোপুটি খায় সবাই। মাঝে মাঝে এহ্-রেনফেল্ড ও গোল্ডেনরিং ম্যানহাইমকে বলে:

'বেশী বাড়াবাড়ি করোনা হে, একটু সাবধান।'

'কিছু ভয় নেই, নিশ্চিন্ত থাক।' ব'লে ম্যানহাইম ওকে থামিয়ে দেয়।

কিছুই ক্রিসতফের চোখে পড়ে না। সে অফিসে যায়, লেখা ফেলে

দিয়ে চ'লে আসে, ওই পর্যন্ত। কখনও ম্যানহাইমকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে :

'পড়ে দেখ একবার—বাঁদরটাকে এমন ঠোকাই ঠুকেছি…।' ম্যানহাইম পড়ে। ও জিজ্ঞাসা করে : 'কেমন লাগল ?'

"কেমন কি হে ? একেবারে ঘায়েল ক'রে ছেড়েছ যে ! একেবারে তুলো ধুনেছ। কিছু বাকী রাখোনি।'

'কি বলবে ও পক্ষ ?'

'বলা ? আগুন জ্বলবে।'

কিন্তু কোথায় বা আগুন, কোথায় বা কি। স্নিগ্ধ শীতল জলের ধারা ব'য়ে গেল। ক্রিসতফের ওপর সবাই ভারী প্রসন্ন এখন। যাদের ও গাল না দিয়ে জল খায় না, তারাও রাস্তায় দেখা হ'লে নমস্কার ক'রে যায়।

একদিন অফিসে এল অত্যন্ত চঞ্চলভাবে—টেবিলের ওপর একখানা সাক্ষাৎ-এর কার্ড ছুঁড়ে ফেলে জিজ্ঞাসা ক'রল : 'এর অর্থ ?'

যে-শিল্পীর নাম লেখা, তাকে বলতে-গেলে ও জবাই ক'রে ছেড়েছে গাল দিয়ে দিয়ে। কার্ডে লেখা :

'অশেষ ধন্যবাদ।'

ম্যানহাইম হেসে জবাব দেয় : 'বুঝছ না, ঠাট্টা ক'রেছে।'

ক্রিসতফ নিশ্চিন্ত হয় : 'আমি ভাবলাম আমার লেখায় লোকটা এত খুশি হবার কি পেলে!'

এহ্‌রেন্‌ফেলড্‌ বলে : 'লোকটা চ'টে আগুন হয়েছে। কিন্তু দেখাতে চায় যেন ওর কিছু হয়নি। সেইজন্য ওই দাঁত-বের-করা হাসি, বুঝলে না!'

'হাসি ?……শূয়র কাহাকার ! আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা। আবার

এমনি ঠোকা ঠুকব! তখন বাছাধনের মুখের হাসি কোথায় থাকে দেখব।' ক্রিসতফ তেড়ে উঠে বলে। ওয়াল্ডহৌস্ থামায়ঃ 'আরে কে বললে না না, তোমায় ঠাট্টা করেছে। লোকটা ভালো মানুষ। এক গালে চড় খেয়ে আর এক গাল বাড়িয়ে দিয়েছে। ওটা ওর বিনয়ের হাসি হে।'

'তাই বল।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ক্রিসতফ, 'গাল বাড়িয়ে দিয়েছে? বেশ তাই হবে, গালের চিকিৎসা করছি চাবুক দিয়ে।'

ওয়ালড্হৌস ওকে শান্ত ক'রতে চেষ্টা করে। অন্যরা হাসে। ম্যানহাইম বলে :

'আরে যেতে দাও হে! একটু এদিক ওদিকে আর কি হয়!'

ক্রিসতফ চ'লে যায়। ওর সহকর্মীরা হাসতে হাসতে কুটিপাটি হয়। ওদের দম বন্ধ হ'য়ে আসে। প্রাণ ভ'রে হেসে নিয়ে ওয়ালড্হৌস ম্যানহাইমকে বলে : 'একেবারে কান ঘেসে চলে গেল এবার। সাবধান একটু।'

ম্যানহাইম জবাব দেয় : 'আরে ভয় খাচ্ছ কেন? যথেষ্ট সময় আছে। তাছাড়া ওর কত বন্ধু জুটিয়ে দিচ্ছি!'

## [ দুই ]

### বেড়াজাল

ক্রিসতফ তার আনাড়ী হাত দিয়েই জার্মান শিল্প-কলা সংস্কারের কাজে লগে। এমনি সময় একটা ভ্রাম্যমান ফরাসী অভিনয়ের দল এসে উপস্থিত। অতি নামজাদা বর্ষীয়সী এক অভিনেত্রীর নেতৃত্বে একটা দল বেরিয়েছে ভ্রমণে। এই ছোট্ট বাদশাহী শহরটার মধ্য দিয়েই তাদের পথ। তাই নামলেন এখানে।

ওয়ালডহৌসের কাগজখানা এদের নিয়ে মেতে রইল ক'দিন। ম্যানহাইম ও তার বন্ধুরা ফ্রান্সের সাহিত্যিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কিছুটা জানে, অন্ততঃ জানে ব'লে দেখায়। জার্মানীতে এরাই বলতে গেলে ফরাসী ভাবধারার প্রতিনিধিত্ব করে। এই জন্যই ফ্রান্স সম্বন্ধে কৌতূহল উবে গেছে ক্রিসতফের। ম্যানহাইমের মুখে ফ্রান্স-এর প্রশংসা শুনে শুনে ও অস্থির হ'য়ে উঠেছে। ম্যানহাইম কয়েকবার গেছে সে-দেশে—আত্মীয় স্বজন কিছু কিছু আছেনও সেখানে। বলতে গেলে ইওরোপের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছেন ওদের জ্ঞাতি স্বজনেরা। এবং যেখানে আছেন সব দিক দিয়ে সেখানকার মানুষ হ'য়েই আছেন। এব্রাহামের এই বংশধরদের মধ্যে খুঁজলে এক-আধজন ব্যারনেট পাওয়া যাবে, বেলজিয়ান সেনেটরও আছেন একজন; একজন আছেন ফরাসী দেশের মন্ত্রী, একজন রাইখষ্টাগ এর ডেপুটি, একজন আবার পোপের অধীনে কাউন্ট—এমনি ধারা। যিনি যেখানে যেভাবেই থাকুন স্বজাতির প্রতি গভীর নিষ্ঠাটুকু ব্যাহত হয় না। এবং এ নিষ্ঠা

ওদের জাতীয় চরিত্রের অঙ্গীভূত। এই নিষ্ঠা-বোধই ওদের সার্বজনীন আত্মীয়তার মূল সূত্র। কিন্তু সেই সাথেই ওঁরা আবার খাঁটি ইংরেজ, খাঁটি ফরাসী, খাঁটি বেলজিয়ান হ'তে পারেন…। অর্থাৎ প্রবাসী হলেও, যে-ভূমিকে আপনার বলে গ্রহণ করেছেন, তাকে কেউ খাটো বললে ওদের গর্বে বাধে। ম্যানহাইম শুধু এদের থেকে আলাদা। ওই একমাত্র মানুষ যার কাছে নিজের দেশ ছাড়া আর প্রতেকটি দেশ স্বর্গ। পারীর কথা উঠলেই ও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। এবং পারী-বাসীদের গুণ বর্ণন করতে গিয়ে উচ্ছাসের প্রাবল্যে হাতে রং উঠে যায় কিছু বেশী। ছবি হয় অস্থির-চিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল, শিথিল-চরিত্র মানুষের, যাদের দিন কাটে হৈ চৈ করে, প্রেম নিয়ে খেলা ক'রে ক'রে সখের রাজনীতি করে।

ছোট শহর। যারা শিল্পের বিন্দুমাত্র বোঝে না তারাই ভ্রাম্যমান দলের অভিনয় দেখবার জন্য দলে দলে এসে টিকিট ঘরে ভিড় জমাতে লাগল। দেখে বিতৃষ্ণায় ভরে যায় ক্রিসতফের মন। প্রখ্যাতা অভিনেত্রী সম্বন্ধে সমস্ত আগ্রহ চলে যায়। প্রতিজ্ঞা করল অভিনয় দেখতে যাবেই না। টিকিটের দাম অত্যন্ত বেশী, ওর সাধ্যের বাইরে। সুতরাং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কঠিন হ'ল না।

এদের সঙ্গীত-অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে কয়েকটি ক্ল্যাসিক্যাল ও ছিল; কিন্তু অধিকাংশই অতি নিকৃষ্ট। নিছক বিদেশে চালান দেবার জন্যই পারীর তৈরী মাল—কারণ ওছা মালই আন্তর্জাতিক বাজারে চলে বেশী। প্রথম যেটি হ'ল, সেটি ক্রিসতফের অন্যত্র শোনা ছিল। অতএব দ্বিতীয় বার দেখার মত আর ইচ্ছে ছিল না। বন্ধুদের যেতে দেখে ঠাট্টা ক'রে হেসে বললে—ছিঃ ও আবার লোকে দু'বার দেখে! কিন্তু পরের দিন বন্ধুদের কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনল। অত্যন্ত ব্যগ্র হ'য়ে, কান খাড়া ক'রে রইল, কিন্তু দেখালেনা বাইরে। নিজের ওপর ভারী রাগ

হ'ল, কেন গিয়ে দেখে এল না, তাহলে সবার মুখ বন্ধ ক'রে দিতে পারত প্রতিবাদ ক'রে।

দ্বিতীয় দিন হ'ল 'হ্যামলেট্'-এর ফরাসী সংস্করণ। শেক্সপীয়রের নাটক দেখার এতটুকু সুযোগও ও ছাড়ে না। ওর কাছে শেক্সপীয়রও বিঠোফেনের মত প্রাণের অনন্ত প্রস্রবণ। ওর জীবনের সংগ্রাম ও সংশয়ের যে অধ্যায়টি শেষ হ'ল তার পরিপ্রেক্ষিতে হ্যামলেট বিশেষ ক'রে ওর ভালো লাগে। মুগ্ধ হ'য়েছে ও। ভয়ও করে—ওই আয়নায় বুঝি নিজের ছবিটাই দেখা যাবে। থিয়েটরের বিজ্ঞাপন খুঁজে খুঁজে দেখে লুকিয়ে। কিন্তু এমনি ওর জেদ, বন্ধুদের কাছে যখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে প্রতিজ্ঞাটা, কিছুতেই আর ও-মুখো হ'লো না। বাড়ীতেই ব'সে থাকবে ব'লে ঠিক করল। মনে মনে ভারী আফশোষ হ'ল। বাড়ী ফিরছে, এমনি সময় এল ম্যানহাইম। ভয়ংকর রেগে রয়েছে ও কেন জানি।

ওর হাতটা বগল-দাবা ক'রে চলতে লাগল পথ, রাগের কারণ—বুড়ী পিসী তার ভেড়ার পালের মত একপাল সাঙ্গো পাঙ্গ নিয়ে মরতে আসছেন ওদের বাড়ী। বাবার হুকুম—বাড়ী থেকে সব্বাইকে পরম অতিথিদের বরণ করতে হবে। পালিয়ে ও আসতে পারত, কিন্তু ওরে বাবারে! পারিবারিক আদব কায়দা একচুল এদিক ওদিক হবার যোটি নেই, তাহ'লে রক্ষে রাখবে না বুড়ো। চটানো চলে না এখন—ভারী সাবধানে চলা দরকার। টাকার দরকার যে; বুড়োর মাথায় হাত বুলিয়ে ওটা বের করতে হবে তো। অগত্যা থিয়েটরে না গিয়ে মুখ গুঁজে ঘরে ব'সেই থাকতে হ'ল, কি আর করা।

ক্রিসতফ জিজ্ঞাসা ক'রল: 'টিকিট কিনেছিলে?'

'নয়তো কি? বক্সের টিকিট, যা তা নাকি? কিন্তু এখন গিয়ে

বাবার পার্টনার বুড়োকে ওখানা দিয়ে আসতে হবে। তিনি যাবেন না, তাঁর মহিষ-মর্দিনী গিন্নী যাবেন, টার্কী-মুর্গীর মত মেয়েটা যাবে···আমার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হ'য়ে গেল আর কি! ইচ্ছা করছে, টিকিটখানা দেবার সময় মাথাগুলো ঠুকে দিয়ে আসি। তা বুড়ো কি তেমনি! টিকিট যদি অমনি পায় মাথাটা স্বচ্ছন্দে ভাঙ্গার জন্য এগিয়ে দিতে পারে। অবশ্যি টিকিট না হ'য়ে ওটা যদি ব্যাঙ্ক নোট হ'ত, বুড়োর তাহ'লে আরো ভালো হ'ত।'

হঠাৎ মাঝখানে থেমে গিয়ে হাঁ ক'রে ক্রিসতফের মুখের দিকে চেয়ে থেকে ব'লে উঠল :

'দাঁড়াও! দাঁড়াও! ঠিক যা আমি চাই···তুমি যাচ্ছনা থিয়েটরে ক্রিসতফ?'

'না।'

'তাহ'লে তোমায়ই যেতে হবে। লক্ষীটি, মানা করো না।'

ক্রিসতফ কিছুই বুঝতে পারল না। বলল : 'কিন্তু আমি তো টিকিট কিনিনি।'

'আরে এই তো নাওনা।' ব'লে টিকিটখানা ওর হাতে গুঁজে দিলে।' মুখের ভাবখানা যেন দেশ জয় ক'রে এসেছে ও।

'পাগল হ'লে? তারপর তোমার পিতৃদেবের হুকুম?'

ম্যানহাইম হাসে : 'যা রাগটা করবেন!' চোখ মুছে ও বলে : 'কাল সকালে উঠে কিছু জানবার আগেই ঠিক ক'রে নেব।'

ক্রিসতফ ব'লে বসল : 'দেখ তোমার বাবা রাগ করবেন জেনে শুনে এ টিকিট আমি নিতে পারি না।'

'তোমার সাথে তার সম্বন্ধ কি? কি ব্যাপার তুমি কিছু জানো না।'

টিকিটখানা খুলে ক্রিসতফ বলে : 'তা তো হ'লো, কিন্তু চারজনের টিকিট যে। এতগুলো নিয়ে করব কি আমি?'

'যা খুশি করো! টেনে ঘুম দাও সীটগুলোর ওপর লম্বা হ'য়ে। নয়তো বান্ধবীদের নিয়ে যাও। বান্ধবী টান্ধবী আছে নিশ্চয়ই! না যদি থাকে বলো ধার দি।'

ক্রিসতফ টিকিটখানা বাড়িয়ে ধ'রে বলে : 'না, নেব না। ধর, নাও টিকিটটা।'

এক পা পিছিয়ে গিয়ে ম্যানহাইম বলে : 'টিকিট ফিরিয়ে নেব! এই শর্মার দ্বারা হবে না। তুমি যদি নেহাৎই না যেতে চাও, জোর ক'রতে পারি না। তবে যাও বা না যাও টিকিট আমি ফিরিয়ে নিচ্ছেনে, এটা জেনো। ইচ্ছে হয় পুড়িয়ে ফেলো। নয়ত ভক্তি ভরে মাথায় ব'য়ে দিয়ে এসোগে বুড়োটাকে। যা খুশি তোমার। আচ্ছা, আজ আসি তাহ'লে।'

রাস্তার মাঝখানে ক্রিসতফ দাঁড়িয়ে রইল টিকিট হাতে। ম্যানহাইম চ'লে গেল।

ক্রিসতফের মন গভীর অস্বস্তিতে ভ'রে যায়। মনে হয়, দিয়ে আসা যাক ম্যানহাইমের বাবার পার্টনারকে। কিন্তু বিশেষ উৎসাহ-বোধ করে না। ভাবতে ভাবতে বাড়ী গেল। এমনি এক সময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, এখনও যাওয়া যায়। সময় বিশেষ নেই, কোন মতে জামা কাপড় প'রে নেওয়া চলবে। টিকিটখানা নষ্ট ক'রে কি হবে? মাকে বলল : 'চলো মা, যাই।' মা শুতে গেলেন। অতএব একাই যেতে হ'ল। মনটা শিশুর আনন্দে নেচে উঠল। কিন্তু একটা কাঁটা খচ খচ ক'রতে লাগল। একাই এতটা আনন্দ ভোগ ক'রতে হবে। ম্যানহাইমের বাবা বা তার বন্ধু—যাকে বঞ্চিত ক'রে এ-সন্ধ্যাটি ও লাভ

ক'রল, তাদের কারো জন্যে ওর ক্ষোভ নেই। কিন্তু ওরই মত কত তরুণ এ আনন্দের স্বাদ পাবে না। কয়েকজনকে নিয়ে আসতে পারত সাথে। কিন্তু হ'লো না। চারদিকে তাকাল, কেউ নেই যাকে টিকিটটা দেওয়া যায়। আর কাউকে যে এ-আনন্দটুকুর ভাগ দিতে পারল না এ আফসোস রাখার জায়গা নেই। হতভাগা বঞ্চিতদের জন্য ওর মনটা বেদনায় ভ'রে রইল। কিন্তু দেরী হ'য়ে গেল, আর ব'সে আফসোস ক'রলে লাভ হবে না কারোই।

হলের দরজার কাছে, বন্ধ জানালার পাশে নোটিশ ঝোলান রয়েছে "শূন্য আসন আর নাই।" ফিরে যাচ্ছিল অনেকে। একটি মেয়ের দিকে হঠাৎ চোখ প'ড়ে গেল। বেচারা অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে ফিরে যাচ্ছে। কিছুতেই পা যেন যেতে চাইছে না। যারা ভেতরে ঢুকবার সনদ সংগ্রহ ক'রতে পেরেছে তাদের ওপর একটা হিংসে ওর চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। খুব সাধারণ অথচ ভালো রংএর একটা পোষাক পরা। বিশেষ দীর্ঘাঙ্গী নয় মেয়েটি; মুখখানা রোগা, কিন্তু সর্বাঙ্গে চমৎকার একটি সৌকুমার্য। সে সুন্দর না কুৎসিত, না সাধারণ, সেদিকে ক্রিসতফের কোনো লক্ষ্য নেই। তবু পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে ও থেমে গেল, এবং মেয়েটির দিকে ফিরে, কোনো কিছু হিসেব না ক'রে, একেবারে সোজাসুজি ব'লে ফেলল বিনা ভূমিকায়: 'সীট পাননি বুঝি?'

মেয়েটি লজ্জায় লাল হ'য়ে ব'লল: 'না।'

ওর উচ্চারণে বিদেশী টান।

'আমার কাছে একটা বক্সের টিকিট আছে। এতগুলি আসন নিয়ে কি যে ক'রব ভেবে পাচ্ছিনে। আসবেন?'

মেয়েটি আবার লাল হ'য়ে উঠল। ধন্যবাদ দিয়ে জানালে, এ দান গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই প্রত্যাখ্যানে ক্রিসতফ ভারী বিব্রত

হ'য়ে উঠল। ক্ষমা চাইলে বার বার। ওকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রল যে কিছু মনে ক'রে প্রস্তাবটা ও করেনি। মেয়েটির মুখ চোখে অপরিসীম ব্যাকুলতা। দেখে মনে হয়, ক্রিসতফের প্রস্তাব পারলে যেন ও দু'হাতে লুফে নেয়। কিন্তু কিছুতেই ওকে রাজী করান গেল না। ক্রিসতফ ভারী অপ্রস্তত। হঠাৎ যেন অন্ধকারে আলোর দেখা পায়। বলে ক্রিসতফ : 'দেখুন, এক কাজ করুন। টিকিটটা নিয়ে আপনি গিয়ে দেখে আসুন। আমি একবার দেখেছি। আর নাই দেখলাম (ওর স্বরে একটু গর্বের আভাস)। আমার চাইতে অনেক বেশী ভালো লাগবে আপনার। নিন নিন, লক্ষ্মীটি নিন।'

মেয়েটি অভিভূত হ'য়ে পড়ে। সরল হৃদয়ের এই আন্তরিকতাকে ঠেলতে পারে না। ওর দু' চোখে জল ভরে ওঠে। আস্তে আস্তে অস্ফুট স্বরে বলে : 'তা হয় না, একজনকে বঞ্চিত ক'রে আমি থিয়েটর দেখব, তা হয় না, পারবো না।'

মৃদু হেসে ক্রিসতফ বলল : 'বেশ তো, চলুন তা হ'লে দু'জনেই দেখা যাক।'

ক্রিসতফের দুই চোখে এমনি মমতা এমনি সরলতা আর গভীর বিশ্বাস উচ্চারিত হ'য়ে উঠল, যে আর না ব'লতে পারলে না মেয়েটি। ওর ভারী লজ্জা ক'রতে লাগল। একটু বিব্রত হ'য়ে উত্তর দিল : 'ধন্যবাদ' চলুন।'

ভেতরে এল দু'জনে। বক্সটা খুব বড়, চওড়া, এবং মঞ্চের ঠিক মুখোমুখি। ইচ্ছে করলেও আড়ালে থাকার উপায় নেই। মেয়েটিকে সামনের দিকে বসিয়ে নিজে একটু পেছনে বসল যাতে সে বিব্রত বোধ না করে। সোজা হ'য়ে কাঠের পুতুলের মত ব'সে রইল মেয়েটি। এত লাজুক, ঘাড় ফিরিয়ে দেখবে তাও পারছে না। রাজী না হ'লেই হ'ত।

কেন ছাই রাজী হ'তে গেল। ওর সাথে কি কথা যে বলবে ক্রিসতফ ভেবে পায় না। থাক এখন আর ব্যতিব্যস্ত ক'রে লাভ নেন। একটু সামলে সহজ হ'য়ে বসুক বেচারী। এমনি ভাবে মুখ ঘুরিয়ে বসল, যেন তাকিয়ে আছে অন্য দিকে, কিন্তু যে-দিকেই থাক ক্রিসতফের মুখ, পাশে তার অপরিচিতা তরুণী বান্ধবী!—কৌতূহলে ছলছলিয়ে উঠল বক্স-জগতের দেবীদের মহল। তাদের অর্থপূর্ণ কানাকানির ইশারাটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ক্রিসতফ জ্বলন্তদৃষ্টিতে চায়। তাচ্ছিল্যের ভাষায় চোখ দুটি যেন বলে: 'তোমাদের গ্রাহ্য করিনে আমি। কোনো আগ্রহ নেই তোমাদের 'পর আমার। কেন তোমাদের এ অশোভন কৌতূহল?' কিন্তু মোটেই খেয়াল হয়নি, কৌতূহলের উৎস ও নয়, ওর অপরিচিতা সঙ্গিনী। পরে খেয়াল হ'লে, ভারী বিশ্রী লাগল। ওদের ব্যবহার এত শালীনতাহীন যে হুঙ্কার আসে। ওর জেদ্ চ'ড়ে যায়। না, কাউকে ও গ্রাহ্য করবে না। বুঝিয়ে দেবে কারু তোয়াক্কা রাখে না ও। বেপরোয়া ভাবে মেয়েটির দিকে ঝুঁকে আলাপ জোড়ে। মেয়েটি আড়ষ্ট হ'য়ে ওঠে এই ঘনিষ্ঠতায়। উত্তর না দিয়ে পারে না, বড় অসহায় বোধ হয়, অস্বস্তিতে ওর মন ছেয়ে যায়। ক্রিসতফের দিকে না তাকিয়ে কোনও মতে একটু হ্যাঁ বা না দিয়ে জবাব সারে। ক্রিসতফ বুঝতে পারে; ভারী করুণা হয় বেচারীর এই বিব্রত অবস্থা দেখে। এক দিকে স'রে গিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে নিরুপায় হ'য়ে। সৌভাগ্যক্রমে নাটক আরম্ভ হ'য়ে যায় তাড়াতাড়ি।

বিজ্ঞাপন দেখেনি ক্রিসতফ। তারকাটি যে কোন্ ভূমিকায় নামছেন, তা জানবার ওর কোন আগ্রহ হয়নি। সাধারণ মানুষ অভিনয় দেখতে আসে না, আসে অভিনেত্রীদের দেখতে। এর অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, ক্রিসতফ তাদের একজন। ওর কৌতূহলই হয়নি, মহিলা ওফিলিয়া

সাজবেন, না রাণী। হ'লে হয়ত, মহিলার বয়সের বিচার ক'রে রাণী সাজবেন বলেই ধারণা হ'ত। কিন্তু হ্যামলেট! হ্যামলেট বেশে এক বর্ষীয়সী মহিলাকে দেখতে হবে পাদ-প্রদীপের সামনে, এ অসম্ভব স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। পর্দা উঠল, হ্যামলেট দেখা দিলেন রঙ্গমঞ্চে; তার পুতুলের মত যান্ত্রিক হাত পা নাড়া আর মিহি সুরের কথা শুনেও ওর কোনো সন্দেহ হয়নি। শুধু অবাক হয়েছে। আর ভেবেছে: 'এ কে?' স্বগত উক্তি হ'লেও স্বরটা গিয়ে পৌঁছল অনেকের কানেই। কে এ? না, না, হ'তে পারে না। নিশ্চয়ই…না না…

কিন্তু অবশেষে বিশ্বাস না ক'রে আর উপায় নেই। অত্যন্ত কটু একটা উক্তি অতর্কিতে বেরিয়ে এল মুখ থেকে। পাশে আছে একজন সে-খেয়াল হয়নি। কিন্তু ওর গলা যে পাশের বক্সে গিয়েও পৌঁছেছে তা বোঝা গেল বেশ। কারণ, সেখান থেকে 'চুপ্, চুপ' ব'লে ক্রুদ্ধ ধমক এল কয়েকটা। ক্রিসতফ একেবারে পেছনে স'রে ব'সল, যাতে সেখান থেকে ওর গলা কোথাও না শোনা যায়। ব'সে ব'সে প্রাণ ভ'রে গাল দিতে লাগল আপন মনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেজাজ বিগড়েই রইল।

নিরপেক্ষ হ'য়ে বিচার করতে পারলে ওদের অনুকরণের অদ্ভুত ক্ষমতাকে ক্রিসতফ প্রশংসা না ক'রে পারত না, এবং শিল্পের যে-যাদুর বলে ষাট বছরের বৃদ্ধা তরুণ হ্যামলেট-এর ভূমিকায় নামেন এবং তা কারো চোখে বিসদৃশ ঠেকে না বরঞ্চ দর্শকের প্রশংসা অর্জ্জন করে,— সেই যাদুকেও স্বীকার না ক'রে পারত না। কিন্তু ওপরে পলেস্তারা পালিশ লাগিয়ে প্রকৃতিকে বিকৃত করার কুরুচি ক্রিসতফের অসহ্য। নারী নারীই থাকবে; পুরুষ পুরুষ, এই হ'ল ওর অভিমত। [এখন অবশ্য তা হয় না]। ও ভেবেই পায় না, এরা করছে কি। বিঠোফেন-এর

'লিওনারা' যা করলে সে আর বলে লাভ নেই। ভালো লাগেনি ওর। কিন্তু হ্যামলেট-এর এই অভিনয়—একে কি ভাষায় যে বর্ণনা করবে ও তা ভেবে পায়না। এমনি ধারা অভিনয় হতে পারে তা ও ধারণাও করতে পারেনি। রাজকুমার হ্যামলেট বলিষ্ঠ, চতুর, বিদ্বান, দার্শনিক ভাবাপন্ন; স্বাস্থ্যবান, দৃঢ় তার দেহ-গঠন, সহজে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন। অশরীরী ছায়ামূর্তি দেখে বিকল হয়েছেন কুমার—সেই চরিত্রকে রূপায়িত করছে এক নারী। নারী নয়—দানব। যে-মেয়ে পুরুষের নকল করে, সে দানব, মানুষ নয়। যে হ্যামলেটের অভিনয় নারী দ্বারা সম্ভব, সে-হ্যামলেট ক্লীব। কিন্তু আশ্চর্য! কেউ প্রতিবাদ করছে না! সবার মুখ বন্ধ! কাল কি থেমে গেল! সমালোচনার ক্ষুর-ধার কি গেল ভোঁতা হ'য়ে! নইলে মঞ্চে এসে দাঁড়াবার সাহস কেমন ক'রে হ'ল এদের? ধিক্কার দিয়ে থামিয়ে দিলে না! অভিনেত্রীর স্বর কানে যেতেই একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল ক্রিসতফ। সেই এক ঘেয়ে ছড়া-কাটা সুরে, টেনে টেনে বিনিয়ে বিনিয়ে বলা। রসহীন, রসবোধহীন, কাণ্ড-জ্ঞানহীনদেরই ভালো লাগে ওই নাকি সুরের কান্না। ক্রিসতফ-এর এমনি অসহ্য লাগল যে চ'লে যাবার জন্য ও ছট্‌ফট্‌ ক'রতে লাগল। পেছন ফিরে, ব'সে ব'সে বিশ্রী ভাবে মুখ বিকৃত ক'রতে লাগল কোণে দাঁড়-করান শাস্তি-পাওয়া ছেলের মত। সৌভাগ্যক্রমে ওর সঙ্গিনী সাহস ক'রে ওর দিকে তাকায় নি। নইলে ভাবত লোকটা পাগল।

একটি তরুণীর মিঠে গম্ভীর স্বর কানে এল। ক্রিসতফ কান খাড়া ক'রে রইল। ও তো স্বর নয়, সুরলোকের সঙ্গীত। কোথায় গেল ওর অস্থিরতা, কোথায় গেল মুখ-বিকৃতি। এক লহমায় পাষাণ প্রতিমার মত স্থির নিস্পদ হ'য়ে ব'সে রইল ক্রিসতফ। মেয়েটি কথা কয় না যেন

সুরের ধারা বয়। ও ঘুরে বসল এবার—দেখবে কোন পাখী এ, যার গলায় এমন মিঠে সুর ঝরে। ওফিলিয়া। কিন্তু শেক্স্পীয়রের সেই স্বল্প-দেহা ওফিলিয়া নেই এ-মেয়ের মধ্যে। ঋজু, দীর্ঘ, পরিপুষ্ট-দেহা অতি সুন্দরী এক তরুণী—ইলেকট্রা বা কাসেণ্ড্রার সদ্য নির্মিত মর্মর মূর্তির মত—প্রতি অঙ্গ যেন সূক্ষ্ম নিপুণতায় খোদাই করা। প্রাণ প্রাচুর্যে টলমল করছে। প্রাণপণে নিজের ভূমিকার সীমা-বন্ধনে আপনাকে ও রাখতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু অত প্রাণ; সব বাঁধন ভেঙ্গে তারুণ্যের খর-বেগ উছলে উঠছে সর্ব দেহে, প্রতি অঙ্গের সঞ্চালনে, প্রতি ভঙ্গিমায়। আপনাকে সংযত করার কঠিন প্রয়াস ছাপিয়ে চোখের তারায় নাচছে খুশির বিদ্যুৎ। ওর রূপে ক্রিসতফ মুগ্ধ হ'য়ে গেল। একমুহূর্ত আগে হ্যামলেট-এর বিসদৃশ অভিনয়কে বিচার করেছিল ও নির্মম হ'য়ে কিন্তু এখন একবারও মনে হ'ল না ওফিলিয়ার অভিনয়েও কতখানি বৈসাদৃশ্য রয়েছে। রঙ্গমঞ্চের ওফিলিয়া শেক্স্পীয়রের সৃষ্টি হ'তে বহুদূর। যে ওফিলিয়া ওর মর্মের মধ্যে বেঁচে ছিল, আজকের পাদপীঠের আলোয় ঝলসিত এই মেকী প্রতিমার কাছে তার বিসর্জন হ'ল। কিন্তু তবু এতটুকু আফসোস হ'ল না। আবেগধর্মী মানুষ আপনার অজ্ঞাতসারেই বিশ্বাস-ঘাতকতা করে নিজের সাথে। ওর মনও ওকে ভোলায়। আজ মনে হয় দুঃখিনী ওফিলিয়ার শুভ্র নিষ্কলঙ্ক কুমারী হৃদয়ের গভীর বেদনাকে পাওয়া যাবে এই খরস্রোতা কল্লোলিনীর মধ্যে। ওই অনুপম কণ্ঠের উষ্ণ, কোমল মখমলের মত মোলায়েম স্বরের যাদুতে অত বড় বিকৃতিটাকেও ওর এতটুকু বিসদৃশ মনে হ'ল না।

প্রতিটি কথায় যেন সুর ঝরে। হাওয়া-দোলান বুনো ফুলের সৌগন্ধের মত একটা অপূর্ব ছন্দ নাচে প্রতিটি শব্দকে ঘিরে ঘিরে।

সোনালী সূর্যের সোনার আলোর আভা, আর পাগলা উত্তুরে হাওয়ার দুরন্তপনা দিয়ে তৈরী এক বিচিত্র ওফিলিয়া জন্ম নিলে ওর কল্পনার দিগন্তে।

সঙ্গিনীর কথা ওর মন থেকে মুছে গেল। পেছন থেকে উঠে এসে সামনের আসনে বসল ওর পাশে। মঞ্চের ওপর নাম-না-জানা মেয়ে। ও চোখ ফেরাতে পারছে না। শ্রোতার দল নাম-গোত্রহীন নূতন অভিনেত্রীকে দেখতে আসেনি। এসেছে প্রখ্যাতা তারকাকে দেখতে। সুতরাং নূতনের দিকে কারো চোখ নেই। নারী-হ্যামলেট মঞ্চে এসে দাঁড়াতেই চারিদিকে তুমুল হাততালি ও হর্ষধ্বনি ওঠে। ক্রিসতফ দাঁত কড়মড় ক'রে চাপা গর্জন ক'রে উঠল: 'মূর্খ ? মূর্খ ! যত সব মূর্খের দল !' ওর চাপা গলা ছড়িয়ে পড়ে আশে পাশে।

প্রথম অংকের শেষে যবনিকা পড়লে তবে ওর মনে হ'ল সঙ্গিনীর কথা। দেখল সেই লজ্জাশীলা মেয়ে তেমনি জড়সড় হ'য়ে বসে আছে। মনে মনে হাসে ও, কি ভয়ই না খাইয়ে দিয়েছে বেচারীকে পাগলামী ক'রে। নেহাৎ দৈবে এই কয়েক ঘণ্টার সান্নিধ্য। মেয়েটি লজ্জায় ম'রে যাচ্ছিল। অত্যন্ত তীব্র একটা মানসিক উত্তেজনার মধ্যে ও ক্রিসতফের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু স্বীকৃতিটা মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতেই চমকে উঠেছিল—এ কি হল। এ কি হল! কোনো অজুহাত ক'রে কথা ফিরিয়ে নেবার পথ কি নেই? যখন দেখল সব কটা চোখ ওরই দিকে, ওর সর্ব দেহে যেন কাঁটা ফুটতে লাগল। তারপর পেছনে ব'সে [ যদিও পেছনে তাকাবার ওর সাহস ছিল না ] ক্রিসতফের ঐ চাপা তর্জন গর্জন ও ছটফটানি। ও যেন মরমে ম'রে যেতে লাগল। এর পর যখন উঠে এসে পাশে ব'সল পাগলটা, ও ভয়ে প্রায় জমে গেল। কি যেন ঘটবে—কি যেন ঘটবে—কাঠ হ'য়ে ব'সে রইল উদগ্র

প্রতীক্ষায়। এর পরে আর কোন নূতন পাগলামী ক'রবে ও! মাটি দ্বিধা হও, তোমার গভীর অন্ধকারে মুখ ঢাকি আমি!

অজ্ঞাতসারে স'রে যায় ও—যদি স্পর্শ লাগে—ভয়ে কাঁটা হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু অঘটন ঘটল না কিছু। বিরতির সময় ক্রিসতফ স্নিগ্ধ স্বরে বলল: 'আমি ভারী বিশ্রী মানুষ, না? এ রকম সঙ্গী থাকলেই হয়েছে আর কি। ক্ষমা চাইছি, সঙ্গীর কর্তব্য করিনি।' মেয়েটি তাকিয়ে দেখল, ওর চোখে ভারী নরম মমতা-ভরা একখানি হাসি। ঐ দৃষ্টি যেন সব দূরত্ব ঘুচিয়ে দিল। ওর লজ্জা গেল, ভয় গেল। ক্রিসতফ বলে:

'দেখুন, আমার মস্ত দোষ, মনের ভাব আমি লুকুতে পারিনে…। কি করেই বা পারা বায় বলুন ত। ঐ বুড়ী…ওঃ সহ্য করা যায়?'

বিরক্তিতে ওর মুখটা বিকৃত হ'য়ে উঠল আবার। একটুখানি হেসে মৃদু স্বরে বলল মেয়েটি: 'কিন্তু অভিনয় করেছে চমৎকার, না?'

ওর উচ্চারণের বিশেষ ভঙ্গি দেখে জিজ্ঞাসা করে ক্রিসতফ: 'আপনি বিদেশী বুঝি?'

'হাঁ।'

'গভর্নেস?' অনাড়ম্বর পোষাকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'হাঁ।'

'জাতি?'

'ফরাসী।'

অবাক হ'য়ে যায় ক্রিসতফ। বলে: 'কি বললেন? ফরাসী? আমি তো ভাবতেই পারি নি।'

'কেন বলুন তো?' ভয়ে ভয়ে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে।

'তাহ'লে এত…গম্ভীর?'

মেয়েটির মনে হয় এ তো প্রশংসার কথা নয়। প্রকাশ্যে বলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে : 'কেন ফ্রান্স-এ গম্ভীর মানুষ নেই নাকি ?'

ওর সরল অকপট ছোট্ট মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখে ক্রিসতফ। কপালখানা চওড়া, ঋজু ছোট্ট নাক, ভারী সুকুমার থুথ্‌নি, হাল্কা দুখানি গাল ঘিরে বাদামী রংএর চুল। ক্রিসতফ তাকিয়ে ছিল বটে কিন্তু দেখছিল না ; ওর মনের মধ্যে তখন সেই তরুণী অভিনেত্রীর ছবি।

আবার বলল : 'আপনি ফরাসী! আশ্চর্য!...ওই ওফিলিয়ারই জাতি আপনি তাহ'লে! কিন্তু কে বলবে!'

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে আবার বলতে লাগল :

'কি সুন্দর, না ?' কিন্তু একবারও ওর খেয়াল হ'ল না, যাকে জিজ্ঞাসা ক'রছে, উপমাটা তারি সাথে, এহেন স্তুতিবাদ ওপক্ষে উৎসাহজনক হ'তে নাও পারে। মেয়েটির মনে লাগল, কিন্তু কিছু মনে ক'রল না সে, কারণ ওর অভিমতও তাই। ক্রিসতফ কথায় কথায় মেয়েটির কাছ থেকে বের করতে চেষ্টা ক'রল ও আরো কিছু জানে কিনা সেই তরুণী সম্বন্ধে। কিন্তু কিছু জানে না ; শুধু অভিনেত্রী কেন, থিয়েটার সম্বন্ধেই ওর জ্ঞান নেই কিছু।

'ফরাসী ভাষা শুনে আপনার খুব ভালো লাগল নিশ্চয়ই।' কথাটা ব'লল নেহাৎ হালকা সুরে, কিন্তু মেয়েটির হৃদয়ের ভারী একটা কোমল জায়গায় গিয়ে ছোঁয়া লাগল তার। বলল :

'যা বলেছেন। খুব ভালো লাগল। এখানে আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসে।' এমনি একটা সকরুণ অন্তরঙ্গতার সুর ফুটে উঠল ওর স্বরে, ক্রিসতফ অবাক হ'য়ে গেল।

আরো ভালো ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে দেখল। ওর দুটি হাত দৃঢ়-সংলগ্ন। চোখে মুখে কি যেন নিরুদ্ধ বেদনা ছাওয়া। হঠাৎ

মেয়েটির মনে হয়, কি জানি ওর কথায় যদি ক্রিসতফের আঘাত লেগে থাকে। তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল :

'ক্ষমা করুন। কি জানি সব আবোল তাবোল বলছি আমি।'

ক্রিসতফ্ হেসে ওঠে : 'ক্ষমা চাইছেন কেন? ঠিক কথাই তো বলেছেন। শুধু ফরাসীদেরই যে এখানে দম বন্ধ হয় তা নয়। বাপ স্!'

পেছন দিকে হেলান দিয়ে ব'সল গা ছেড়ে দিয়ে। একটা লম্বা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

মেয়েটি লজ্জায় মরে যেতে লাগল—এমন ক'রে মুখ খুলল কেমন ক'রে? ছি? ছি? তা ছাড়া পাশের বক্স্এর সবাই কান পেতে রয়েছে ওরা কি বলে। ওর চোখ এড়ায়নি। মরমে ম'রে গিয়ে ও নির্বাক হ'য়ে বসে রইল। ক্রিসতফও দেখেছিল। জ'লে উঠল ও। উঠে গিয়ে বারান্দায় পায়চারী ক'রে বিরতির সময়টা কাটিয়ে দিল। মেয়েটির কথা ওর কানে বাজছে। কিন্তু ও তন্ময় হ'য়ে আছে ওফিলিয়ার স্বপ্নে। পরের অংকগুলিতে ও সব ভুলে গেল, বিশ্ব-জগৎ কেবল ওফিলিয়াময় হ'য়ে গেল।...যবনিকা উঠল...উন্মাদিনী ওফিলিয়া...ওর ভাঙ্গা বুকের কান্না গান হ'য়ে ঝরছে...। ক্রিসতফও পাগল হ'য়ে যাবে। ওর বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। কান্না আর বাঁধন মানছে না। না...না... শিল্পীর চোখে অশ্রু নেই, থাকতে পারে না...। এত দুর্বল ও! রাগ হয় নিজের ওপর। কিন্তু যদি...না, কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে খেলো ক'রবে না নিজেকে। হঠাৎ উঠে ও বক্স্ ছেড়ে চলে গেল। বারান্দা জনশূন্য। কখন যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে একেবারে বাইরে এসে দাঁড়াল মথিত চিত্তে তা ওর খেয়াল নেই। রাত্রির শীতল বায়ু বুক ভ'রে নিয়ে, নির্জন নৈশ রাস্তা বেয়ে চ'লল অন্ধকারে। একটা খালের ধারে এসে ওর সম্বিৎ ফিরল।

বাঁধের গায়ে হেলান দিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে ও দাঁড়িয়ে রইল··· মৌন কালো জলের বুকে রাস্তার প্রদীপের ছায়া নাচে···ওর চিত্তও আজ অমনি, ওই জলের মত অমনি আঁধার, অমনি চঞ্চল। আপনার মধ্যে তাকিয়ে দেখল—ও তো নয়, আনন্দ-দেবতা নৃত্য করছেন ওর হৃদয় জুড়ে, অন্তর ভ'রে। আর কিছু নেই সেখানে। শুধু আনন্দ। দূরের ঘড়ি সময় জানান দিয়ে গেল। ফিরে গিয়ে থিয়েটরের বাকীটা দেখবে? অসম্ভব! কেন ফিরে যাবে? শুধু খানিকটা বর্বরতা দেখতে? না, সে-লোভ ওর নেই। সমস্ত নাটকখানি জীবনের ওপর এক দুরন্ত ধিক্কার। কিন্তু তবু তার প্রাণশক্তির বিপুলতায় বেদনা আনন্দ হ'য়ে ওঠে আঘাত হ'য়ে ওঠে তীব্র সুরার ফেনিল উন্মাদনা···

অজানা মেয়েটির কথা একেবারে ভুলে যায়, ঝড়ে যায় অজান্তে ওর মন থেকে। নামও শুধায়নি। বাড়ী ফিরে আসে ক্রিসতক।

পরের দিন ভোরে ও গেল ওফিলিয়ার সাথে দেখা করতে। একটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেল। তারি মধ্যে অন্যদের সাথে গাদা হ'য়ে আছে সেও মালিকের ব্যবস্থা অনুসারে। তারকাটী রয়েছেন শহরের সব থেকে ভালো হোটেলে। একটা ছোট্ট বিশ্রী ঘরে ক্রিসতফকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। একেবারে নরক হ'য়ে আছে ঘরটা—চারদিকে হরেক রকম জিনিস এলোমেলো ছড়ান; খোলা পিয়ানোটার ওপর এঁটো বাসন পড়ে রয়েছে; কতকগুলি চুলের কাঁটা আর গৎ-লেখা কাগজের ছেঁড়া টুকরো মেজেময় ছড়ান। পাশের ঘরে ওফিলিয়া গলা ছেড়ে গান গাইছে ছেলে মানুষের মত, শুধুই চিৎকার করার আনন্দে। দেখা করতে এসেছেন কেউ শুনে মুহূর্তের জন্য থামল বটে কিন্তু পরক্ষণেই চেঁচিয়ে অত্যন্ত হাল্কা সুরে জিজ্ঞাসা করল: 'কি নাম

বললে? ক্রিসতফ! ক্রিসতফ কি! ক্রিসতফ ক্রাফট? বাপস্ কি নাম!' ভ্রূক্ষেপও করলে না পাশের ঘরে অতিথি শুনতে পাবে। 'আর' অক্ষর গুলিকে মুখের মধ্যে জোর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নেড়ে চেড়ে অনেক বার নামটা উচ্চারণ করলে: 'বাপরে বাপ্, নাম নয়তো, যেন লগুড় নিয়ে তাড়া করছে। বুড়ো না যুবা হে? বেশ হাসি-খুশি? দেখতে ভালো? বেশ যাও, আমি আসছি।'

আবার গান শুরু করল: 'ও আমার নাগর, আমার পিতম্'…গাইতে গাইতে সারা ঘরময় দাপাদাপি ক'রে বেড়াতে লাগল—চুলের কাঁটাটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় কোন্ আবর্জনার স্তূপের তলায় পড়ে আছে। রাগে চীৎকার করতে থাকে। ক্রিসতফ ওকে দেখতে পায় না বটে, কিন্তু ওর প্রতিটি নড়াচড়া কল্পনার চোখে দেখতে পায়। ক্রমশঃ পায়ের শব্দ এগিয়ে আসে। তারপর ধড়াস ক'রে দরজাটা হঠাৎ খুলে যায়; সামনে দাঁড়িয়ে সেই ওফিলিয়া খোলা দ্বারের ফাঁকে।

একটা অত্যন্ত ঢিলে গাউন পরা যেমন তেমন ক'রে। ঢোলা আস্তিনের মধ্য দিয়ে আভরণহীন বাহু দুখানি দেখা যায়। অযত্ন-প্রসারিত চুলের গোছা চোখে মুখে পড়েছে। ওর চোখ, মুখ, গাল, এমন কি থুথনির নীচে যে নিটোল টোলটি তার মধ্যে হাসি ঝিলমিল করছে। স্বভাব গভীর সুরেলা কণ্ঠে মিঠে ক'রে ক্ষমা চাইল ঘরোয়া বেশে সামনে আসার জন্য। মনে মনে জানে ক্ষমা চাইবার নেই কিছু, যে বেশে যে চেহারা নিয়েই এসে থাকুক তাতেই কৃতার্থ হবেন অতিথি। ওফিলিয়া ভেবেছিল একজন সাংবাদিক সাক্ষাৎ করতে এসেছে, কিন্তু যখন শুনল ওকে দেখে ক্রিসতফ মুগ্ধ হ'য়ে আপনা থেকেই দেখা করতে এসেছে, বিরক্ত না হ'য়ে বরং অত্যন্ত খুশি হ'ল। মেয়েটি এমনিতে বেশ ভালো, কাউকে একটু খুশি ক'রতে পেলে নিজেও খুশি

হয়। অত্যন্ত স্নেহ প্রবণ, সরল প্রাণ; নিজের খুশি গোপন ক'রতে একটুও চেষ্টা করে না। এখনও ওর চারদিকে খোসামুদের ভিড় জমে ওঠেনি। কাজেই স্বভাবের সলজ ভাবটুকু এখনও নষ্ট হয়নি। ক্রিসতফ অত আগ্রহ নিয়ে ওর সাথে দেখা করতে এসেছে, তাতে যে কি খুশি হয়েছে ও, তা বলা যায় না। ওর চালচলন কথা বার্তা অত্যন্ত সহজ, কাউকে আনন্দ দিয়ে ও গভীর আনন্দ পায়, সে-আনন্দও কত সহজ। বড় বড় কথা বলা অভ্যেস আছে, কিন্তু সব কিছু এমনি স্বাভাবিক, যে ক্রিসতফ মোটেই বিব্রত বোধ করে না। এমনি সহজ হ'য়ে গেল আবহাওয়া যেন ওরা কত কালের বন্ধু। ক্রিসতফ একটু আধটু ফরাসী ভাষা বলতে পারে, ওফিলিয়াও একটু আধটু জার্মান জানে। ওই ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায়ই দেখা গেল ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দু'জনের সব গোপন কথা বলা হ'য়ে গেছে। ক্রিসতফ চলে যাবে ওফিলিয়া ভাবতে পারে না। এই বিদেশ বিভূঁইয়ে—এখানকার ভাষা অবধি ও জানে না। ওর চারপাশে যারা থাকে, তাদের সঙ্গে ওর মেলে না—দিল খোলা দরদী বুদ্ধিমতী এই দক্ষিণী মেয়েটির প্রাণের সহজ আনন্দটি এই পরিবেশের মধ্যে একেবারে খোয়া যেতে ব'সেছে। কথা কওয়ার লোক পেয়ে বাঁচল। ক্রিসতফের চারপাশের সংসার—আন্তরিকতাহীন, সংকীর্ণ চিত্ত, কুটিল মানুষের সংসার। একেবারে অন্তরে বাইরে এক, অতন্তঃ মুখে যা বলবে, মনের মধ্যে কম থাকবে তো বেশী থাকবে না, এমন সহজ সারল্য ও জার্মান চরিত্রে দেখে নি। সুতরাং এই প্রাণৈশ্বর্যবতী দিল খোলা মেয়েটিকে পেয়ে ও যেন অভাবনীয় একটা কিছু পেল।

এ মেয়ে তরুণী, জীবন্ত; কথা খুব মোলায়েম নয় বটে; কিন্তু যা ভাবে বলে একেবারে আগল খুলে দিয়ে; সব কিছুকে দেখে নূতন সজীব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে; ও যেন কুয়াশা-তাড়ান দখিন

হাওয়া। জন্মেছে ঐশ্বর্য নিয়ে। লেখা পড়া শেখেনি, ভাবতে শেখেনি, কিন্তু ওর হৃদয়ের তারগুলি সরু। ভালো, সুন্দর বস্তুতে ওর আনন্দ, কিছু সামনে এলেই মুগ্ধ হ'য়ে যেন উধাও হ'য়ে যায়। কিন্তু পর মুহূর্তেই খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে। পাকা কোকেট ও মেয়ে, চোখে ওর ছলা কলা। আধ-খোলা গাউনের ফাঁকে বাহু কাঁধ অনাবৃত হ'য়ে আছে, তাতে ওর লজ্জা নেই। ইচ্ছে করলেই ও ক্রিসতফের মাথাটা ঘুরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কিছুই ওর ইচ্ছে করতে হয় না। সবই ওর স্বভাবজ। ওর মধ্যে শিক্ষিত পটুত্ব নেই, স্বার্থ-সিদ্ধির চিন্তা নেই। হাসতে আর প্রাণ খুলে কথা বলতে পারলে ও আর কিছু চায় না। কোনো রকম ভড়ং বা বাড়াবাড়ি না ক'রে সাদাসিধে, সহজ প্রীতিতে ব'সে ব'সে ও থিয়েটারী দুনিয়ার গোপন মহলের খবর দেয়; শোনায় নিজের ছোট বড় দুঃখের কাহিনী; সহযোগীদের মান অভিমান আর ডাইনী বুড়ী [ নাট্য তারকাকে ওর দেওয়া উপাধি ] কেমন ক'রে ওকে শয়তানী ক'রে দাবিয়ে রেখেছে, মাথা তুলতে দেয়নি, সেইসব ইতিহাস। ক্রিসতফের কাছ থেকে শোনে জার্মানদের হাতে ওর নির্যাতনের কাহিনী। ওফিলিয়া হাততালি দিয়ে হাসে। ওর উদার মন কারো নিন্দা চর্চার মধ্যে যেতে চায় না; তাই ব'লে যে মুখ বন্ধ ক'রে থাকে, তাও না। নিন্দে যদি বা করে, সাথে সাথে নিজেকে গালও দেয় স্বভাবের সঙ্কীর্ণতার জন্য। কিন্তু যাই হোক দক্ষিণী মানুষদের স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাটি ওর আছে; এবং তার সাথে আছে রসের জোগান। চোখা চোখা এমনি ব্যঙ্গ করতে পারে যে মানুষের মর্মে গিয়ে বেঁধে। যখন হাসে পাণ্ডুর ওষ্ঠ দুটি ফাঁক হ'য়ে কুকুর ছানার মত ছোট ছোট দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ে। ফ্যাকাশে মুখখানায় গভীর নীল চোখ দুটি থেকে যেন আলো ঝরে।

হঠাৎ দুজনেরই খেয়াল হ'ল, একটি ঘণ্টার ওপর উৎরে গেছে। ক্রিসতফ বলল, বিকেলে এসে ওকে শহর দেখাতে নিয়ে যাবে। ভারী খুশি ও। ঠিক হ'ল সন্ধ্যে বেলা খেয়ে দেয়ে বেরুবে দুজনেই।

ঠিক সময়ে এল ক্রিসতফ। কোরিন (ওফিলিয়ার ষ্টেজ-প্রচলিত নাম) হোটেলের ছোট ঘরটিতে ব'সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একটা বই পড়ছিল। পড়া না থামিয়েই ও হেসে উল্লসিত চোখের দৃষ্টি দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে ইশারা ক'রে পাশে বসতে বলল: 'চুপ ক'রে বসতো লক্ষ্মী, কথা বলো না। আমি পার্টটা মুখস্ত ক'রে নি। আর মিনিট পোনের।' মাষ্টার মশায়ের তাড়া পেছনে নিয়ে খুকুমনি যেমন ক'রে পড়ে, তেমনি ক'রে কাগজটাতে আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে পড়তে লাগল।

ক্রিসতফ বলে: 'আচ্ছা আমি ধরছি, বলো দেখি।' তৎক্ষণাৎ ক্রিসতফের হাতে বইখানি দিয়ে ও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে পার্ট বলতে লাগল। একটা অংশ শেষ হ'লে তার গোড়ার দিকটা চার বার ব'লে তবে ও দ্বিতীয়টা আরম্ভ করে। পার্ট বলতে বলতে মাথা ঝাঁকায়। চুলের কাঁটাগুলি প'ড়ে ঘরময় ছড়িয়ে যায়। কখনও এক আধটা কথা ভুলে গেলে দুষ্টু ছেলের মত অস্থির হ'য়ে ওঠে। নানা রকম মুখ-ভঙ্গিমা ক'রে নিজেকে আর ভগবানকে গাল দেয়। ক্রিসতফ অবাক হ'য়ে যায় গুণী মেয়ের ওই ছেলেমানুষী দেখে। তোতা পাখীর মত মুখস্ত বলে যায় একেবারে অর্থ-নিরপেক্ষ হ'য়ে। শেষ পর্যন্ত সব অর্থহীন কতগুলো শব্দের কচকচি হ'য়ে দাঁড়ায়। তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেই জোরে জোরে হেসে ওঠে। এবং শেষটায় বিরক্ত হ'য়ে বই এক কোণায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে:

'ছুটি, ছুটি। ছুটির ঘণ্টা বাজলো। চলো বেড়িয়ে পড়া যাক।'

ক্রিসতফ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে, ওর পার্ট শেখা হয়নি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে : 'পারবে তো ?'

গভীর বিশ্বাসের সুরে বলে : 'নয় তো কি ? প্রম্পটার কি জন্য আছে তাহলে ?'

ঘরে গেল টুপি আনবার জন্য। এই ফাঁকে ক্রিসতফ বসল এসে পিয়ানোর সামনে। কর্ডের ওপর আঙ্গুল চলতে লাগল। পাশের ঘর থেকে কোরিন বলে : 'আরে এ কি ? থামলে কেন ? বাজাও বাজাও ! ও মা ! কি চমৎকার !'

টুপী পরে বাইরে এসে ও অবাক হয়ে যায়। ক্রিসতফ তন্ময় হ'য়ে বাজিয়ে চলেছে। শেষ হ'য়ে গেলে থামতে দেয় না কোরিন—নানা রকম উল্লাস-সূচক শব্দ ক'রে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে বলে : 'আর একটু বাজাও, আর একটু বাজাও।' ওটা ফরাসী মেয়েদের অভ্যাস, ভালো গান হোক আর চকোলেটের পেয়ালাই হোক, উচ্ছ্বাস ওদের সমানই হয়। জার্মানরাও অনেকটা এ রকম। ওদেরও কথায় কথায় উচ্ছ্বাস। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক-দেখান। কোরিনের রকম-সকম দেখে হেসে ওঠে ক্রিসতফ। বড়ো ভালো লাগছে ওর প্রিয় মুখের কথা। কোরিন জিজ্ঞাসা করে, ওটা কি সুর ? ওঃ ক্রিসতফের নিজের তৈরী! আনন্দে ও রীতিমত চীৎকার ক'রে উঠল। ক্রিসতফ সকাল বেলায়ই তো বলেছিল ও সুরকার। কিন্তু কিছুই কানে তোলেনি ও মেয়ে। এখন পাশে ব'সে পড়ে জেদ ধরলে যত সুর তৈরী করেছে ক্রিসতফ সব ওকে বাজিয়ে শোনাতে হবে। বেড়াতে যাবার কথা পড়ে রইল; এ শুধু ভদ্রতার খাতিরে দেখান আগ্রহ নয়; সঙ্গীত ও যেমন ভালোবাসে, তেমনি এ বিদ্যায় ওর সহজাত অধিকার ; ওর সঙ্গীত কুশলতাই ওর পুঁথিগত বিদ্যার অভাব আংশিক পূরণ করেছে। প্রথম

ক্রিসতফ অতটা বোঝেনি। বেছে বেছে সহজ গৎগুলি বাজাতে লাগল ও। কিন্তু একটা উচ্চাঙ্গের সুর বাজাবার পর দেখা গেল, এটাই কোরিনের বেশী ভালো লেগেছে। ভারী অবাক হ'ল ক্রিসতফ। ফরাসীদের ভালো গাইতে দেখলেই জার্মানরা অবাক হয়। তাই ও বলে বসল: 'আশ্চর্য! এত ভালো গাও তুমি! আমি ভাবতেই পারিনি!'

কোরিন ওর মুখের ওপর হেসে ওঠে।

ওর বিদ্যের দৌড় কতখানি দেখবার জন্য ক্রিসতফ বেছে বেছে শক্ত শক্ত গৎ বাজায় দুষ্টুমী ক'রে। কোনোমতেই ওকে জব্দ করা যায় না। আর একটা বাজাল সেটার সম্বন্ধে ওর নিজেরই সন্দেহ ছিল, কারণ, জার্মানী এখনও ওটা গ্রহণ করেনি। কিন্তু একবার বাজান শেষ হওয়া মাত্র কোরিন বলে বসল: 'আবার' এবং উঠে দাঁড়িয়ে একেবারে নির্ভুল ভাবে সুরটা গাইতে লাগল। ক্রিসতফ অবাক হ'য়ে ফিরে ওর হাত দু'খানা ধরে আবেগে চিৎকার ক'রে উঠল: 'তুমি যে মস্ত বড় শিল্পী, কোরিন।'

হেসে ফেলল কোরিন। ও এতদিন ছোট ছোট শহরের অপেরা হাউসেই গেয়েছে। সম্প্রতি এই ভ্রাম্যমান দলে চাকুরী পেয়েছে। ওর মধ্যে নাট্য-কাব্যের বিশেষ যোগ্যতা দেখেই দলের মালিক চাকুরীটি ওকে দিয়েছেন।

'হায়রে কপাল!'

'কেন কবিতাও তো এক ধরণের সঙ্গীতই।'

ক্রিসতফের লেখা লাইডারটির অর্থ বুঝে নিয়ে তবে ছাড়লে। ক্রিসতফ ওকে জার্মান শব্দগুলি ধরে ধরে উচ্চারণ ক'রে শেখায়। ও প্রাণপণে চেষ্টা করে ঠিক ক্রিসতফ-এর মত ক'রে উচ্চারণ করতে; ওর ঠোঁট মুখের ভঙ্গি সুদ্ধ নকল করে। যখন নিজে গায় তখনই মুস্কিল।

মাঝে মাঝে ভুলে যায়, আর যা খুশি, খাপ খাক আর না খাক, বানিয়ে-টানিয়ে বসিয়ে দেয়। ওর নাকী সুরের গাল ফুলিয়ে মোটা উচ্চারণে হেসে ওঠে ক্রিসতফ। কোরিন কেবলি বলে: 'বাজাও, বাজাও।' শুনতে ক্লান্তি নেই কোরিনের, আর প্রিয় সখীর জন্য বাজিয়ে ও তার মিঠে কণ্ঠটি শুনে শুনে ক্লান্তি নেই ক্রিসতফের। পেশাদারী সঙ্গীত-শিল্পীদের কৌশলটুকু এখনও ওর আয়ত্ব হ'য়ে ওঠেনি; তাই ওর স্বরটা এখনও ছোট ছেলেদের মত গলার ভেতর থেকে ওঠে। এমনি তা লঘু, মনে হয় বুঝি হাওয়ার ছোঁয়ায়ই ভেঙ্গে যাবে। মানুষের হৃদয়কে যে কি অমৃত দিয়ে ছুঁয়ে যায় তা ভাষায় বলা যায় না। মনের কথা খুলে বলে। গান ওর কোনটা কেনই বা ভালো লাগে, আর যেটা ভালো লাগে না, কেনই বা ভালো লাগে না, কারণ ও বুঝিয়ে বলতে পারে না। না পারলেও, এ যে শুধু ওর খাম-খেয়াল নয়, ওর পছন্দ অপছন্দের পেছনে যুক্তি-সহ কারণ আছে তা বেশ বোঝা যায়। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, জার্মানীর জনপ্রিয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতগুলো ওর একটুও ভালো লাগে না। ক্রিসতফকে মাঝে মাঝে ও প্রশংসা করে বটে ওর ক্লাসিক্যাল গানের জন্য; কিন্তু সে-শুধু ভদ্রতার খাতিরে, প্রাণ থেকে নয়।

ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত বহুবার শোনা হলেও পেশাদারী, অপেশাদারী সব সঙ্গীত-শিল্পীই চিরকাল আনন্দ পেয়ে থাকেন। এবং সেই আনন্দে তা এমনি আপনার হ'য়ে ওঠে যে, অজ্ঞাতসারেই নিজেদের মৌলিক সুর-রচনার মধ্যেও তাএকান্তভাবে ধরা দেয়। সঙ্গীত-বিষয়ে সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ না থাকার দরুণ ওই আনন্দটুকু পায় না কোরিন। এবং এদের পুরানো রচনার রূপ ও রীতি যেমন ওর বিশেষ ভালো লাগে না, একই কারণে নূতন আধুনিক রচনাও ওকে তেমন আনন্দ দিতে পারে না। জার্মানদের মত শুধু ভাবপ্রবণ গানে ও কোনই স্বাদ পায় না [ ও নিজে অবশ্য অত্যন্ত

ভাবপ্রবণ। কিন্তু তার চেহারা একেবারে আলাদা। ওর ত্রুটিগুলো ক্রিসতফের কাছে এখনও ধরা পড়েনি। ] সুতরাং এখানকার সাথে ওর রুচি মেলে না। পানসে সুরের পল্‌কা হাওয়ার মত ফুরফুরে গান শুনে ও আহ্লাদে আটখানা হয় না। সেই জন্যই ক্রিসতফের সবচেয়ে কোমল সুরের লাইডারটির প্রশংসায় সে নিজে পঞ্চমুখ হয়েছে এবং ওর বন্ধুরা প্রশংসায় শুধু পঞ্চমুখ হয়নি, চব্বিশ ঘণ্টা কি যে মাতামাতি করেছে তার ঠিক নেই। বন্ধুদের বাড়াবাড়িতে ক্রিসতফের ইচ্ছে হয়েছে, টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দেয় সব। অথচ কোরিনের ভালো লাগেনি তা। নাট্যে কোরিনের অন্তরের একটা সহজ আবেদন থাকায়, সুরের মারপ্যাঁচের চাইতে ওর ভাব-প্রধান রাগ-রাগিনীই বেশী ভালো লাগে। ক্রিসতফের এখানে ওর সঙ্গে রুচির মিল আছে। তবু বিরোধ বাধে কোথাও কোথাও। ক্রিসতফের হয়ত বিসদৃশ ঠেকেনি, কিন্তু বাজাতে বাজাতে ওর কানে হঠাৎ বাজল খট ক'রে। মুখটা বিকৃত হ'য়ে গেল, যেন বড় অতর্কিত আঘাত লাগল, থেমে গেল মাঝপথে ; জিজ্ঞাসা ক'রে বসল : 'নিশ্চয় ভুল আছে কোথাও। সুরটা কি সত্যি এমনি ?' ক্রিসতফ জবাব দেয় : 'হ্যাঁ।' নিরুপায়। কিন্তু মুখটা তবু বেঁকে ওঠে। ক্রিসতফের চোখ এড়ায় না। কোরিনের ইচ্ছে হয়, একটু ভুল ক'রে ফেলে ; তাহ'লে ক্রিসতফ নিজে হয়ত অন্য রকম ক'রে বাজিয়ে দেখিয়ে দেবে। ক্রিসতফ বুঝতে পারে, বলে : 'তোমার বুঝি এটা ভালো লাগছে না ?'

নাক সিঁটকিয়ে জবাব দেয় ও : 'ভালো লাগবে কোত্থেকে। একদম ভুল সব।'

হেসে প্রতিবাদ করে ক্রিসতফ : 'মোটেই না। একটুও ভুল নেই। অর্থটা তো দেখ! কেমন ছন্দ দেখেছ ?'

কিন্তু কোরিন মাথা নাড়ে; নিজের কানটায় মোচড় দিয়ে বলে: 'তা হয়ত হবে। ভুলটা তা হ'লে এখানেই।'

জোর গলায় প্রতিবাদ করে ক্রিসতফ। চমকে ওঠে কোরিন। বলে: 'এত জোরে কথা বলো কেন? সাথে আর তো কেউ নেই। একাই তো রয়েছ। তবে? পাড়ার লোকে শুনবে না? ভয় নেই? মনে হচ্ছে যেন—[ থাক বাবা থাক, রাগ টাগ করবে না তো? ],— মনে হচ্ছে কি জান? দূর থেকে নৌকার মাঝি ডাকছে।'

রাগ করেনি ক্রিসতফ। হোঃ হোঃ ক'রে খুব খানিকটা হাসে। কোরিনের কথায় ভারী মজা লাগছে ওর। অমন কথা ওকে কেউ বলেনি আর। ও মেনে নিলে, চেঁচিয়ে রাগারাগি ক'রলে গানের উচ্চারণ খারাপ হ'য়ে যায়, আতস কাঁচের ভেতর দিয়ে জিনিসের আসল চেহারাটার যেমন বিকৃতি ঘটে। কোরিন ওকে একটা কাব্য-নাটকে সুর দিয়ে দিতে বলল: মধ্যে অর্কেষ্ট্রা বাজবে, তারই সুরে সুরে চলবে কথা, আর মাঝে মাঝে গান। ক্রিসতফ উৎসাহে একেবারে লাফিয়ে উঠল, যদিও মঞ্চ প্রযোজনায় অসুবিধা রয়েছে বহু। কিন্তু যা গলা ও মেয়ের, সব ওতেই ঢেকে যাবে অন্যদিকে যত অসুবিধাই থাক। দুজনে মিলে পরিকল্পনা ছকতে ব'সে যায়। পাঁচটা আন্দাজ বেরুবার কথা মনে প'ড়ল। বড় তাড়াতাড়ি অন্ধকার হ'য়ে যায়। বেড়াতে যাওয়ার সময় নেই আর। সন্ধ্যের সময় কোরিনের রিহার্সেল রয়েছে। বাইরের লোকের প্রবেশ একেবারে নিষেধ। অতএব বিদায় নিতে হয় ক্রিসতফকে। কিন্তু যাবার আগে কথা দিতে হ'ল, আজের বেড়ানোটা মুলতুবী রইল, কাল ও আসবে, যাওয়া চাই।

পরের দিনও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। ক্রিসতফ যখন এল, কোরিন আয়নার সামনে একটা উঁচু টুলে ব'সে পা দুলিয়ে দুলিয়ে একটা

পরচুলা মাথায় প'রে পরখ করছে। পাশে দাঁড়িয়ে ড্রেসার ও কেশ-রচক। খুব বোঝাচ্ছে তাকে ও, ঐ চুলের গোছা আর একটু ওপরে···আয়নার দিকে তাকিয়েই দেখতে পেল ক্রিসতফ পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। ও জিভ ভেংচে দিল। কেশ-রচক পরচুলাটা হাতে নিয়ে সরে দাঁড়াল। খুব উল্লসিত হ'য়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল কোরিন; সম্ভাষণ জানিয়ে গালটা বাড়িয়ে দিল চুম্বনের জন্য। এতখানির জন্য প্রস্তুত ছিল না ক্রিসতফ, কিন্তু সুযোগ ছেড়েও দিল না। কোরিনের কাছে এ কিছুই নয়, সাধারণ সম্ভাষণ মাত্র। বলল:

'ভারী ভালো লাগছে আমার, আজ খুব ভালো হবে এটায়, জানো! [পরচুলাটার কথা বলছে ও] আমার এত বিশ্রী লাগছিল, আজ সকালে এলে দেখতে পেতে।'

ক্রিসতফ কারণ জিজ্ঞাসা করে।

কারণটা হল—পারীর কেশ-রচক ভুল ক'রে যে পরচুলাটা দিয়েছিল সেটা ওর বর্তমান ভূমিকায় একটুও মানাত না: 'একদম চ্যাপ্টা, বুঝলে! খ্যাংরা কাঠির মত খাড়া হ'য়ে সোজা নেমে গেছে নীচের দিকে চুলগুলো। ওটাকে দেখেই তো, মাগো, আমি কেঁদে মরি আর কি! খারাপ লাগেনা, বল তো?' কেশ-রচককে সাক্ষী মানে।

'ভেতরে ঢুকে তো আমি হতভম্ব। কি হ'ল ভেবে পাইনে! ফ্যাকাশে মরা মানুষের মত চেহারা। ভয়েই মরি, কি হবে ভেবে অস্থির।' কেশ-রচক বলে।

ক্রিসতফ হাসে। আয়নায় ওর ছবি দেখতে পায় কোরিন। রেগে ওঠে: 'পাষণ্ড, হাসছ?' নিজেও হেসে ওঠে।

'কেমন হ'ল রিহার্স্যাল?' ক্রিসতফ জিজ্ঞাসা করে।

তা হল মন্দ নয়।' ওরটা না কেটে অন্যদের পার্টগুলি আরো

ক'সে ছেঁটে দিত তাহ'লে বেশ হ'ত। কথায় কথায় সুন্দর বিকেলটা মাঠে মারা গেল সম্পূর্ণ। অতি ধীরে ধীরে ও পোষাক পরে। ক্রিসতফকে জিজ্ঞাসা করে কেমন লাগছে ওকে দেখতে আর খিল খিল ক'রে হাসে। জার্মান-ফরাসী ভাষায় মেশান খিচুড়ীতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ক্রিসতফ। চমৎকার মানিয়েছে। চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এমন ঝলমলে চেহারা নাকি ও আর কখনও দেখে নাই। খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে গড়িয়ে পড়ল কোরিন। অবাক হ'য়ে ক্রিসতফ জিজ্ঞাসা করে: 'কি বললাম, অমন হাসছ যে? কিছু অন্যায় বলেছি নাকি?'

হেসে লুটোপুটি হ'তে হ'তে জবাব দেয় কোরিন: 'নয়তো কি! বলেইছ তো।'

বেরিয়ে পড়ে ওরা। কোরিনের অদ্ভুত বেশ আর অনর্গল কথায় পথের লোক ফিরে ফিরে চায়। সব কিছুর দিকে তাকায়, সব কিছু দেখে কোরিন। ওর চোখে বিদ্রূপ গোপন করার বিন্দু মাত্র চেষ্টা নেই। দরজির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ও মুখ বাঁকা ক'রে হাসে। ছবির পোষ্টকার্ডের দোকানের সামনে এসে থমকে যায়। কি নেই এসব দোকানে—যত সস্তা প্রেমের দৃশ্য, অশ্লীল চিত্র, শহরের বারবনিতাদের ছবি; রাজ-পরিবারের ছবি; সব এক সাথে খিচুড়ী হ'য়ে আছে। হ্বাগনারের ছবি-ওয়ালা একটা ডিনার-সেট; ছবিটা এমনি কিম্ভূত-কিমাকার যে চেনাই যায় না। একটা চুল-ছাঁটাইয়ের দোকানের জানালায় মোমের একটি নরমুণ্ড। দেখে হেসে কুটিপাটি হয় কোরিন। জার্মানীর জাতীয় স্মৃতি-স্তম্ভ—প্রুশিয়া ও জার্মান রাজ্যগুলির মাঝখানে প্রাচীন জার্মান সম্রাটের ভ্রমণের বেশপরা প্রতিমূর্তি; পাশে সংগ্রাম-প্রতিভার একটি নগ্ন প্রতীক মূর্তি। ঠিক তেমনি হেসে লুটিয়ে পড়ে ও এসব দেখে। লোকের

চালচলনে একটু এদিক ওদিক দেখলেই স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সোজাসুজি মুখের ওপর ব'লে বসে। কোনো কিছু না ভেবেই, স্বভাব-ব্যঙ্গ-প্রবণতায় ও তাদের চোখ-মুখের ভঙ্গি, ভ্রূ-কুঞ্চন, ঠিক ওদের মত ক'রে গাল ফুলিয়ে ওদের কথা বলার ভঙ্গি, উচ্চারণের ধরন মুখ ভেংচে ভেংচে নকল করে। ক্রিসতফও সাথে সাথে হোঃ হোঃ ক'রে হাসে। কোরিনের এই অসামাজিক ব্যবহারে বিন্দুমাত্র বিব্রত হয় না ও। সহজে বিব্রত হবার দুর্বলতা আর ওর নেই। তবে সৌভাগ্যক্রমে সুনামের সঞ্চয় খুব বেশী নেই ওর। থাকলে তরুণী বন্ধুকে নিয়ে এরকম অশোভন ভাবে প্রকাশ্য রাজ-পথে বেড়ানোর পরে আর তার এক কণাও বাকী থাকত না।

ক্যাথাড্রেল দেখতে গেল দু'জনে। ওপরে চুড়োয় উঠবেই কোরিন। উঁচু গোড়ালীর জুতো; মাটিতে লোটান পোষাক সিঁড়িগুলিকে ঝাঁট দিয়ে চলে। কখনও বা সিঁড়ির কোনায় আটকে থাকছে—কিন্তু দমবার পাত্র নয় ও মেয়ে। হেঁচড়ে ঠান মেরে পোষাকটাকে তুলে নেয়; ফর্‌ফর্‌ ক'রে ছিঁড়ে খানিকটা হয়ত সিঁড়ির কোণায় আটকেই থাকল; ভ্রূক্ষেপ নেই, তর্‌তর্‌ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে গেল; ছুটে গেল, ঘণ্টা বাজাবে। ওপরে দাঁড়িয়ে ভিকটর য়্যুগোকে চেঁচিয়ে গাল দিল [ শুনতে পাননি তিনি ], একটা চলতি ফরাসী গান গাইল গলা ফাটিয়ে। তারপর মুয়েজ্জিন হ'য়ে হাঁক পাড়ল। সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। নীচে নেমে এল ওরা। গির্জার বিশাল প্রাচীরের গায়ে গায়ে অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠছে। অন্ধকারের পটে আলো-জ্বলা জানালাগুলি মনে হয় যেন কোন মায়াবীর মায়া চাহনি। হঠাৎ চোখ পড়ে ভেতরে। অবাক হ'য়ে ক্রিসতফ দেখে বেদীর সামনে নতজানু হ'য়ে, যে অচেনা সঙ্গিনীকে নিয়ে ও হ্যামলেট নাটক দেখেছিল, সেই মেয়ে। কি এক হৃদয়-নিংড়ান নিবিড় প্রার্থনায়

ধ্যানমগ্ন হ'য়ে আছে; ক্রিসতফকে দেখতে পায়নি। মেয়েটির মুখে এমনি এক গভীর বেদনার ছায়া। বড় তীব্র মানস-বিপ্লবকে চাপা দেবার কঠিন প্রয়াস এমনি সকরুণ হ'য়ে উঠেছে মুখের রেখায় রেখায়—যে স্তব্ধ হ'য়ে গেল ক্রিসতফ, ওর ভারী ইচ্ছে হ'ল একটু সম্ভাষণ ক'রে যায়, কিন্তু কোরিন ঘূর্ণী বাতাসের মত ওকে যেন উড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল।

জার্মানীতে অভিনয় আরম্ভ হয় একটু শিগ্‌গির। কোরিনকে এবার গিয়ে তৈরী হ'তে হবে। ও চলে গেল। কিন্তু ক্রিসতফ বাড়ী এসে পা দিতে না দিতেই দরজায় ঘা পড়ে। কোরিনের চিঠি:

'ডাইনী বুড়ীর অসুখ। অভিনয় হবে না আজ। চ'লে এসো এক সঙ্গে খাবো। ভারী মজা।'

বন্ধু কোরিন

পুঃ: অনেক বাজিয়ে শোনাতে হবে কিন্তু।

প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। তারপরে কোরিনের মতই আনন্দে ও নেচে উঠল। এক মুহূর্ত দেরী না ক'রে চলে গেল হোটেলে। ভয় হয়েছিল ডিনারে বুঝি দলসুদ্ধ সবাই থাকবে। কিন্তু একটি প্রাণীও না; এমন কি কোরিনও নেই। কিছুক্ষণ পরে ঘরের পেছন থেকে একটা হাসির শব্দ এল। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল ওকে রান্না-ঘরে। এমনি সে মাথায় ঢুকেছে সবাই দক্ষিণী খানা রাঁধবে নিজের হাতে। এমনি সে রান্না, পাড়া মাৎ হবে খোশবুতে আর পাথরের শুদ্ধ জিভের জল প'ড়বে, হোটেল কর্ত্রীর সাথে ওর প্রচুর খাতির। রান্নাঘরে তখন ফরাসী, জার্মান, নিগ্রো ভাষায় মিলে অবোধ্য একটা কলরবের তুমুল ঝড় উঠেছে যা বর্ণনা করার মত ক্ষমতা কোনো ভাষার নেই। সবাই হাসছে, এ ওকে তার রান্না চাখাচ্ছে। ক্রিসতফকে দেখে কোলাহল

সপ্তম ছেড়ে নবমে উঠল। ওরা ওকে ঢুকতে দেবে না। ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলির পর কোনমতে জোর ক'রে ঢুকে বিখ্যাত খাদ্যটির খানিকটা কেড়ে কুড়ে ও মুখে ফেলে দেয়। মুহূর্তে মুখটা বিকৃত হ'য়ে ওঠে। কোরিন বলে : 'বর্বর !'

ছোট্ট বসবার ঘরটিতে খাবার জায়গা হয়েছে। মাত্র ওদের দু'জনের জায়গা। 'তোমার আর সব সাঙ্গোপাঙ্গোরা গেল কোথায় ?' ক্রিসতফ জিজ্ঞাসা করে। অবহেলার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে জবাব দেয় কোরিন : 'জানিনে বাপু। গেছে চুলোয়।'

'তোমরা এক সাথে খাও না ?'

'উহুঁ, কক্‌খনও না। বাপ্‌স, দঙ্গল বেঁধে তো থিয়েটর করি! আবার খাওয়ার সময়ও ? রক্ষে কর।'

ক্রিসতফ অবাক হ'য়ে গেল। বড় ভালো লাগল। জার্মানীর রীতি আলাদা।

'আমি ভেবেছিলাম তোমরা খুব মিশুক জাত।' ক্রিসতফ বলল।

'নই কে বললে ?'

'মিশুক মানেই সমাজে বাস ক'রে সকলের সাথে মিলে মিশে থাকা। স্ত্রী-পুরুষ, বাল-বৃদ্ধ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব সমাজের অংশ। যেখানেই থাকি, সমাজ-বদ্ধ হ'য়েই থাকতে হবে আমাদের। খাওয়া বল, নাচ গান, চিন্তা ভাবনা সবই আমাদের সমাজের মধ্যে করতে হয়। সমাজ যদি হাঁচি দেয়, আমাদেরও হাঁচি দিতে হয়। এমন কি এক গ্লাস সরবৎও খেতে পারি না সমাজকে বাদ দিয়ে।'

'ভারী মজা তো। তাহ'লে এক কাজ কর, একটা গ্লাস নাও, আর তোমার গোটা সমাজটা মিলে এক সাথে চুমুক মার ওটা থেকে। আর আলাদা কেন ?'

'কেন? আচ্ছা তুমিই বল, মিলে মিশে থাকলে, সকলের মধ্যে ভালোবাসা থাকে না?'

'হ্যাঁ তা হয় বটে। কিন্তু যাদের আমার ভালো লাগে তাদেরই তো আপনার মনে করব! সব্বাইকে তো আর পারিনে! ছিঃ! ওই তোমাদের সমাজ! সমাজ তো নয় উঁই ঢিবি।'

'না না। তুমি যা বলছ আমিও ঠিক ঐ কথাই বলি। আমার সাথে কি সুন্দর মিলে যাচ্ছে তোমার।'

'বেশ তো তাহ'লে চ'লে এসো আমাদের কাছে।'

পারী আর ফরাসীদের সম্বন্ধে হাজার প্রশ্ন করে ক্রিসতফ। কোরিন বাড়িয়ে বাড়িয়ে অনেক কিছু বলে। ক্রিসতফের সামনে নিজেকে খুব বড় ক'রে দেখাবার লোভ সামলাতে পারে না ও। দক্ষিণী গুমরও আছে। গুমর ক'রে বলে পারীর সবাই স্বাধীন। এবং প্রত্যেকটি মানুষ বুদ্ধিমান, তাই স্বাধীনতার অপব্যবহার কেউ করে না। বরঞ্চ তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। তোমার কাজ, চিন্তা, ভালোবাসা না বাসা, বিশ্বাস অবিশ্বাস, সব বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত, কারো কিছু বলার নেই। ও দেশে নাকি কেউ কারো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না, অন্যের মুখে লাগাম দিয়ে চালাবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে না। রাজনীতিকরা রাজনীতিই করে, সাহিত্য-শিল্প নিয়ে অনধিকার চর্চা করে না। বন্ধু বান্ধব মক্কেলদের কাজ দিয়ে বা ঘুষ দিয়ে হাতের মুঠায় রাখবার ফিকিরে থাকে না। ওখানে সাংবাদিকরা এমন ক'রে কড়িতে বিকোয় না; মানুষের ওঠা-পড়ার চাবি কাঠি দল উপদলের পকেটে থাকে না। পণ্ডিতেরা নাকি কখনও যাজকদের সাথে অনর্থক বিবাদ করে না। সমালোচকরা ওখানে যার মধ্যেই প্রতিভা আছে, তাকেই উঠতে সর্বপ্রকারে

সাহায্য করে। মিছিমিছি বিরুদ্ধ সমালোচনা করে না। কৃতিত্ব নিয়ে কথা। কৃতীর সমাদর সর্বত্র। সর্বত্র কি ভদ্র মধুর ব্যবহার—নিন্দে চর্চা, রাগ ঝগড়া, স্রেফ নেই। সবাই সর্বদা তোমাকে সাহায্য ক'রতে প্রস্তুত। হও না তুমি নূতন মানুষ, যদি যোগ্যতা থাকে—দেখবে সহস্র সুহৃদের হাত তোমার দিকে প্রসারিত হ'য়ে আছে। তোমার বন্ধুর পথ সহজ হ'য়ে যাবে তাদের স্নেহে। ফরাসীদের বীরের হৃদয়—আকাশের মত তার উদার দাক্ষিণ্য ; সুন্দরের একনিষ্ঠ পূজায় তা শুভ্র। ওরা যে রসিক জাত, তা বিশ্ব-বিদিত। কিন্তু আদর্শ ব্যাপারে সত্যি বড় বাড়াবাড়ি করে ওরা। প্রায় ক্ষ্যাপামীর সামিল। এই ক্ষ্যাপামীর জন্যই দুনিয়ার অন্যান্য জাতির হাতের পুতুল হ'য়ে থাকে ফরাসী জাতি।

ক্রিসতফ অবাক হ'য়ে শোনে। ভারী অদ্ভুত লাগে ওর। এই কালই না ব'সে ব'সে ও কোরিনকে ওর গত জীবনের যত দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছে! এরই মধ্যে দু'জনেই ভুলে গেল সব! কি ক'রে ভুলল!

জার্মানদের সামনে নিজের দেশকে বড় ক'রবার জন্যই যে পরিশ্রম ক'রে এত কথাগুলি ব'লল তা নয়। ওর নিজেরই প্রয়োজন। জার্মানীতে এসেছে, জার্মানদের ভালোবাসা ওকে অর্জন ক'রতেই হবে। ফ্লার্ট-হীন সন্ধ্যা ওর কাছে একেবারে অর্থহীন। তাই তো কটাক্ষ দিয়ে ও বিঁধতে চায় ক্রিসতফকে। কিন্তু অত মিহির কারবারী ও ছেলে নয়। ফ্লার্ট-এর খবর রাখে না সে। হয় ভালোবাসবে, নয় তো একেবারে ঘৃণা ক'রবে। মাঝপথ নেই ওর। ভালো যখন বাসে না তো বাসেই না। মনের ত্রিসীমানায় তার চিহ্নও থাকে না। কোরিনকে ওর খুব ভালো লেগেছে। দক্ষিণী মানুষের সাথে পরিচয় ওর এই প্রথম। তার ওপর

এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, মধু; তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের আলোর ঝলকের মত ওর বুদ্ধি; খুশিতে ও সর্বক্ষণ টলোমলো করে। মুখে চোখে রং লাগাবার মত উপকরণ কোরিনের ভাণ্ডারে উপ্‌চে পড়ছে। কিন্তু তবু ক্রিসতফের মনে রং লাগল না। প্রেমে ও দেউলে; প্রেম নিয়ে শুধু খেলা ওর ভালো লাগে না।

ওর এই নিস্পৃহ ঔদাস্যে কোরিনের ভারী মজা লাগে। ক্রিসতফ বাজায়, ও পাশে ব'সে গলা জড়িয়ে ধরে। পিয়ানোর ওপর ঝুঁকে বসে ওর গালে গাল লাগিয়ে। ওর চুলের ছোঁয়া লাগে ক্রিসতফের গালে, মুখের পাশ ঘেঁষে দেখা যায় এক-জোড়া ব্যঙ্গ-ভরা চোখের অপাঙ্গ দৃষ্টি, ছোট্ট একজোড়া ঠোঁটের আভাস আর ডগা-ওল্টান নাকের ছায়া রেখা। মৃদু হাসি-দোলা মুখে কিসের প্রতীক্ষা—কিসের আমন্ত্রণ! কোরিন ওই ভাবে ব'সে থাকাতে ওর অসুবিধা হয় বাজাতে। ওই যা, আর কিছু বোঝে না বোকা ছেলে। আনমনে কখন ওর হাত ছাড়িয়ে চেয়ার সরিয়ে দেয়। পর-মুহূর্তে কি যেন বলবার জন্য ওদিকে ফিরতেই দেখে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফুলে ফুলে উঠছে কোরিন। গালে টোল প'ড়েছে, চাপা ঠোঁটের ওপারে কি এক চাপা কৌতুক দুলছে।

অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে: 'কি হ'ল গো?'

চোখে চোখ পড়তেই উচ্চ রোলে হেসে ওঠে কোরিন। তবু ছাই ক্রিসতফ বোঝে না।

'হাসছ কেন বল না? খুব হাসির কিছু বলেছি বুঝি?'

ক্রিসতফ যতই জিজ্ঞাসা করে, ততই হেসে গড়িয়ে পড়ে ও। যদি বা একটু সামলে নেয়, ওর ফ্যাল ফ্যাল-ক'রে তাকিয়ে থাকা বোকা বোকা মুখের দিকে তাকিয়ে আবার হেসে লোটায়। সামলাতে না পেরে উঠে ছুটে পালিয়ে যায় ঘরের শেষ প্রান্তে, সোফার ওপর উপুড়

হয়ে প'ড়ে কুশানে মুখ গুঁজে প্রাণ ভ'রে হাসতে থাকে। সমস্ত দেহটা হাসিতে তোলপাড় হয়। ক্রিসতফ হাসতে হাসতে কাছে এসে ওর পিঠ চাপড়ায় আস্তে আস্তে। হাসি ফুরিয়ে গেলে মাথা তোলে কোরিন; চোখের জল মুছে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে:

'কি লক্ষ্মী ছেলেটি গো!'

'তা আর এক জনের চাইতে লক্ষ্মী তো বটেই।'

কোরিন তখনও থেকে থেকে হাসিতে ফুলে উঠছে। ওর হাতের মধ্যে ক্রিসতফের হাত। জিজ্ঞাসা করে কোরিন: 'ফরাসী মেয়েরা ভারী খেলো। না?'

'আমায় বাঁদর নাচাচ্ছ?' হাসতে হাসতে ক্রিসতফ জবাব দেয়

ভরা কোমল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে জোরে ওর হাতটা ঝাঁকুনি দেয় কোরিন:

'সন্ধি!'

'সন্ধি।' ওর হাতে ঝাঁকানি দিয়ে ক্রিসতফ বলে।

'কোরিন চ'লে গেলে তাকে মনে থাকবে? ফরাসী মেয়েরা গম্ভীর হ'তে জানে না ব'লে তাদের ওপর রাগ থাকবে না তো?'

'আর এই জঙ্গলী গাধাটার ওপর কোরিনেৎ রাগ ক'রে থাকবে না তো?'

'না গো না, জঙ্গলী ব'লেই তো এত ভালবাসি গো! সেই জন্যই··· কখনও যদি ফ্রান্সে আসো কোরিনেৎ-এর সাথে দেখা করবে তো?'

'আচ্ছা, এই, সত্যি সত্যি সত্যি, তিন সত্যি। হ'ল তো?··· কিন্তু আর এক জন এক আধখানা পত্র টত্র লিখবেন তো?···'

'নিশ্চয়। প্রতিজ্ঞা। তুমিও বল...প্রতিজ্ঞা।'

'প্রতিজ্ঞা।'

'না, ওভাবে নয়। হাত তোল ওপরে।' কোরিন শাস্ত্রের বয়ান আওড়ায়, ক্রিসতফ প্রতিজ্ঞা করে—একটা নাটক লিখে দেবে, সেটা ও পারীতে নিয়ে গিয়ে অনুবাদ করাবে ফরাসী ভাষায়। পরের দিন ফ্র্যাঙ্কফার্ট-এ একটা অনুষ্ঠান আছে। তার পরেই চ'লে যাচ্ছে ওদের দল। ক্রিসতফ কথা দিল ওখানে গিয়ে দেখা ক'রবে। খানিক পরে ভাই বোনের মত চুম্বন ক'রে বিদায় নেয় ওরা। কোরিন বোঝে ক্রিসতফের ওকে ভালো লাগে। শুধু ভালোলাগা, ভালোবাসা নয়। প্রীতি, স্নেহ। সুতরাং ও আপনাকে সংযত ক'রে নিলে। ক্রিসতফ ওর সুহৃদ, ঐ সম্বন্ধই আজ সহজ প্রীতিতে অভিষিক্ত ক'রে স্বীকার ক'রে নিলে কোরিন।

রাতে কারো ঘুমের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হ'ল না আসন্ন বিদায়ের বেদনায়। একটা রিহার্সেল ছিল; ক্রিসতফ পরের দিন কোরিনের যাবার সময় উপস্থিত থাকতে পারল না। কিন্তু কথামত তার পরের দিন ফ্র্যাঙ্কফার্ট-এ এল দেখা করতে। ট্রেনে কয়েক ঘণ্টার রাস্তা মাত্র। ও সত্যি সত্যি আসবে ব'লে বিশ্বাসই ক'রতে পারেনি কোরিন। কিন্তু ক্রিসতফ পূর্ণ গুরুত্ব দিয়েই প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল। অভিনয় আরম্ভ হবার আগেই ও পৌঁছে গেল। বিরতির সময় ক্রিসতফ গিয়ে ওর সজ্জা-কক্ষের দরজায় ঘা দেয়। বেরিয়ে ওকে দেখেই স্বভাব-সিদ্ধ উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে ওঠে কোরিন। উল্লাসে চিৎকার ক'রে ছুটে গিয়ে একেবারে জড়িয়ে ধরে ওকে। চোখে মুখে ওর কৃতজ্ঞতা উছলে প'ড়ছে। এদিকে সহরের ধনী, মার্জিত-বুদ্ধি ইহুদী মহল প্রতীক্ষায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। ক্রিসতফের চাইতে কোরিনের উপর দাবী তাদের বেশী। কোরিনের রূপ ও ভাবী সাফল্যের সমঝদার এরাই। প্রতি মিনিটে দরজায় প'ড়ছে ঘা—দরজা খুললেই দেখা যায় কতগুলি ভারী মুখ আর চটুল চোখের ভিড় এবং

কায়দা মাফিক ভারী গলার সম্ভাষণ। কোরিন ওদের দিকে বক্র দৃষ্টি হেনে, ক্রিসতফের সাথে কথায় মাতে; ওকে খেপিয়ে নাচিয়ে অস্থির ক'রে তোলে। লজ্জা করবার যে আছে কিছু তা ওর মনেই হয় না। ওর সামনেই পোষাক পরে; ক্রীম, রং ইত্যাদি দিয়ে গলা হাত মুখ খুব ক'রে ঘষে ঘষে পালিশ করে। ক্রিসতফের গা ঘিন্ ঘিন্ করে দেখে।

অভিনয়ান্তে ওর সাথে দেখা না করেই চলে যেতে চায়, কিন্তু পারলে না। ফিরে এল বিদায় নিতে। তাহ'লে কি অভিনয়ের পরে কোরিনকে যে পার্টি দেওয়া হবে, সেই পার্টিতে থাকতে পারবে না ক্রিসতফ? তীব্র আঘাত পেল কোরিন। ওর স্নেহ-সিক্ত করুণ মিনতি আর ঠেলতে পারলে না ক্রিসতফ। কোরিন একটা টাইম টেবিল এনে দেখিয়ে দিলে যে এখনও এক ঘণ্টা সময় আছে। সুতরাং থাকতেই হবে। একটু সাধাসাধির প্রশ্ন মাত্র। বেশী বেগ পেতে হল না, রাজী হ'য়ে গেল ও। এমন কি পার্টিতে ও মেয়ের নির্লজ্জ চটুলতা ও ইতর নির্বিশেষে সকলে সাথে নির্লজ্জ ঢলাঢলি দেখেও রাগ ক'রে চ'লে এল না। ওর সঙ্গে রাগ করা চলে না। কোরিনের কোন নীতি নেই, সংযম নেই সত্য; স্বভাবে ও শিথিল, পুরুষ-সঙ্গ প্রিয়; আয়েসী, ঢলা-ঢলিও করে নির্লজ্জভাবে। কিন্তু ওর মধ্যে মিথ্যে নেই; মনে ও খাঁটি; ও স্নেহ করতেও জানে। সমালোচনার যোগ্যও যা আছে তা সহজ, স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যবান চরিত্রের ধর্ম তা। অতএব হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে অনায়াসে, এমনকি ওকে ভালোবাসাও যায়। ক্রিসতফ ওর সামনের আসনেই বসেছে—নিরীক্ষণ করছে কোরিনকে—উল্লাসে উত্তেজনায় টগবগ করছে মেয়ে; প্রদীপ্ত দুই চোখ, আসিক্ত ওষ্ঠে ইতালী দেশের হাসি—যে-হাসিতে আত্মীয়তার সাথে আছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ধার, আর স্থূল কামনার ঝাঁঝ। আজ যেন ওর সত্যকার রূপটা আরও

খুলে গেল। ওর অবয়বের মধ্যে কোথায় কি যেন মিল আছে, য়্যাডাকে মনে প'ড়ে যায়। সেই ভঙ্গিমা, মাঝে মাঝেই সেই চাহনি, সেই স্থূল কামনার লাস্য—সেই চিরন্তনী মোহময়ী নারী, কিন্তু তবু ক্রিসতফের ভালো লাগে। ভালো লাগে লাস্যময়ীর ভেতরকার দক্ষিণী মানুষটাকে, তার সহজ ঔদার্য আর উদ্বারিত প্রাণ-প্রাচুর্যকে; যার মধ্যে কৃপণতা দিয়ে ঐশ্বর্যের অমর্যাদা নেই; রূপ আর বাক্-বৈদগ্ধ দিয়ে ড্রয়িংরুমী পুতুল সাজানোর বিড়ম্বনা নেই; সেখানে দেহে-মনে একটা স্বাভাবিক মানুষ সুরে সঙ্গতিতে রোদে জলে বড় হয়। যাবার সময় উঠে এল কোরিন। একান্তে সরে এসে পরস্পরকে চুমু খেয়ে চিঠি-লিখবার পুরানো প্রতিজ্ঞাটা আর একবার ঝালাই ক'রে নিয়ে বিদায় নিল কোরিন।

শেষ ট্রেন ধ'রল ক্রিসতফ। একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামে। উল্টো দিকের একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে ওরই ঠিক সামনে। তার একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়—হ্যামলেট দেখার ওর সেই অজানা সঙ্গিনী। বোঝা গেল ক্রিসতফকে সে দেখেছে এবং চিনতে পেরেছে। অবাক হ'য়ে যায় দু'জনে। নমস্কার ক'রে কাঠ হ'য়ে বসে রইল—চোখ তুলে কেউ কারও দিকে তাকাতে পারছে না সাহস ক'রে। তারই মধ্যে ক্রিসতফের চোখ এড়াল না ওর পরনে ভ্রমণের পোষাক, পাশে একটা পুরানো থলে। এ যে একেবারে দেশত্যাগের পাট, তা ওর মাথায়ই আসেনি। ভাবলে দু'দিনের জন্য হয়তো কোথাও যাচ্ছে। কথা বলা উচিত কি নয়, ভেবে পেলে না ক্রিসতফ। কয়েক মুহূর্ত মনে মনে আউড়ে নিলে কি ব'লবে। কিন্তু জানালার সার্শীটা নামিয়ে যেমনি কথা ব'লতে যাবে অমনি সিগন্যাল প'ড়ে গেল। আর হ'লো না। গাড়ী ন'ড়ে উঠল। সোজা স্থির দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। দুই কামরায় দু'জনেই

একা—জানালার গায়ে গাল চেপে ব'সে রইল ; রাত্রির বুক চিরে দুই জোড়া চোখ পরস্পরের দৃষ্টির মধ্যে কিসের সন্ধান করে। শুধু দুটো জানালার ব্যবধান। হাত বাড়ালে হয়তো ছোঁয়াও যায়। কিন্তু এত কাছে, তবু কত দূরে···কত দূরে। গাড়ীগুলি প্রবল ভাবে ঝাঁকানী খেয়ে যেন লাফিয়ে উঠল। এখনও ক্রিসতফের দিকে তাকিয়ে আছে সে—আজ বিদায়ের ক্ষণে সংকোচের জড়িমা খ'সে গেছে। এমনি আত্মহারা হ'য়ে ছিল দু'জন, শেষ সম্ভাষণের কথাও মনে রইল না। ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল ট্রেন সেই অজানিতাকে নিয়ে। কোথায় হারিয়ে গেল সে! অসীম শূন্যের বুকে দু'টি ঘূর্ণ্যমান পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে নিমেষের জন্য কাছে এসেছিল, আবার চলার পথে ছিটকে প'ড়ল নিরুদ্দেশ অনন্তে।

গভীর নিঃসীম শূন্যতা থম্ থম্ ক'রে উঠল চারদিকে—নামহীনা ওই মেয়ে তার চোখের চাউনি পেছনে ফেলে গেছে ওই শূণ্যতায়। কেন কারণ কি ও জানে না ? জানে, কিন্তু সেই জানাকে ছাপিয়ে উঠেছে এই অন্তর-জোড়া শূন্যতা। এক কোণে সরে গিয়ে এলিয়ে প'ড়ে রইল ও —আধ-বোজা নিদ্রালু চোখের সামনে জীবন্ত স্পষ্টতায় ভেসে উঠল, সেই হারানো দৃষ্টিখানি ওর দিকে স্থির হ'য়ে তাকিয়ে আছে। মনের গতি থেমে গেল ; অনুভূতির গভীরে ওই দৃষ্টি আরো নিবিড় হ'য়ে উঠল। জানালার কাঁচের গায়ে আছড়ে-মরা পতঙ্গের মত ওর হৃদয়ের বাইরে কোরিনের মূর্তি ছটফটিয়ে মরে ; ভেতরে প্রবেশের পথ পায় না হাতড়ে।

ট্রেন পোঁছে গেল তার নিশানায়। গভীর রাত্রির উদার হাওয়ার দাক্ষিণ্যে, আর ঘুমন্ত পুরীর রাস্তায় চলতে চলতে ওর তন্দ্রা কেটে গেল। আবার অন্তরের গভীরে সেই ছবি জেগে উঠল। সুন্দরী

অভিনেত্রীর কথা মনে হ'তেই মনটা অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠলেও তার আপন জনের মত সহজ স্নেহ স্মরণ ক'রে ওর মনটা খুশি হ'য়ে ওঠে; সাথে সাথেই তার শালীনতা-হীন ব্যবহারের কথা মনে হ'য়ে বিতৃষ্ণায় বিকল হ'য়ে ওঠে ওর সারা অন্তর।

পাশের ঘরে মা ঘুমিয়ে। পা টিপে টিপে ঘরে গিয়ে সন্তর্পণে কাপড় ছাড়ে, যাতে মার ঘুম না ভেঙ্গে যায়। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে আপন মনেই হাসতে হাসতে বলে: 'ও:, বাপরে বাপ কি চীজ এই ফরাসী গুলো… !'

কোরিন এর মারফৎই ফ্রান্স-এর সাথে প্রথম পরিচয় ক্রিসতফের। এবং সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে কোরিন তার দু'মুখো চরিত্র নিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। ট্রেনে-দেখা ওই মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে ওর আজ মনে হয় এ মেয়ে তো ফরাসীদের মত নয়।

ফরাসীদের মত হোক আর না হোক ক্রিসতফের সমস্ত চিন্তার জগৎ অধিকার ক'রে রইল সে। এক তীব্র অজানা বেদনায় মাঝ রাত্রে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। মেয়েটির পাশে-রাখা থলিটির কথা কেন জানি হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল। কেন জানি অকারণেই মনে হ'ল চিরদিনের মত বিদায় নিয়েছে সে। মনে তখনও হ'য়েছিল তবে বোঝেনি ততটা। বিচিত্র বিষাদে ওর মন ছেয়ে যায়। জোর ক'রে নিজকে বোঝাতে চায়:

'ও গেল বা থাকল তাতে আমার কি! আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাই কেন?'

ঘুমিয়ে পড়ে আবার।

কিন্তু পরের দিন চোখ খুলতেই দেখে ম্যানহাইম দাঁড়িয়ে বলছে: 'কিহে ফ্রান্স দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলে নাকি? সেই রকমই তো মনে

হ'চ্ছে যা শুনছি তাতে।' চারদিকে ছড়িয়ে গেছে ক্রিসতফের সাম্প্রতিক কাহিনী। ম্যানহাইমের কানেও পৌঁছেছে। 'বেশ বেশ, আমরা দেখছি একদম শিশু।' বলে ম্যনহাইম। 'কি ব্যাপার তাই বল না!' ক্রিসতফ জবাব দেয়।

'কি আবার ব্যাপার! তুমি করিৎ-কর্মা লোক। হিংসে হয় তোমার ওপর। গ্রুনবম্‌দের মুখের উপর বকস এর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে দিব্যি তাদের গভর্ণেস কে নিয়ে ফূর্তি লুটলে! এত দূর ছি··· ছি··।'

ক্রিসতফ যেন আকাশ থেকে পড়ে: 'কি বলছ? গ্রুনবমদের গভর্ণেস?'

'থাক থাক ন্যাকামো ক'রো না আর। ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানেন না উনি! ভাঁওতা রেখে চুপ ক'রে থাকো। বাবা রেগে কাঁই হ'য়ে আছেন। গ্রুনবমরাও তাই—কিন্তু যাক্ আপদ গেছে, ওরা ছাড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটাকে।'

'কি বললে!' ক্রিসতফ চিৎকার ক'রে উঠল: 'ছাড়িয়ে দিয়েছে? ছাড়িয়ে দিয়েছে তাকে? আমার অপরাধে?'

'যেন কিছুই জানেন না! বলেনি তোমায়?'

ক্রিসতফ চোখে অন্ধকার দেখে।

ম্যানহাইম বলে: 'খুব রাগ হচ্ছে, না? কিন্তু উপায় কি? গ্রুনবম-দের কাছে যে লুকুন থাকবে না তা বোঝা উচিত ছিল। 'কেন গভর্ণেসটাকে নিয়ে ডুবে ডুবে জল খেয়েছ, আর··· '

'আমি তাকে তো চিনিও না! এমন কি নামটাও জানিনে!'

ম্যানহাইম অর্থপূর্ণ হাসি হাসে; ওর হাসিটা যেন বলে: থাক থাক আর বোকা বুঝিও না।

ক্রিসতফ চটে গেল। কেন বিশ্বাস ক'রবে না ওকে ম্যানহাইম, করতেই হবে। স্বরটা প্রায় হুকুমের মত।

ম্যানহাইম বলে : 'থাম, খুব রসিকতা হ'য়েছে।'

ক্রিসতফ উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে। বলে ও, যাবে গ্রুনবমদের কাছে। ব'লে আসবে তাদের সত্যি ঘটনা। মেয়েটির তো কোনো দোষ নেই। ম্যানহাইম থামায় ওকে।

'দেখ কিছু বলতে গেলে বরং ফল হবে উল্টো। তা ছাড়া এখন আর ব'লে হবেই বা কি। মেয়েটা তো চলেই গেছে।'

ক্রিসতফের অত্যন্ত ক্লিষ্ট বোধ হ'তে লাগল অন্তরে। খোঁজ ক'রতে চেষ্টা করে, চিঠি লিখেই না হয় ক্ষমা চাইবে! কিন্তু কেউ কোনো খোঁজ দিতে পারলে না। গ্রুনবমদের কাছে লিখল ; ওদের জবাবটা যেন ওর মুখে চড় মাড়ল। উপকার ক'রতে গিয়ে এত বড় লোকসান ঘটিয়ে বসল। এ দুঃখ রাখবে কোথায়! অনুশোচনায় ওর অন্তর দগ্ধ হ'তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র নামহীন আকর্ষণ! চিরদিনের জন্য হারিয়ে-যাওয়া চোখ দুটি ওকে টানে এক রহস্যময় আলোর টানে।

দিন যায়, অনুশোচনা আর আকর্ষণ ভেসে যায় প্রতি দিনের নূতন নূতন অনুভূতির স্রোতে। কিন্তু নিঃশেষ হ'য়ে যায় না। হৃদয়ের গভীরে গিয়ে বাসা বাঁধে।

ক্রিসতফ ভুলতে পারে না অভাগা মেয়েটাকে—ওরই জন্য সে আজ নীড়-হারা! মনে মনে পণ করে, খুঁজে ওকে বার ক'রবেই। কিন্তু অনন্ত পৃথিবীর বুকে কেমন ক'রে কোথায় খুঁজবে সেই নীড়-হারা পাখীকে! তবু হৃদয় বলে : দেখা হবেই হবে।

কোরিন ওর চিঠির জবাব দেয়নি। কিন্তু তিনটি মাস পরে

ধাঁ ক'রে এক টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত—চল্লিশটি শব্দের সুদীর্ঘ এক অর্থহীন প্রলাপ—অন্তরঙ্গ সম্বোধন, অন্তরঙ্গ আলাপন—এখনও ক্রিসতফ ভালোবাসে কিনা ওকে। তারপর আবার এক বছর চুপচাপ ...আবার একখানা চিঠি বড় বড় ছেলেমানুষী হরফে আবোল তাবোল লেখা...। এখানেই শেষ। ক্রিসতফ ওর বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে গেল তা নয়। শুধু পথের দেখা বান্ধবকে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে স্মরণ করার মত সময় ওর নেই!

কোরিনের মোহ ওর মন প্রাণ তখনও ছেয়ে আছে; এ কয় দিন আর্ট সম্বন্ধে তার সাথে যে আলোচনা হ'য়েছে, সে সবও মাথায় ঘুরছে কেবল। স্বপ্ন দেখছে ক্রিসতফ...একখানি নাটক লিখবে; কোরিন ক'রবে অভিনয়। মাঝে মাঝে থাকবে তার মধু-কণ্ঠের গান। সঙ্গীত রচনা ক'রবে ও নিজের হাতে। জিনিসটি হবে কতকটা গীতি ধর্মী মেলোড্রামার মত। এককালে এ ধরণের মেলোড্রামা জার্মানীতে শুধু জন-প্রিয়ই ছিল না, মোজার্টের মত সুর-শিল্পীরও পরম সমাদরের বস্তু ছিল। বিঠোফেন, স্যুবার্ট, মেণ্ডেলসন, ওয়েবার প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্যগণও তাঁদের কম্পোজিশনে এই রীতিই অনুসরণ ক'রে গেছেন। কিন্তু হ্বাগনারীয় রীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর আগেকার মেলোড্রামার জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমে যায়। হ্বাগনার-পন্থীরা দাবী করেন, একমাত্র হ্বাগনারই নাট্যকলা ও সঙ্গীতের মূল রস ও তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রেছেন, এবং সেই উপলব্ধিই রূপ পেয়েছে তাঁর নূতন সৃষ্টিতে। অত্যুৎসাহী শিষ্যের দল শুধু যে প্রচলিত মেলোড্রামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে ক্ষান্ত হ'লেন তা নয়; ঐগুলোকে ঢেলে সাজাতে লেগে গেলেন। বিঠোফেন মোজার্টের সংলাপগুলি উড়ে গেল, তার জায়গায় নিজেদের ইচ্ছেমত আবৃত্তি জুড়ে নেওয়া হ'ল। ওদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস,

শিল্প-জগতের ভয়ংকর উপকার হয়েছে এতে। রচয়িতাদের যশের পথ আরো খুলে গেছে। সব চেয়ে বড় উপকার হয়েছে এই যে, শিল্পাচার্যদের উৎকৃষ্ট কম্পোজিশনেও চিন্তার দিক দিয়ে ফাঁক ছিল বহু ; ওই ভাবে গোবরের থাবড়া দিয়ে সেই ফাঁকও নাকি ভরাট হ'য়ে গেছে। কোরিনের মুখে হ্বাগনারীয় আবৃত্তির উগ্র নাটকীয়তা রীতিমত কুৎসিৎ মনে হয় ক্রিসতফের ; তার আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতা ওর রসিক মনকে পীড়া দেয়। কথার ভাষা ও সঙ্গীতের স্ব স্ব বিশিষ্ট একটা ছন্দ আছে। সুতরাং থিয়েটরে সংলাপ ও সঙ্গীতকে এক সাথে জুড়ে দেওয়ার প্রচলিত রীতি ওর যেন মনে হয় প্রকৃতি-বিরোধী। ঠিক বুঝতে পারে না। এই নিয়ে কিছুদিন থেকে ওর মনের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে। বড় বিসদৃশ মনে হয়—দুটো বিপরীত-ধর্মী জিনিসকে এক সাথে জুড়ে দেওয়ার প্রথা—গাড়ীর জোয়ালে ঘোড়া এবং পাখী একসাথে জুড়ে দেওয়ারই মত। শিল্পী স্ব-রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে কখনও কথাকে সম্পূর্ণ অবহেলা ক'রে সঙ্গীতকে প্রাধান্য দেন, কখনও বা তার বিপরীত। এর তবু একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু দু'টোর মধ্যে আপোষ ক'রতে গেলে একেবারেই ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ। অর্থাৎ, না হয় সঙ্গীত, না হয় কথা। সঙ্গীতের বাঁধন-হারা স্রোত মরা খালের দুই পাড়ের চাপে বাঁধা প'ড়ে কাঁদে আর বাণীর নিরাবরণ নিরাভরণ রূপ-ভরা দেহখানি ভারী ভারী পোষাক আর মোটা মোটা গয়নার ভারে গতি হারিয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকে। তার চেয়ে আপন স্বচ্ছন্দ লীলায় সহজ হ'য়ে চলুক কথা আর গান। ওই যে নদীর ধার দিয়ে খুশি হ'তে হ'তে মেয়েটি চলেছে চোখ-ভরা স্বপ্ন নিয়ে···ওর বুকের ভাষা আর চোখের স্বপ্নে কখন অজান্তে বেজে উঠছে নদী-মর্মরের সুর। মুক্তি দাও দেখবে অমনি ক'রেই কথায় আর গানে মেশামিশি হ'য়ে

যাবে। কাব্যের সাথে সুরের হবে মিতালী। কিন্তু এও সত্য যে সব রকম কাব্যেই গানের সুর চড়ান যায় না। সুতরাং ওরকম ক'রে গান ও কথা মেশানোর চেষ্টার মধ্যে কৃত্রিমতা ও অসঙ্গতির সম্ভাবনা থাকে ব'লে মেলোড্রামা-বিরোধীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপত্তি তুলে থাকেন। হয়তো তা খুব অযৌক্তিক নয়।

ক্রিসতফও বহু দিন পর্যন্ত এ আপত্তির সমর্থন ক'রেছে মূর্খ কাণ্ডজ্ঞান-হীন অভিনেতাদের অনাসৃষ্টি দেখে। আবৃত্তি-ধর্মী সংলাপগুলোকে তারা দিব্যি সুর লাগিয়ে বাজনার সাথে গায়। কিন্তু কোথায় বা থাকে বাজনা আর কোথায় বা থাকে তাদের গলা। ভালো মন্দ আর ওদের কাছে আসল কথা নয়। নিজের গলাটা কি ক'রে সকলের কাছে সব চেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ-গোচর করা যায় সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা। নিজেকে জাহির করার এই অশোভন চেষ্টা এবং সুরের অনাচার ওর রসিক মনকে বিদ্রোহী ক'রে তোলে। কিন্তু যেদিন থেকে ও কোরিনের গান শুনেছে, শুনেছে তার অপূর্ব সঙ্গীত ও বিশুদ্ধ লয়—বাজনার সাথে ওর গান মনে হয় যেন জলের বুকে তরল আলোর নাচন। কোথাও বাধা নেই, গতি-ভঙ্গ নেই, সহজ স্বচ্ছন্দ—সেই থেকেই ক্রিসতফের দৃষ্টি খুলে গেছে—কলা-লক্ষ্মীর নূতন রূপ ও দেখেছে।

হয়ত ভুল করেনি ক্রিসতফ। কিন্তু ওর দৃষ্টি-ভঙ্গি ও মানস-সম্পদ শিল্প ও রূপ-সৃষ্টির দিক দিয়ে যত অনুকূলই হোক, কাজ সহজ নয়। ওর অভিজ্ঞতা কম—পথও শান-বাঁধান নয়। কবি, সঙ্গীত শিল্পী ও অভিনেতাদের সমবেত প্রচেষ্টা এবং তার পূর্ণ সঙ্গতি অত্যন্ত প্রয়োজন শিল্পকে নবায়িত ক'রতে হ'লে। ক্রিসতফের কোন ভয় বা ভাবনা নেই। ঝাঁপিয়ে পড়ল কোনো দিকে না তাকিয়ে অজানা এক রূপলোকের উদ্দেশে যার নিশানা একমাত্র ওই জানে।

প্রথমে ওর ইচ্ছে ছিল, শেক্সপীয়রের নাটক থেকে কল্পনা-ধর্মী একটা অংশ যার মধ্যে ফুল, পরী এই সব আছে অথবা 'ফষ্ট'-এর দ্বিতীয় ভাগের একটি অংককে ও নূতন আঙ্গিকে রূপ দেবে। কিন্তু থিয়েটরের মালিকরা আনকোরা নূতন জিনিস পরীক্ষা ক'রতে রাজী হ'লেন না। ক্রিসতফের সঙ্গীত-প্রতিভা তাঁরা স্বীকার করেন: সেই অধিকারে কাব্য ও নাট্যের ক্ষেত্রেও হাত দেবার তার অধিকার হয়েছে ব'লে তাঁরা মনে করেন না। তাচ্ছিল্য ভরে সবাই হাসে; গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না ওকে। সঙ্গীত ও কাব্যের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা এবং পরস্পর বিরোধী। কাব্যে হাত দিতে হ'লে ওকে কবিরই সাহায্য গ্রহণ ক'রতে হয়। কিন্তু কোথায় পাবে? কে আছে ওর মনের মত কবি! তা ছাড়া কাব্য সম্বন্ধে ওর আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব আছে। কাজেই কবি বাছাইয়ের সাহস ওর নেই। শুনেও আসছে—কাব্য নাটক নাকি ও একেবারেই বোঝে না। আর সত্যি, ওর চারপাশের সমাজে যে-কাব্য সমাদর পায়, ও তার এক বর্ণও বোঝে না সত্যিই। কিন্তু মাঝে মাঝে ওর জেদ হয়েছে, বুঝবেই; বুঝে তবে ছাড়বে। চরিত্রগত সহজ সততা ও গভীর আন্তরিকতা নিয়ে কোনো কোনো কাব্য বোঝবার জন্য ও উঠে প'ড়ে লেগেছে। কিন্তু পারেনি। লজ্জিত হয়েছে। নিঃসংশয়ে জেনেছে, ও কবি নয়। কিন্তু প্রাচীন কবিদের মধ্যে কারো কারো কবিতা প'ড়ে ও মুগ্ধ হ'য়েছে। ওই ওর সান্ত্বনা। কিন্তু বোঝে, ওটুকুই সব নয়। ফাঁক থেকে গেছে, দাঁড়িপাল্লায় ওর তরফে ঢল থেকেছে। কবিদের ঠিক প্রাপ্য পূজা ও দিতে পারেনি। ও কোনো এক সময়ে বলে ফেলেছিল যে—কাব্যের প্রাণ ভাষা নয়, ভাব; অতএব গদ্যে অথবা বিদেশী ভাষায় তর্জমা হ'লেও যে-কাব্যের ভাব-সম্পদের লাঘব হয় না, সে কাব্যই আসল কাব্য। তার মহিমা অশংসেয়। বন্ধুরা হেসেছে শুনে;

ম্যানহাইম বলেছে গর্দভ। ও আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেনি। কারণ, প্রতিদিন লেখকদের সঙ্গীত নিয়ে অনধিকার চর্চার প্রহসন ও দেখে আসছে। স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে শিল্পীদের ধারের কারবারের কারুণ্যও দেখেছে। আশে পাশের সবাই যখন বলে ও কাব্য বোঝেনা, হাল ছেড়ে ও মাথা পেতে নিয়েছে সে-কথা। যদিও সত্যি সত্যি অতটা বোকা কিনা সে-সম্বন্ধে ওর সন্দেহ আছে। কিন্তু যাই হোক, ধ'রে নিয়েছে হবেও বা, নিশ্চয়ই তারা অনেক বেশী জানে। 'রিভিউ'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বন্ধুরা যখন স্টীফেন হেলমুথকে এনে চাপাল ওর ওপর, ও কোন প্রতিবাদ করল না। হেলমুথ ক্ষয়িষ্ণু গোষ্ঠীর একজন গুণী লেখক। জার্মান কবিদের মহলে তখন [ ফরাসী দেশেও ওই চলছে ] গ্রীক ট্রাজেডীকে ঢেলে সাজাবার মরশুম চলেছে। স্টীফেনের 'ইফিজিনিয়া' নাটকখানাও গ্রীক-জার্মান নাটকের এক অপূর্ব খিচুড়ী। এর মধ্যে না পাবে কি ? ইবসেন থেকে আরম্ভ ক'রে হোমার, অস্কার ওয়াইল্ড-অবধি সব আছে ; আছে প্রত্নতত্ত্বের তথ্য-বিচার, ভাগ্য নিয়ে বিভিন্ন পাত্রের সুদীর্ঘ ঘ্যান্‌ঘেনে কান্না। স্বভাবতঃই শ্রোতার মনে রেখাপাত করে না। নাটকের সমস্ত বেগ ও চঞ্চলতার কেন্দ্র নায়িকা ইফিজিনিয়া। ন্যাকা ভীরু, ব্যস্ত-বাগীশ দুর্দান্ত প্রকৃতির মেয়ে। নায়ককে লম্বা লম্বা বক্তৃতা শোনায় ; চিৎকার ক'রে গালাগাল দেয়। নীট্‌শে-মার্কা নৈরাশ্য-বাদের মূর্তিমতী প্রতিমা—শ্রোতারা সাদা চোখেও দেখতে পায় তা। মরণ নিয়ে ও বিলাস করে, হাসতে হাসতে নিজের হাতে গলা কেটে ফেলে অবলীলায়।

ভারী খারাপ লাগে ক্রিসতফের। এই হ'ল গ্রীক নাটকের আদর্শ ? শুধু ওপরের খোলসটাই গ্রীক। ভেতরটা একেবারেই মেকী। কিন্তু মিত্র মহলের অভিমত ওটাই নাকি ভদ্রলোকের শ্রেষ্ঠ রচনা—

মাষ্টার পীস। ও চুপ ক'রে যায়। ভাষা যোগায় না। বন্ধু-বান্ধবের চাপে মুখ খুলতে পারে না। তা ছাড়া ও তখন সুরের স্বপ্নে বিভোর। সেই স্বপ্নকে ভাষা দেবার নূতন ক্ষেত্র পেয়েছে, ঐ টুকুই যথেষ্ট। ঐ নিয়ে ও মেতে আছে—সে-ক্ষেত্র কেমন, রচনার বিষয়-বস্তু কেমন, সেদিকে ওর বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা কাব্যকে সুরে রূপায়িত করতে হ'লে যে-নিরাসক্তি ও বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতার প্রয়োজন তা ক্রিসতফের রইল না। ও নাটক ভুলল, ভুলল হাতের উপকরণের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার কথা। সব ছাপিয়ে উঠল ও স্বয়ং। ওর নিজের কথাই জেগে রইল সব কিছুর ওপর দিয়ে। ওর চোখে যেন কিসের রং লেগেছে—। ছোট বেলায় ও নাটক দেখে এসে নিজের মনে মনে নাটক তৈরী ক'রত। কিন্তু দেখা জিনিসটার সাথে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যেত না। এখনও তেমনি কাব্যখানার আসল রূপটি ছাড়িয়ে আর একটা রূপ ধরা দিল ওর স্বপ্ন-লাগা চোখে।

রিহার্সেল-এর আগে ও আসল নাটকটি দেখেনি। এক দিন একটা দৃশ্য ভারী খারাপ লাগল। ভাবল বুঝি অভিনেতাদেরই দোষ। থাকতে পারল না। অভিনেতাদের উপদেশ দিতে লেগে গেল। বুঝলে না কবি স্বয়ং উপস্থিত, এক্ষেত্রে এ নিতান্ত অশোভন। শুধু তাই নয়, কবিকেও ছাড়লে না। প্রথমটায় কবি আত্ম-সমর্থন করতে চেষ্টা করেন; তারপর অতি স্পষ্ট পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন যা উনি লিখেছেন, জেনে শুনে বুঝেই লিখেছেন। ক্রিসতফের কথা শুনতে তিনি রাজী নন। ক্রিসতফ কিছুতেই মাথা নোয়ায় না, ব'লে বসল ফন হেলমুথ কিছু জানে না। হাসাহাসি প'ড়ে গেল। ওই হাসিই প্রমাণ ক'রে দিলে ক্রিসতফ নিজেকে কতখানি হাস্যাস্পদ ক'রে তুলেছে। অগত্যা চুপ ক'রে যেতে

হয়। সান্ত্বনা দেয় নিজেকে, ওর লেখা তো নয়। সুতরাং যা খুশি তাই হোগ গে। যতই অগ্রসর হয় নাটক খানার অন্তঃসারশূন্যতা ততই অনাবৃত হ'য়ে পড়ে। ও স্তম্ভিত হ'য়ে যায়, অসহ্য লাগে। ভাবে, এ হেন ছাই পাঁশে হাত দিতে ও কেমন ক'রে রাজী হল? মূর্খ! মূর্খ! আফশোষে ও নিজের চুল ছেঁড়ে। বৃথা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে নিজেকে: 'ওরে, তুই কি জানিস এ সবের? এত মাথা-ব্যথা কেন তোর? তুই তোর সঙ্গীত নিয়ে থাক না বাপু!' কিন্তু পারে না। মাঝে মাঝে এক একটা জায়গা এত বেশী খেলো, এত হাস্যকর, এত ভস্‌ভসে ফাঁপা তার ভাব আর ভাষা, এত মিথ্যে কথা আর ভঙ্গি, যে লজ্জায় ওর মাটির তলায় মিশে যেতে ইচ্ছে করে। অর্কেষ্ট্রা পরিচালন ক'রতে গিয়ে হাতের সুর-নির্দেশক দণ্ডটি তোলবারও ক্ষমতা থাকে না। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে স্মারকের ঘুপচিটার মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে। সংসারের রীতি নীতি ও শেখেনি। বন্য সরলতায় মন্ত্রগুপ্তির খাদ মেশেনি। মনের ভাব চোখে মুখে, পেশীর কুঞ্চনে কোথাও আর গোপন থাকে না। বন্ধু-বান্ধব, অভিনেতার দল কারো বুঝতে বাকী থাকে না। কঠিন একটুখানি হাসি হেসে হেলমুথ ওকে বললে:

'আপনাকে খুশি করা মহা ভাগ্যের কাজ।'

মনের সত্যিকার কথাটাই জবাব হ'য়ে বেরিয়ে আসে:

'না দেখুন, তা নয়। আসলে আমি বুঝতেই পারছিনে।'

'সুর দেবার সময় পড়ে দেখেন নি তাহলে?'

'পড়েছি বৈকি। কিন্তু আমারি ভুল হয়তো, সম্পূর্ণ আলাদা রকম বুঝেছিলাম আমি।'

'যা বুঝতে পার'বেন, তেমন জিনিস নিজে লিখলেই তো পারেন।'

'পারলে কি আর অমনি ব'সে থাকতাম।'

কবি চ'টে যান। উল্টে অভিযোগ করেন সুরটা ঠিক হয়নি। কথা শোনাই যাচ্ছে না।

কবি আর সুরকারের মধ্যে বোঝাবুঝি হোক আর নাই হোক অভিনেতারা বুঝলে না কাউকেই এবং না বুঝলেও কোন অসুবিধাই হয় না। কোন কথার ওপর কোন নাটকীয় মুদ্রাটি লাগবে, পরিচালকের কাছে সেইটে শুধু জেনে নেওয়া। সব তো ধরা-বাঁধা ফরমুলায় ফেলাই আছে। নাটকের বিষয়-বস্তু, তার ছন্দ ও সুরের সাথে সঙ্গতি না থাকলেও হানি নেই। অভিনয় চলে এক দিকে—সঙ্গীত আর এক দিকে। মনে হয় কেবলি বেসুর বাজছে, সুর কোথাও নেই। ক্রিসতফ দাঁত কড়মড় করে ; চিৎকার ক'রতে ক'রতে ওর গলা ভাঙ্গে। কিন্তু গ্রাহ্য নেই কারো, যে যার পথে চলে। ও যে কি চাইছে তা বুঝতেও চেষ্টা করলে না কেউ।

রিহার্সেল অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তা ছাড়া আইনতঃ শর্ত-ভঙ্গের দায় আছে, নয় তো সব ফেলে টেলে ও পালিয়ে যেত। ম্যানহাইমের কাছে মনের দুঃখ ব্যক্ত করে। ঠাট্টা করে ম্যানহাইম :

'সে কি ? বেশ তো হ'চ্ছে। কেউ কাউকে বুঝছ না ? নাই বুঝলে ! বয়েই গেল। স্বয়ং লেখক ছাড়া লেখা কে আর কবে বোঝে বল ! লেখকও বোঝে না, সব ধাপ্পা।'

ক্রিসতফের কেবলি ভয় ওর সঙ্গীতই নষ্ট হ'য়ে যাবে খেলো অর্থহীন কবিতার ভাষায়। ম্যানহাইম স্বীকার করে হেলমুথটা আস্ত গর্দভ, ছাই-ভস্ম লিখেছে কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু হেলমুথের কাব্য যত রাবিশই হোক, তাতে ওর মাথা ব্যথা হওয়া উচিত নয়। কারণ হেলমুথ-এর টেবিলে বন্ধু মহলের জন্য ষোড়শোপচার

ডিনার সাজান থাকে সর্বদাই। আর আছে রূপসী তন্বী স্ত্রী। সমালোচকদের আর কি চাই?

ক্রিসতফ রেগে যায়, ও সব বাজে কথা শোনার সময় নেই ওর।

'বাজে নয় হে, বাজে নয়।' হাসতে হাসতে ম্যানহাইম বলে: 'কত ভাবনাই ভাবে মানুষ! জীবনে আসলে কোনটা যে বেশী দরকার তার জানে না কিছুই।' ক্রিসতফকে ও বোঝাতে চেষ্টা করে, হেলমুথকে নিয়ে অত ঘাঁটাঘাঁটিতে কাজ কি, নিজেরটা নিয়েই থাকুক না ও। একটু বিজ্ঞাপন চাই হে। সামনে এসে একটু প্রচার ট্রচার কর নিজেকে। রাগে ঘৃণায় মুখ ফেরায় ক্রিসতফ, চিৎকার ক'রে ওঠে: 'চাইনে চাইনে তোমার উপদেশ।' একজন সাংবাদিক ওর জীবনেতিহাস জানতে চায়, রেগে ওঠে ও:

'আমার জীবন যা খুশি হোক. তা নিয়ে আপনার কি হবে? নিজের চরকায় তেল দিন গে।' ওর ছবি চাইলে একখানা, সমালোচনার সাথে ছাপবে। আগুন হ'য়ে উঠে মাটিতে পা আছড়িয়ে বলে, রাজা মহারাজা নই, হাতে হাতে ঘুরবার মত চেহারাও নয়। বড় শিল্পীদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না; নিমন্ত্রণের জবাব দেয় না। দৈবক্রমে কোনোটা স্বীকার করতে যদি বা বাধ্য হ'ল, যেতে গেল ভুলে; যদি বা গেল তো এমনি গোমরা মুখ ক'রে রইল, যে ধারে কাছে কেউ এগুতে সাহস করে না। লোক বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু অভিনয় মঞ্চস্থ হবার দু'দিন আগে ওর সাথে ঝগড়া হ'য়ে গেল 'রিভিউ' পরিচালকদের সাথে। এতদিনকার জমান গুমট উঠল চরমে।

এবং বিস্ফোরণও ঘ'টে গেল। আজ হোক আর কাল হোক ঘ'টতই।

ম্যানহাইম পূর্বের মতই ক্রিসতফের লেখা দেখে দেয়; খুশি মত ছাঁট কাট ক'রে বসায় কড়া কথার বদলে মিঠে; নিন্দের বদলে প্রশস্তি। ওর সাহস বাড়তে বাড়তে ক্রমশঃ এসে ঠেকল দুঃসাহসের পর্যায়ে।

একদিন বেড়াতে বেরিয়েছে ক্রিসতফ। দেখা হ'ল এক পিয়ানো বাজিয়ের সাথে। লোকটা ফাজিল, খুব ঠুকেছিল ওকে ক্রিসতফ সমালোচনার পাতায়। কিন্তু সে-দিন সে সামনে এসে একেবারে বত্রিশ দাঁত বিকশিত ক'রে ওকে ধন্যবাদ দিলে। ও দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে—ধন্যবাদ মানে? তবু ছাড়ে না না-ছোড়-বান্দা লোকটা। কি ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ঠিক পায় না। ক্রিসতফ ওকে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করে: 'সমালোচনা প'ড়ে আপনার ভালো লেগে থাকে খুব ভালো কথা। কিন্তু ভালো লাগার জন্য ওটা লেখা হয়নি।' ব'লে পিছন ফিরে পা বাড়ায়। ভদ্রলোক ভাবলেন, লোকটা জঙ্গলী। হেসে চ'লে গেলেন। ক্রিসতফের মনে প'ড়ে গেল—আর একজনও ধন্যবাদ জানিয়ে কার্ড পাঠিয়েছে ওকে। তারও তো কড় ভাষায় সমালোচনা ক'রেছিল। কেমন সন্দেহ হ'ল। বেরিয়ে একটা খবরের কাগজের দোকান থেকে 'রিভিউ'-এর শেষ সংখ্যাটা কিনে ওর নিজের লেখাটা প'ড়তে লাগল। প্রথমটায় অবাক হ'য়ে গেল—পাগল হয়নি তো ও? তারপরে বুঝল ব্যাপার কি; ছুটে এল অফিসে।

ওয়ালডহৌস ও ম্যানহাইম পরিচিত একজন অভিনেত্রীর সাথে কথা বলছিল। হাতের 'রিভিউ' খানা মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে উদ্দণ্ড ক্রোধে ফেটে প'ড়ল বোমার মত। ঘর বাড়ী কেঁপে উঠল ওর গলার দাপটে। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চোর জোচ্চোর, জালিয়াত যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি দিয়ে, আসবাব পত্র ছোঁড়াছুঁড়ি ক'রে এক প্রলয় কাণ্ড

বাঁধিয়ে তুলল চোখের নিমেষে। ম্যানহাইম হাসে। ক্রিসতফ লাথি বাগিয়ে ছুটে যায় ওর দিকে। ম্যানহাইম একটা টেবিলের আড়ালে ব'সে গড়িয়ে গড়িয়ে হাসে। কিন্তু ওয়ালড্‌হৌসের আচরণে বিন্দুমাত্র লঘুতা নেই। সে তার পদানুযায়ী গাম্ভীর্যে এবং দফতরী চালে এগিয়ে এল; গোলমাল থামাতে চেষ্টা করে প্রাণপণে। ক্রিসতফকে কঠিন স্বরে জানিয়ে দেয়, যে-ভাষায় সে কথা ব'লছে আর কেউ হ'লে—এ কখনও বরদাস্ত করা হতনা। জানে কি ক্রিসতফ কার সাথে কথা বলছে? ব'লে নিজের কার্ডখানা বাড়িয়ে ধ'রল। ক্রিসতফ ওটা তার মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল:

'শয়তান···কার্ড! কে চায় তোর কার্ড······আমায় কার্ড দেখাতে এসেছেন। কাউকে চিনতে আর বাকী নেই। শয়তান···জালিয়াৎ··· জোচ্চোর কোথাকার···ভাবছিস আমি ঝগড়া ক'রতে এসেছি···তা নয়···। ঝগড়া নয়, মুগুর। তোরা যেমন কুকুর, তেমনি মুগুরই দোব আজ। ঐ তোদের উপযুক্ত ব্যবস্থা।'

রাস্তায় লোক জমে গেল। ম্যানহাইম জানালা বন্ধ ক'রে দেয়। অভিনেত্রীটি পালিয়ে যাবার পথ খুঁজছিল, কিন্তু ক্রিসতফ পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়ালড্‌হৌসের মুখ ফ্যাকাশে। ওর গলা বন্ধ হ'য়ে আসছে। ম্যানহাইম বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে কি ব'লে জবাব দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রিসতফের গালাগালির বন্যায় সব কিছু ভেসে যায়। যা খুশি তাই ব'লে চলেছে অনর্গল। অবশেষে দম ও গালাগালির ভাণ্ডার দুইই ফুরিয়ে গেলে ও থামে।

ক্রিসতফ চলে গেলে তবে ওদের বাক্যস্ফূর্তি হয়। ম্যানহাইম এতক্ষণে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। প্রাণ খুলে গাল দেয় ক্রিসতফকে।

জল থেকে উঠে গা ঝাড়া দিলে হাঁসের গা থেকে যেমন অনায়াসে জল ঝর্ ঝর্ ক'রে পড়ে, ঠিক তেমনি ক'রে ওর মুখ থেকে গাল বেরুতে লাগল। কিন্তু ওয়ালড্‌হোসের ঘা তখনও কাঁচা। ওর মর্যাদায় আঘাত লেগেছে। আরও মর্মান্তিক যে, ব্যাপারটা একান্তে ঘটেনি। এ অপমান ও কথনও ক্ষমা ক'রবে না। সহকর্মীরাও যোগ দেয় ওর সঙ্গে। 'রিভিউ'-এর কর্মীদের মধ্যে একমাত্র ম্যানহাইমের রাগ হয়নি ক্রিসতফের ওপর। এ ওর কাছে একটা চমৎকার তামাসা। হেসে নেওয়া গেল খানিকক্ষণ। দু'টো মিঠে কড়া কথা শুনতে হ'ল এই যা। এ আর এমন একটা কি। শুধু ওকেই যদি ব'লত ক্রিসতফ, তাহ'লে অবশ্য ও হেসে উড়িয়ে দিত ব্যাপারটা। এক্ষুনি গিয়ে ক্রিসতফের করমর্দন করতে পারে ও। কিন্তু ও পক্ষ কঠিন। তার বুকের আগুন নিববে না এত সহজে। সুতরাং এগুনই যাবে না ও ছেলের কাছে এখন। ওঃ ভারী তো ব'য়ে যাবে ম্যানহাইমের। ক্রিসতফ ওর খেলার জিনিস। দু'দিন বেশ খেলা ক'রে নেওয়া গেছে। নিংড়ে মজা লুটে নিয়েছে। ওর মধ্যে এখন আর কিছু নেই। এখন ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে নূতন খেলনার দিকে মন ছুটছে ম্যানহাইমের। সুতরাং বন্ধুত্বের ইতি হ'য়ে গেল এখানে। এই মুহূর্ত থেকেই।

কিন্তু লোক-সমাজে ম্যানহাইম সর্বদাই বলে ক্রিসতফ ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু। হয়ত মনের কথাই বলে, কে জানে!

এই ঘটনার দু'দিন পরে 'ইফিজিনিয়ার' প্রথম অভিনয় হ'ল। অত্যন্ত নৈরাশ্য-জনক। ওয়ালড্‌হোসের 'রিভিউ' কাব্যাংশ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা ক'রল বটে কিন্তু সঙ্গীতাংশ সম্বন্ধে একেবারে নীরব রইল। অন্যান্য কাগজগুলি বিদ্রূপে ব্যঙ্গে মুখর হ'য়ে উঠল। তৃতীয় রজনীর

পরেই অভিনয় বন্ধ হ'ল বটে, কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনা বন্ধ হ'ল না। ক্রিসতফকে খানিকটা খোঁচা দেবার সুযোগ পেয়ে সবাই উল্লসিত হ'য়ে উঠল। এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ 'ইফিজিনিয়া' ব্যঙ্গ-কৌতুকের উৎস হ'য়ে রইল। আত্মরক্ষার কোন হাতিয়ার নেই ক্রিসতফ-এর হাতে। এ সুযোগ অমনি যেতে দিলে না শত্রু পক্ষ। ছেলেটার দরবারী পদটায়ই যা একটু অসুবিধা। তবে একটু সুবিধা এই যে, গ্র্যাণ্ড ডিউকের সাথে ক্রিসতফের সম্পর্কটা ইদানীং তেমন ঘনিষ্ঠ নেই; কারণ, একগুঁয়ে ছেলে রাজকীয় শাসনেরও বাইরে চ'লে গেছে। ডিউককেও সে গ্রাহ্য করে না। অবশ্য ভেতরের ব্যাপার লোকে ততটা জানে না। মাঝে মাঝে প্রাসাদে যাতায়াত থাকায়, বাস্তবে কোনো প্রশ্রয় না থাকলেও লোক-চক্ষে ওটা ওর রক্ষা-কবচ হ'য়ে আছে। কিন্তু এও বেশীদিন সইল না ওর।

ক্রমাগত ঘাত প্রতিঘাতে ও যেন মরীয়া হ'য়ে উঠল। চারদিকে শুধু বিরুদ্ধ সমালোচনা; ও যেন সপ্তরথী পরিবেষ্টিত হ'য়ে আছে। ওর সঙ্গীত, ওর নূতন শিল্প-দৃষ্টি সব কিছুকে ওরা মুখ ভ্যাংচায়। বোঝে না বলেই অত সহজে মুখ ভ্যাংচাতে পারে ওরা। উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে উপেক্ষা করাই এক্ষেত্রে প্রশস্ত। কিন্তু এত পাকা-পাকি বুদ্ধি ও মানুষের নেই। মাস কয়েক প্রত্যেকটি সমালোচনার জবাব গেল, কাউকে ছেড়ে দিলে না। শত্রু-পক্ষের কয়েকজনকে তীব্র সমালোচনা ক'রে একটা প্রবন্ধ লিখে কাগজগুলির দ্বারে দ্বারে ঘোরে, সম্পাদকেরা সব্যঙ্গ-বিনয়ে প্রকাশকের অক্ষমতা জানিয়ে লেখা ফেরৎ দেয়। কিন্তু ক্রিসতফ হাল ছাড়বার পাত্র নয়। মনে প'ড়ল, একটা সমাজতান্ত্রিক কাগজের তরফ থেকে ওর কাছে এসেছিল একবার। সম্পাদক-মণ্ডলীর একজনের সাথে ওর পরিচয় ছিল। কখনও কখনও

দেখা সাক্ষাৎ হয়। আলাপ সালাপ হয় মানুষের অত্যাচার, ক্ষমতার লড়াই, অস্ত্র-সজ্জা, সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি নিয়ে, মানুষের সমাজের ওপর শাশ্বত পীড়নের ও তার প্রতিকার নিয়ে। এ-ধরনের আলাপ করার অবকাশ পেয়ে ওর বেশ ভালো লাগে। কিন্তু বেশী দূর এগোয় না আলাপ। কেননা সমাজতন্ত্রী বন্ধুর কৌশলে আলোচনার ধারা ঠেকে এসে কার্ল মার্কাস-এ। অথচ ক্রিসতফ সে-সম্বন্ধে কিছুই জানেনা। কোনো দুর্বলতাও নেই ওর ওই লোকটির ওপর। বন্ধুর সমস্ত আলোচনায় মুক্ত মানুষের খবর। কিন্তু এমনি একটা উগ্র-বস্তুবাদের ঝাঁঝ সমস্ত কথা বার্তায়, ভঙ্গীতে এমনি বিসদৃশ অহমিকা আর রূঢ়তা, যে ওর ভালো লাগেনি। বুঝতেও দেরী হয়নি বন্ধুর কথা বার্তায় বল-প্রয়োগের সমর্থন প্রচ্ছন্ন হ'লেও আছে। অর্থাৎ সোজা কথায় ওদের নীতি যুদ্ধ-বাদের। তবে সেটা ওরা সোজা কথায় বলে না।

যাই হোক, সব দরজা বন্ধ হ'য়ে গেলে এই ব্যক্তির কথাই ওর মনে এল। এ-কাগজে লেখা বেরুলে মানুষ আরো ক্ষেপবে। কারণ, কাগজখানা অতি উগ্র-পন্থী; অহেতুক আক্রমণ ক'রাই এর নেশা ও পেশা। এবং এ-জন্যই সংবাদ পত্র সমাজে প্রায় এক ঘরে হ'য়ে আছে। কাগজ খানা ও কখনও পড়েনি। এবং পড়েনি ব'লেই তার আপাতঃ সাহসটাই ওর চোখে লেগেছে। কিন্তু ভাষা ও ভঙ্গীগত নীচ রুচির পরিচয় পায়নি। পেলে নিজেই শিউরে উঠত। তা ছাড়া যখন দেখল শহরের সবগুলি কাগজ ওকে দাবাবার জন্য দল বেঁধে লেগেছে; দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে উঠল ও। এ অবস্থায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে কাগজ খানার স্বরূপ দেখিয়ে দিলেও ও ফিরত কিনা সন্দেহ। ও দেখাবেই, কোন বাধাকে গ্রাহ্য করে না ও।

সুতরাং প্রবন্ধটা দিয়ে এল ; দুই বাহু বাড়িয়ে সাগ্রহে গ্রহণ করলেন সম্পাদক। পরের দিন ওটা বেরুল এবং তরুণ মনীষী ও বিখ্যাত শ্রমিক-বন্ধু ক্রিসতফ ক্রাফট-এর সমর্থন পাওয়া গেল ব'লে সমাচার বড় বড় হরফের শিরোনামায় ছাপা হ'য়ে বেরুল।

সেদিন রবিবার ; আলো হবার আগেই ক্রিসতফ বেরিয়ে পড়েছে গাঁয়ের দিকে বেড়াতে। ওর প্রবন্ধ বা সংবাদ কোনোটাই ওর চোখে পড়েনি। মনটা খুশিতে হাল্কা। দিগ্‌বালে সোনার রেখা দেখে ও লাফিয়ে নেচে, হেসে গেয়ে চিৎকার ক'রে অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে তুলল। আজ 'রিভিউ' নেই, সমালোচনা নেই! বসন্ত এসেছে···আকাশ আর মাটি রূপে রাঙ্গা, সুরে মাতাল! দম-বন্ধ করা ভ্যাপসা, কনসার্ট-কক্ষের অন্ধকার আজ নয় ; নয় ঘর্ম-সিক্ত, দুর্গন্ধ ছড়ান মানুষের অপ্রীতিকর ভিড় আর অভিনেতাদের পানসে ভাবহীন মুখ। আজ শুধু মর্মরিত বনানীর গান শোনা। সমাধির অন্ধকার হ'তে উৎসারিত জীবনের মাতাল-করা সুবাস মাঠে মাঠে হিল্লোল তুলে ধরণীর আচ্ছাদন ভেদ ক'রে একেবারে তার বুকের মাঝ খানটিতে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে।

বাড়ী ফিরে এল-মাথার মধ্যে আলো ও গানের মাতামাতি তখনও। মা একখানি চিঠি এনে দিল—ও চ'লে যাওয়ার পর রাজবাড়ী থেকে এসেছে। চিঠিখানা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে লেখা—সকাল বেলা প্রাসাদে যাবার অনুরোধ। সকাল চ'লে গেছে। ক্রিসতফ দমল না। বললে : 'আজ বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে, কাল যাব'খন।'

মা উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠেন : 'সে কিরে! না না হিজ্‌ হাইনেস যেতে ব'লেছেন। এক্ষুণি যা, এক্ষুণি যা! খুব জরুরী দরকার নিশ্চয়।'

ক্রিসতফ ঘাড় বাঁকিয়ে বলে : 'জরুরী না ছাই। এদের আবার

জরুরী! উনি ধ'রে আমাকে ওর সঙ্গীতের বিদ্যে শোনাবেন আর কি। হুঁঃ এখন ব'সে ব'সে ওই কর! বেশী কিছু বলবেন তো সাফ ব'লে দেব, রাজনীতি নিয়েই থাকুন মশায়। ওটা আপনারই এলাকা, হাতে খেলবে ভাল। কিন্তু সাবধান! শিল্পে হাত দেবেন না আর। সরস্বতীর দরবারে ধরা চুড়ো, সেপাই পুলিশ, ঢাল-তলোয়ার অচল। ও গুলোই যদি বিসর্জন দেবেন কি থাকবে তাহ'লে আপনার!'

বেচারা লুইসা ভাবে সত্যি এ সব বলবে নাকি দস্যি ছেলে। অসম্ভব তো কিছু নেই। ভয়ে শিউরে উঠে ওর মুখ চাপা দিতে যায়: 'থাম লক্ষীছাড়া! ও কথা ব'লতে নেই! পাগল হলি?'

মাকে ক্ষেপিয়ে ভারী মজা পায় ক্রিসতফ। আরো বেশী ক'রে ব'লে ব'লে আরো ক্ষ্যাপায় মাকে। শেষে লুইসা বোঝে, ধুরন্ধর ছেলে ওকে ক্ষ্যাপাচ্ছে। বলে: 'বোকা ছেলে কোথাকার!'

ক্রিসতফ হেসে চুমু খায় মাকে। ওর মেজাজ আজ অদ্ভুত শরীফ। বেড়াতে বেড়াতে ভারী চমৎকার একটা কম্পোজিশনের বিষয় খুঁজে পেয়েছে ও। জলের মধ্যে মাছের মত ছলছলিয়ে বেড়াচ্ছে ওর বুকের তলায়। ক্ষিদে পেয়েছে ভারী। না খেয়ে ও এক পা নড়বে না। মাকে ক্ষ্যাপাতে লাগল, যা পরা আছে ওই পুরানো ছেঁড়া জামা কাপড় আর ময়লা জুতো প'রেই ও যাবে। লুইসা ভারী উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি এসে ওর পোষাকের তদারকে লাগে। ক্রিসতফ খেপিয়ে টেপিয়ে কাপড় ছাড়ে, জুতো পরিষ্কার করে আর পাখীর মত হাল্কা খুশিতে শীষ দেয়। অর্কেষ্ট্রার বাজনার মত স্থর বাজায় মুখে। শেষ হ'লে মা আর এক বার ভালো ক'রে তদারক ক'রে গম্ভীর ভাবে টাইটা আর একবার বেঁধে দেয়। শান্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও। হয়তো জীবনে এই প্রথম। চুপ ক'রে থাকা

ওর ধাতে নেই। আজ যেন কি নিয়ে ছেলে খুশি আছে, তাই এই অঘটন। যাবার সময় বলে গেল মাকে, গ্র্যাণ্ড ডিউক-এর মেয়ে রাজকুমারী য়্যাডিলেডকে নিয়ে ও পালিয়ে যাবে। রাজকুমারীর বিয়ে হয়েছে জার্মানীরই এক রাজবংশীয়ের সাথে। সম্প্রতি পিত্রালয়ে বেড়াতে এসেছে ক'দিনের জন্য।

ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে চলল ও দু'পাশের দোকান দেখতে দেখতে, কখনও বা দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তার পাশে শুয়ে-থাকা রোদে-ধোঁকা চেনা কুকুরটার মাথায় হাত বুলায়। নিরীহ ভেড়াটা ডিঙ্গিয়ে ও প্রাসাদের হাতায় প্রবেশ করে। প্রকাণ্ড বড় শূন্য মাঠ চক মেলান মহল··· দুদিকে একরকম দুটো ফোয়ারা, এক রকম ফুলের বাগান; মাঝখান দিয়ে সিঁথীর মত কেটে গেছে লাল কাঁকড়ের রাস্তা। ঝরঝরে তক্‌তকে বাছাই-করা কাঁকড় আলতো ক'রে বিছানো। দুই পাশে গামলায় কমলা লেবুর গাছ। মাঝখানে কোনো এক জন পূর্ব পুরুষের ধাতুর তৈরী প্রতিমূর্তি—লুই ফিলিপির ধরনের পোষাক পরা; পাদপীঠের চার কোনায় বিভিন্ন গুণের রূপক মূর্তি। একটা বেঞ্চিতে কে একজন হাতে একটা কাগজ নিয়ে তার উপর ঝুঁকে বসে আছে। নিরর্থক পরিখাটার মেটে বাঁধের গায়ে দুটো বৃদ্ধ কামান ঝিমুন শহরটার বুকে বসে যেন ঝিমিয়ে হাঁই তুলছে। দেখে শুনে ক্রিসতফের কেমন হাসি পায়।

নেহাৎ সহজ ভাবেই ও প্রাসাদে গিয়ে হাজির হ'ল। গুন্‌গুনিয়ে গানটা শুধু থামাল দোর গোরায় এসে; কিন্তু সকাল বেলাকার খুশি গুলো ওর বুকের মধ্যে নাচতে থাকে তখনও। হলের মধ্যে ঢুকে, টেবিলের ওপর টুপিটা আছড়ে ফেলে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুরে আবাল্যের পরিচিত পরিচারকটিকে সম্ভাষণ জানাল। [ক্রিসতফ প্রথম যে

দিন এই প্রাসাদে প্রবেশ ক'রেছিল, সেদিনও ছিল এই বৃদ্ধ ; সে-দিন সে হাসলারকেও দেখেছিল ]। ক্রিসতফ তেমন সম্মান ক'রে ওর সাথে কথা বলেনি কখনও। ঠাট্টা তামাসা ক'রেছে বয়সের মর্যাদা ডিঙ্গিয়ে। কিন্তু সর্বদা ও-তরফের ব্যবহার ছিল অমায়িক, বিনীত কিন্তু আজ চির-ধীর বৃদ্ধ কিছু উত্তপ্ত। ক্রিসতফ গায়ে মাখলে না। আর একটু এগিয়ে গিয়ে পাশের দিকের একটা ঘরে একজন কেরাণীর সাথে দেখা হ'ল। এর আগে এ লোকটির সাথে ওর খাতির ছিল বেশ। ওকে দেখলেই সে বসিয়ে গল্প গুজব করত। আজ সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ভারী অবাক হ'য়ে গেল ক্রিসতফ। কিন্তু এও তেমন গায়ে মাখলে না। এগিয়ে গিয়ে গ্র্যাণ্ড ডিউকের সাথে দেখা করবে বলে সংবাদ পাঠাতে বলল।

ভেতরে এল ও। সবে দ্বি-প্রাহরিক ভোজন শেষ হয়েছে। গ্র্যাণ্ড ডিউক বৈঠকখানায় ছিলেন। ম্যাণ্টেলপিসে হেলান দিয়ে বসে ধূমপান করতে করতে তিনি কথা বলছিলেন অভ্যাগতদের সাথে। ক্রিসতফের সেই রাজকন্যাটিও ছিলেন এঁদের মধ্যে ; কয়েক জন কর্মচারী পরিবৃত হ'য়ে আরাম-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ধোঁয়া উদ্গীরণ করতে করতে জোরে জোরে কার সাথে যেন কথা কইছিলেন। ঘরের আবহাওয়া খুব একটা জীবন্ত স্ফূর্তিতে হাল্কা হ'য়ে আছে। মানুষ গুলিও যেন টগবগ করছে। ঘরে ঢুকেই ক্রিসতফ ডিউকের ভারী গলার দরাজ হাসির আওয়াজ পেল। ক্রিসতফকে দেখেই হাসিটা একেবারে থেমে গেল। গর্জন ক'রে উঠলেন লাফিয়ে একেবারে যুদ্ধং দেহি ভঙ্গীতে।

'দয়া ক'রে আসতে পেরেছ এতক্ষণে? শয়তান! পাজী!

আমায় মুখ ভেংচানো! কিছু বলিনে তাই বাড় বেড়েছে। ভেবেছ চিরকাল অমনি পার পাবে!'

কিছু বলা নেই, কওয়া নেই, এই হঠাৎ আক্রমণে থ খেয়ে গেল ক্রিসতফ। সামলে নিতে কিছুক্ষণ লাগল। ভেবে অবাক হ'ল, দেরী হ'য়েছে একটু তার জন্য এত রাগ? ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলল:

'কি অপরাধ করেছি?'

ওর কথা না শুনেই আবার গর্জে উঠলেন ডিউক: 'চোপরাও পাজী! ছোটলোকের এত স্পর্ধা? আমায় অপমান!'

ক্রিসতফের সারা মুখ থেকে যেন রক্ত শুকিয়ে গেল। গলা বন্ধ হ'য়ে এল। অতি কষ্টে ঢোক গিলে কথা কইতে চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টার পর গলা দিয়ে স্বর বেরয়:

'মাপ করবেন। অপরাধ কি তাই তো বুঝতে পারছিনে। অপরাধটা বলছেন না অথচ মিথ্যে অপমান করছেন। এ কি ন্যায় হ'ল?'

গ্র্যাণ্ড ডিউক সেক্রেটারীর দিকে তাকান। তিনি পকেট থেকে একটা কাগজ বের ক'রে এগিয়ে দেন। ডিউকের উত্তেজনার মাত্রা শুধু রাগের ঝোঁকে চড়েনি, উৎকৃষ্ট সুরার ঝাঁঝও আছে। ক্রিসতফের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কাগজটাকে দুমড়ে মুচড়ে ওর মুখের সামনে আস্ফালন করতে করতে চিৎকার করতে লাগলেন:

'এত দূর সাহস!...এটার ওপর ঘষে ঘষে তোর নাক ভোঁতা ক'রে দিলে তবে আক্কেল হয়।'

সমাজতন্ত্রী কাগজটা চিনতে পারে ক্রিসতফ। বলে: 'কি, হয়েছে কি, তা তো বুঝতে পারছিনে!'

'কি? কি? কি বললি? মুখের ওপর কথা? এত দূর?...

বুঝতে পারছিনা! শয়তান···এই কাগজটা প্রতিদিন আমার চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করছে, যত রকমে পারে অপমান করছে। আর এটাতেই কিনা···এবারে বুঝতে পেরেছিস?'

ক্রিসতফ জবাব দেয়! 'মহামহিম, আমি এখনও পড়িইনি কাগজটা!'

'মিথ্যে কথা!' ডিউক গর্জন ক'রে ওঠেন।

'আর যাই বলুন মিথ্যবাদী বলবেন না। হাত জোড় ক'রে প্রার্থনা করছি। আমি বাস্তবিকই কাগজটা পড়িনি এখনও। আমি সমালোচনা করি। ওই আমার কাজ। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস যে-কাগজে ইচ্ছা লেখার স্বাধীনতা আমার আছে।'

'চোপরাও! অধিকার দেখাতে এসেছিস! শুধু মুখ বুজে থাকা ছাড়া আর কোনো অধিকার তোর নেই। যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেছি। যথেষ্ট দয়া দেখিয়েছি। তোর বাপ যে-ব্যবহার করেছিল, দূর ক'রে দিইনি, তোদের সাত পুরুষের ভাগ্য। না, তা করিনি। কিন্তু আজ সাবধান ক'রে দিচ্ছি, যে-কাগজ আমার এত বড় শত্রু, তার সাথে খবরদার যেন কোন সম্পর্ক না থাকে। আর হ্যাঁ, আমার অনুমতি না নিয়ে ভবিষ্যতে কিছু লিখতে পারবে না তুমি। সাবধান! সঙ্গীত সঙ্গীত ক'রে খুব নাচা হয়েছে। তোমার প্রলাপ যথেষ্ট শোনা গেছে, আর নয়। আমার খেয়ে আমার পরে, ওসব গুণ্ডামী চলবে না। মানুষকে ভ্যাংচাবে, প্রত্যেকটি খাঁটি জার্মান যা ভালোবাসবে, তা তোমার রুচবে না! ওসব চলবে না, বলে দিচ্ছি। ক্ষমতা থাকে ভালো ভালো সঙ্গীত লেখো, ভালো সুর দাও। নয়তো যা শিখেছ, তাই যথেষ্ট। আমাদের জাতীয় গৌরবকে লাথি মারবে, মানুষকে অনর্থক হেনস্তা করবে! ওস্তাদ? আমার দরকার নেই অমন ওস্তাদে।

ভগবানের কৃপায় ভালো মন্দ চেনার ক্ষমতা আমাদেরও একটু আছে। তার জন্য তোমাদের উপদেশ চাইনে। পিয়ানো নিয়ে থাকোগে; আমাদের পেছনে লাগতে এসো না।'

স্থূল দেহটা নিয়ে ক্রিসতফের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গ্র্যাণ্ড ডিউক। অত্যন্ত অপমান-জনক দৃষ্টি। ক্রিসতফকে যেন পুড়িয়ে ফেলবে। ওর মুখ একেবারে পাংশু হ'য়ে গেছে। কথা বল'তে গিয়ে ঠোঁট ছুটি শুধু নড়ে; ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বেরয় অতি কষ্টে।

'আপনার কেনা গোলাম নই আমি। আমার যা খুশি বলব, যা খুশি লিখব...'

কথা বেধে যায়। রাগে লজ্জায় ওর চোখে জল আসতে চায়, গলা ভেঙ্গে আসে। পা কাঁপে থর থর ক'রে। কনুইটার ঝাঁকানি লেগে পাশের টেবিল থেকে কি একটা সাজানো জিনিস পড়ে যায়। পরিস্থিতি অত্যন্ত হাস্যকর বুঝতে বাকী থাকে না। আশে পাশে হাসির শব্দ শোনা যায়। কক্ষের শেষ প্রান্তে দৃষ্টি চলে যায়। যেন একটা কুয়াশার জালের মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছে রাজকুমারীর চোখ কৌতুকে ঝলমল্ ক'রছে, পার্শ্বচরদের সাথে কি বলাবলি ক'রছেন। বুঝছে ওকে নিয়ে তামাসা হচ্ছে। ওর সব গোলমাল হ'য়ে যায়। ডিউকের চিৎকার ক্রিসতফের চিৎকার ছাপিয়ে ওঠে—কি যে বলছে ও নিজেই জানে না। সেক্রেটারী এবং আরেকজন কর্মচারী এগিয়ে এসে ওকে থামাতে চেষ্টা করে। ও ধাক্কা দিয়ে তাদের সরিয়ে দেয়। যে টেবিলটাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তা থেকে কখন যেন ছাই-দানটা ওর হাতে উঠে এসেছে। কথা বলার সাথে সাথে প্রবল ভাবে আস্ফালিত হচ্ছে ওটা। শুনতে পেল সেক্রেটারী বলছে:

'ওটা রাখো, রাখো!'

নিজের চিৎকারের শব্দটা কানে আসে ; আর আসে চিৎকারের সাথে সাথে ছাইদানটা টেবিলের ধারে আছড়ে ফেলার শব্দ।

রাগে আত্ম-হারা হ'য়ে গ্র্যাণ্ড ডিউক চিৎকার করেন : 'যাও, যাও। বেরিয়ে যাও বলছি! নইলে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেব।'

কর্মচারীরা ডিউককে ঘিরে দাঁড়িয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করে। অত্যধিক উত্তেজনায় চেহারাটা হয়েছে মৃগী রোগীর মত ; চোখ যেন কোটর হ'তে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। অনবরত চিৎকার ক'রে চলেছেন : 'বের ক'রে দাও, শয়তানটাকে বের ক'রে দাও।' ক্রিসতফ জ্বলে ওঠে। ওর ইচ্ছে হয় লোকটার মুখের ওপর একটা থাপ্পড় কসে দেয়। কিন্তু নানারকম বিরোধীভাবে তোলপাড় হওয়া মনে আছে লজ্জা, রাগ, কিছুটা সঙ্কোচ; রাজভক্তিও আছে। রাজাকে দেবতা জ্ঞান করা আবহমান কাল থেকেজার্মানদের মজ্জাগত। ক্রিসতফও ক'রে এসেছে এত দিন। ডিউকের সামনে মুখ তুলে কথা কয়নি কোন দিন। হাজার রকম মেশান ভাবনার তলায় ও যেন পিষ্ট হ'তে লাগল। কথা বলতে চেষ্টা করে, পারে না। নড়তে গিয়ে নড়তে পারে না। কিছু যেন শুনতে পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না। ওকে ধাক্কা দিতে দিতে বাইরে নিয়ে এল। প্রতিবাদ বেরুল না মুখ থেকে। জড়ের মত ওদের ধাক্কার মুখে ভেসে ভেসে ও বেরিয়ে এল।

ভৃত্যের দল দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সব ওরা দেখেছে। নিষ্ক্রিয় ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে ওরা। তাদের মধ্য দিয়ে ও এগিয়ে চলল। সেই ছোট ঘরটা মাত্র গজ ত্রিশেক দূর। মনে হ'ল যেন অনন্তকাল লাগবে ওই ত্রিশ গজ পেরুতে। কত লম্বা বারান্দাটা! ওটা বুঝি আর শেষ হবে না···হবে না। পারবে না ও ওটা পেরিয়ে আসতে, ওই যেখানে কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে আলো-ঝরার পালা

চলেছে নীচের আঙ্গিনায়। হোঁচট খেতে খেতে ও সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। মাথায় টুপী নেই, সে খেয়ালও নেই। দ্বারের কাছের সেই পুরানো পরিচারকটি ওকে টুপীর কথা মনে করিয়ে দিল। প্রাসাদ পেরিয়ে, বিরাট মাঠ পেরিয়ে তবে বাড়ী। অতটা যাবে কি ক'রে? ওর সারা অঙ্গ অবশ। অনেক কষ্টে শক্তি সংগ্রহ ক'রে বাড়ী এসে পৌঁছুল। টলতে টলতে দরজা খুলে ভেতরে এল; সমস্ত শরীর সাংঘাতিক কাঁপছে। দাঁত ঠক্ ঠক্ করছে দেহের কাঁপুনীতে। মা ভয় পেয়ে গেল। কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ও সোজা ওপরে চ'লে গেল নিজের ঘরে। দরজায় খিল দিয়ে লুটিয়ে প'ড়ল বিছানায়। কাঁপুনির জন্য কাপড় অবধি ছাড়তে পারল না। দম বন্ধ হ'য়ে আসতে লাগল। থেকে থেকে নিশ্বাস বেরোয় একটা দমকা হাওয়ার মত। সমস্ত দেহ যেন প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হ'য়ে গেছে …ওঃ! কেন অন্ধ হ'ল না ও! কেন পাগল হ'য়ে গেল না…যদি এই পোড়া দেহটার বোঝা বইতে না হ'তো অমন ক'রে। না থাকতো মর্যাদা-হীন জীবনের বিরুদ্ধে এই মর্মান্তিক সংগ্রাম! থাকবে না চিন্তা, বইবে না নিশ্বাস, নিরুদ্ধ-চিত্ত, নিরুদ্ধ নিশ্বাস…শুধুই তলিয়ে যাওয়া, অতল হ'তে অতলে—কোথাও থাকবেনা আর তুমি।…প্রাণপণ বলে শক্তি সংগ্রহ ক'রে, জামা কাপড় খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চাদরটা কোনো মতে টেনে নিয়ে বিছানায় লুটিয়ে প'ড়ল। চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ; ঘরে কোনো শব্দ নেই; ছোট্ট লোহার ঘণ্টাটা শুধু টালির মেজের ওপর ঝন্ঝনিয়ে উঠছে।

লুইসা দরজায় কান রেখে সন্তর্পণে ঘা দেয়; আস্তে আস্তে ডাকে। কোনো জবাব নেই। দরজাও খুলল না। নিরন্ধ্র নিস্তব্ধতার বুকে ও কান পেতে থাকে, ভয়ে ওর বুক কাঁপে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে

চলে যায়। আবার আসে। আবার কান পাতে, কিছু শোনা যায় কি না। গোটা দিনটা এমনি ভাবে যায়। রাতে শুতে যাবার আগে আর একবার আসে। রাতও যায়; সমস্ত বাড়ীখানা নিথর নিঝুম। ক্রিসতফ জ্বরে ধুক্‌ছে। ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে ওঠছে ফুঁপিয়ে। ছট্‌ফট করে, বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেনা। বারে বারে ওঠে, হাত মুঠো ক'রে প্রাচীরে ঘুসি মারে। রাত গভীর—প্রায় দু'টো হবে। পাগলের মত উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে—ঘামে সর্বাঙ্গ ভেজা, কোথায় কাপড় কোথায় কি। ও যাবে, খুন করবে গ্র্যাণ্ড ডিউককে। ঘৃণা, লজ্জা আগুন হ'য়ে ওকে গ্রাস করতে চায় সম্পূর্ণ ভাবে। সে-আগুনের তাপে দগ্ধ হয় ওর দেহ, মন, আত্মা। কিন্তু ওর ভেতরকার এই প্রচণ্ড ঝড়ের এতটুকু খবর বাইরে পৌঁছল না—একটা কথা, এতটুকু শব্দ, কিছু না। দাঁত চেপে একাই ও সংগ্রাম করে নিঃশব্দে; অত বড় ঝড়টাকে নিজের মধ্যেই ধারণ করে।

পরের দিন স্বাভাবিক ভাবে ও নীচে এল। কিন্তু ভেতরটা একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেছে। মাকে কিছু বললে না, মারও কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। পাড়ার কানাঘুষা থেকে লুইসা শুনেছে সব। সারাদিন ও বুড়ো মানুষের মত আগুনের ধারে বসে রইল চুপচাপ মাথা গুঁজে। ভেতরটা ওর জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে। কাছে কেউ না থাকলে একটুখানি কেঁদে নিত।

সন্ধ্যে বেলা সমাজতন্ত্রী সম্পাদক এলেন দেখা করতে। শুনেছেন সব। আর একটু ভাল ক'রে সবিস্তারে শুনতে চান। ভদ্রলোকের এই আসাতে গভীর সহানুভূতিশীল একখানা অন্তরের স্পর্শ পায় যেন ক্রিসতফ। যারা ওকে টেনে নামিয়েছে তাদের সবার হ'য়ে যেন তার চোখদুটি ক্ষমা চাইছে। ক্রিসতফ অভিভূত হ'য়ে গেল। অনুশোচনা

ওর নেই। আঘাতের জায়গাটাকে একেবারে খুলে দিয়ে—যে-আগুন মনের মধ্যে গুমরাচ্ছিল—তা একটি দরদী হৃদয়ের সামনে উজাড় ক'রে দিয়ে ও যেন বাঁচল। সম্পাদক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব শুনলেন। দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন, কাগজের একটা সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। ক্রিসতফ নিজের হাতে না লিখতে চায়, তিনি তবে নিজেই লিখবেন, কি আর করা যায়। তার জন্য মাল-মসলার যোগাড় চাই ক্রিসতফের কাছ থেকে। সম্পাদক মশাই ভাবেন, বিস্ফোরণ হ'য়ে রাস্তা খুলে গেল। সুতরাং এবার থেকে নিশ্চয়ই ডিউকের সভা-শিল্পী ক্রিসতফ তার বিরাট রাজনৈতিক প্রতিভা দিয়ে এবং ডিউক-দরবারের তথ্যাদি সরবরাহ ক'রে সমাজ-তন্ত্রী দলের 'মহৎ-উদ্দেশ্য' সাধনে সহায়তা করবে। মোটা ভাষায় মোটা ক'রে ইশারাটা আসে। চমকে ওঠে ও। পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় ক্রিসতফ, কিছু লিখবে তো নাইই ও, বরঞ্চ গ্র্যাণ্ড-ডিউককে কোন রকম আক্রমণ যদি করা হয়, ব্যাক্তিগত অপমান ব'লে মনে ক'রবে ও। এখন স্বাধীন ব'লেই আরও সংযত হবার দরকার ওর। এই কুণ্ঠা বুঝতে পারেন না সম্পাদক। ভাবেন ওর মনের আনা-গোনা সরু গলি দিয়ে, রাজপথের উন্মুক্তিতে নয়। সেই জন্যই ভয় পাচ্ছে ও। বললেন :

'যাকগে, ও ছেড়ে দাও আমার হাতে, নিজে লিখব আমি। তোমার ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

ক্রিসতফ অনেক অনুনয় বিনয় ক'রল, যেন কিছু না লেখা হয় কাগজে, কিন্তু নিষ্ফল। সম্পাদক-এর এক কথা; এখন শুধু ক্রিসতফকে নিয়ে কথা নয়। অপমান কেবল ক্রিসতফের নয়, কাগজ খানার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সুতরাং প্রতিকার ক'রতে হবে বৈকি। এর ওপর আর কথা চলে না। শুধু এইটুকু স্বীকার করিয়ে নিলে, কতগুলি

কথা ক্রিসতফ ওকে বলেছে, কিন্তু সম্পাদক হিসেবে বলেনি, বলেছে ব্যক্তিগত ভাবে বন্ধুকে। সুতরাং ওগুলো প্রকাশ করা হবে না। সম্পাদক বন্ধু বিনা বাক্যব্যয়ে রাজী হ'য়ে গেলেন। ক্রিসতফ বিশেষ নিশ্চিন্ত হ'তে পারল না। বড়ই নির্বুদ্ধিতার কাজ হ'য়ে গেছে ওকে সব ব'লে। ভদ্রলোক চ'লে গেলে ও যা যা বলেছে, মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল বারে বারে। শিউরে উঠল ভয়ে—কি ক'রেছে, সর্বনাশ! আর চিন্তা না ক'রে অনুনয় বিনয় ক'রে সম্পাদক মহাশয়কে একখানা চিঠি লিখল, বিশ্বাস ক'রে বন্ধু ভাবে যা ব'লেছে ও, তার মর্যাদা যেন তিনি রাখেন। [ লিখতে ব'সে কলমের ডগায় আবার বেরিয়ে এল নিষিদ্ধ কথাগুলি ]।

পরের দিন তাড়াহুড়া ক'রে কাগজখানা খুলতেই চোখে পড়ল, বড় বড় মোটা মোটা অক্ষরে ওরই কাহিনী রয়েছে একেবারে প্রথম পৃষ্ঠার অনেকখানি জুড়ে। ও যা বলেছিল, তাকে অনেক বাড়ান, বাঁকান, বিকৃত করা হয়েছে সাংবাদিকের অভ্যস্ত কৌশলে। গ্র্যাণ্ড-ডিউকের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে অত্যন্ত কুৎসিৎ ভাষায়। প্রবন্ধটির মধ্যেকার কিছু বিবরণ অত্যন্ত ব্যক্তিগত, এবং একমাত্র ক্রিসতফেরই জানা ছিল।

এই নূতন আঘাতে একেবারে মুসড়ে পড়ল ক্রিসতফ। পড়তে পড়তে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। বরফ-গলা জল যেন। সমস্তটা প'ড়ে ও একেবারে নির্বাক হ'য়ে গেল। তক্ষুণি ছুটে যাবে সংবাদপত্রের দপ্তরে। মা ধ'রে রাখলেন, খুনোখুনীর ভয়ে। ছেলের মেজাজ উনি জানেন। ওর নিজেরও যে সে ভয় ছিলনা তা নয়, ওখানে গেলেই আবার মারাত্মক আরো কিছু বোকামী ক'রে বসবে। সুতরাং গেল না। কিন্তু আর একটা চরম বোকামী ক'রে বসল।

খুব কড়া ভাষায় ব্যাপারটার প্রতিবাদ ক'রে আর একখানা পত্র লিখল সাংবাদিককে ; জানিয়ে দিল ওই লেখার সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নেই, দলের সাথেও নয়। পত্রখানা বেরুল না কাগজে।

আবার লিখল, পত্রখানা যেন বের করা হয়। ঘটনার পরদিন রাত্রিবেলা সাক্ষাতের পর যে-পত্রখানা ক্রিসতফ লিখেছিল, তার নকল এল ফিরে দফ্তর থেকে দফ্তরী-স্বীকৃতি বহন ক'রে। ওই পত্রখানাও প্রকাশ করা লেখকের ইচ্ছা কিনা, তারা জানতে চায়। ক্রিসতফ বুঝলে জালে জড়িয়েছে ভালো ক'রেই। পরের দিন দুর্ভাগ্য-ক্রমে রাস্তায় সম্পাদকের সঙ্গে দেখা। ও সামলাতে পারলে না, মুখের ওপর গালাগালি দিলে যাচ্ছেতাই ক'রে, পরের দিন কাগজে অত্যন্ত অপমানজনক ভাষায় টিপ্পনী বেরুল সম্পাদকীয় স্তম্ভে : লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলেও গোলামদের গোলামি ঘোচে না। গোলামী ওদের রক্তে...কয়লার কালো কি আর শত ধোতেন ঘোচে! এর সাথে সাম্প্রতিক আরও কয়েকটি ঘটনার বিবরণ থেকে সবাই বেশ ভালো ক'রে বুঝে নিলে ইঙ্গিতটা ক্রিসতফকে লক্ষ্য ক'রে।

ক্রিসতফের পেছনে যে কোন সমর্থন নেই একথা নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণ হ'য়ে যাওয়া মাত্র চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে যারা মাথা তুলল তারা ওর মিত্র নয়। এত শত্রু যে ওর ছিল কোথায় এতদিন, ভেবে অবাক হ'ল ক্রিসতফ়। সামনে, পেছনে, রুচি বা আদর্শ নিয়ে কোনও দিন যাদের এতটুকু বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছে, সবাই আজ দল বেঁধে সুদে আসলে প্রতিশোধ নেবার জন্য কোমর কসল। জন-সাধারণ ভারী খুশি ওর আক্কেল দেখে। নাড়া দিয়ে তাদের ঘুম ভাঙ্গাতে চেয়েছিল, বখাটে ছোঁড়া ; চেয়েছিল তাদে ররুচির সংস্কার করতে। দুটো পয়সা আছে যাদের তাদের কি তিষ্ঠুতে দিচ্ছিল

ছোঁড়া! বড় বাড় বেড়েছিল ! জলে ডোবা মানুষটাকে সবাই মিলে আরো চুবুনি দিতে লাগল।

সবাই যে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল তা নয়। প্রথম একজন একটু নেড়ে দেখতে চেষ্টা করল ; কোনও সাড়া নেই ক্রিসতফের। এবারে আঘাত আসে আরো খানিকটা জোরে, সাথে সাথে ছুটে আসে অন্যেরা। এবং এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাই। কুকুর ছানা অস্থানে অপকর্ম ক'রে যেমন ভারী মজা পায় তেমনি শুধু একটু মজা পাবার জন্যই দলে ভিড়লেন অনেকেই অর্থাৎ রাজ্যের যত অপদার্থ, মূর্খ পত্রিকা-সম্পাদকের ঝাঁক যারা মড়ার ওপর বীর বিক্রমে খাড়ার ঘা ঝেড়ে আর জিৎ 'পার্টির' গলায় মালা ঝুলিয়ে নিজের অজ্ঞতা ঢাকেন তারাই বেশী লাফাতে লাগলেন। সমালোচকরা চিৎকার ক'রে নীতির দোহাই পাড়তে পাড়তে ছুটে এলেন হন্ত দন্ত হ'য়ে।

সৌভাগ্যক্রমে কাগজ পড়েনা ক্রিসতফ। কিন্তু যেগুলো সব থেকে খারাপ ভাষায় গাল দিলে বেছে বেছে সেগুলোই পাঠিয়ে দিলে ওর কাছে ভক্তের দল। স্তূপ হ'য়ে ওগুলো প'ড়ে রইল ওর ডেস্কের ওপর। পাতা উল্টে দেখার কথাও মনে হ'ল না। চারদিকের উত্তাপ প্রায় ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছে, এমনি সময় একদিন ওই স্তূপের ওপর একটা প্রবন্ধের চারদিকে মোটা ক'রে কাটা লাল দাগটার ওপর চোখ প'ড়ে গেল। তুলে পড়ে ও আগুন হ'য়ে উঠল—ওর লাইডার নাকি বুনো পশুর গর্জন আর সীম্‌ফোনী শুনে নাকি মনে হয় পাগলা গারদের পাগলগুলোর চেঁচামেচী। ওর হৃদয় নাকি মরুভূমির শুকনো বালি, আর মন নাকি ফাঁকা গড়ের মাঠ, তাই চিন্তায় সার পদার্থ নেই। এবং সেই জন্যই নাকি ওর আর্ট হ'ল এলোমেলো খামখেয়ালী উচ্ছ্বাস আর ওর তথাকথিত হারমনি শুধু থেকে থেকে ভস্‌ভসিয়ে ওঠে,

কোনও স্থায়িত্ব নেই। সমালোচকটি সুপরিচিত। উপসংহারে লিখেছেন:

"শ্রীযুক্ত ক্রাফ্‌ট্‌ সাংবাদিক হিসেবে স্বীয় রুচি ও শৈলীর যে বিস্ময়কর পরিচয় দিয়েছেন তাতে সঙ্গীত রসিক মহলে দুর্দমনীয় কৌতুকের সঞ্চার হয়েছে। হিতৈষীগণ তাঁকে শুধু সুর-রচনা নিয়েই থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক রচনা থেকে নিঃসংশয় প্রমাণিত হয়েছে যে উক্ত পরামর্শ শুভাধ্যায়-প্রসূত হলেও বাস্তবিক সুপরামর্শ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ক্রাফ্‌ট্‌-এর পক্ষে সাংবাদিকতাই অধিকতর উপযোগী বলে অনুমিত হয়।"

প্রবন্ধটা পড়ে সারা সকাল ও কোনো কাজ করতে পারলে না। অন্য কাগজগুলোর খোঁজ পড়ল এবার। ও একেবারে যেন ভেঙে পড়ল। ঘর গোছান লুইসার বাতিক। এদিক ওদিক যা কিছু পড়ে থাকে সবই তাঁর গোছাবার ধাক্কায় কোথায় ছিটকে পড়ে। স্তূপাকার কাগজগুলো অগ্নি সহযোগে এরই মধ্যে গোছান হ'য়ে গেছে। প্রথমটায় ক্রিসতফ বিরক্ত হ'ল। কিন্তু শেষটায় ও বরঞ্চ যেন আরামের নিশ্বাস ফেলল। শেষ কাগজখানাও লুইসার দিকে এগিয়ে দিল পোড়াবার জন্য।

আরো আঘাত বাকী ছিল, এবং সেগুলো বাজল আরো তীব্র হ'য়ে। ফ্র্যাংকফার্ট-এর সুবিখ্যাত এক সঙ্গীত-গোষ্ঠীর কাছে একটা 'কোয়ার্টেট' পাঠিয়েছিল। সেটা অযোগ্য বলে বিবেচিত হয় এবং সম্পূর্ণ বিনা কৈফিয়তে ফেরত আসে। একটা ওভারচার নিয়েছিল কলোনের একটা অর্কেস্ট্রা পার্টি। মাসখানেক পরে ওটাও প্রয়োগের অযোগ্য ব'লে প্রত্যাখ্যাত হ'ল। সব থেকে বড় আঘাত এল স্থানীয় একটা অর্কেস্ট্রার কাছ থেকে। এইচ ইউফ্রাট তার পরিচালক। সঙ্গীত-শাস্ত্রে দখল আছে কিছু। যে শ্রেণীর মানুষ তার বৈশিষ্ট্য হিসাবে সম্পূর্ণ

কৌতূহল-শূন্য মন, স্বভাব অলস। এবং সেই জন্যই শুধু পুরানোর জাবর কাটে, এবং নূতন জিনিস শত ভাল হলেও ছোঁয়াচে রোগের মত শত হস্ত দূর থেকে পরিহার ক'রে চলে লোকটা। বীঠোফেন, মোজার্ট, স্যুমান-এর সঙ্গীতানুষ্ঠান করতে কখনও ক্লান্তি নেই তার, যেহেতু ওতে কোন ঝঞ্ঝাট নেই; পুরানো সুরই খানিক ঘ্যানর ঘ্যানর করলে চলে যায়। ওদিকে আধুনিক সঙ্গীত সে সহ্য করতে পারে না, অথচ তা স্বীকার করতে ভয়। সমসাময়িক শিল্পীদের সামনে খুব পিঠ চাপড়ায়। পঞ্চাশ বছরের পুরানো ঢং-এর রচনা—সে ছাই পাশ যাই হোক না কেন ও লুফে নেয় দুহাতে; অনুষ্ঠান করে সাড়ম্বরে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক শুনতে হয় জনসাধারণকে। চিরকাল তারা যেভাবে গদগদ হ'য়ে এসেছে, তার কোনও ব্যাতিক্রম নেই; ইউক্রাট-এর প্রতিষ্ঠাও থাকে অক্ষুণ্ণ। বরঞ্চ নূতন জিনিসে সনাতনী ব্যবস্থার গোলমাল হ'য়ে যায় আর যত বাড়তি ঝক্কি। তাই ওর মনটা অবজ্ঞায় আর বিরক্তিতে ভরে ওঠে। কোনও নূতন শিল্পী এলে—যদি বুঝল ধোপে টিকবে না, তাহ'লে সে বেচারা চিরকাল ইউক্রাট-এর অবজ্ঞার বস্তু হ'য়ে রইল। তার বিপরীত সম্ভাবনার স্থলে কুড়োতে হয় ওর ঘৃণা। কিন্তু যদি দেখা গেল শিল্পী শুধু দু'দিনের হাততালির মালিক নয়, রসিক সমাজে তার পাকা আসন, তাহ'লে ওই ঘৃণাই মুহূর্তে মেলায় ওর প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে।

ক্রিসতফ এখনও ঐ স্তরে পৌঁছোতে পারেনি। দেরী আছে তার। তবু কার কাছ থেকে খবর পেল ইউফ্রাট ওর একটা রচনা প্রযোজনা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অবাক হ'য়ে গেল শুনে। খবরটা শুধু অবাক হবার মতই নয়। আশাতীতও বটে। যেহেতু ভদ্রলোক ব্রাহম প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্যদের বিশেষ বন্ধু; আর ও তাদের কসে গাল দিয়েছে।

ক্রিসতফ নিজে খাঁটি মানুষ। এবং নিজের চোখের খাঁটি রং দিয়ে ও শত্রুপক্ষকে বিচার করে। ভাবে তাদের মনও ওরই মত উদার। ও বিপদে পড়েছে। তাই বুঝি এগিয়ে এসেছ ওরা হাত বাড়িয়ে। প্রমাণ দেবে বিপদের দিনে ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যার ঠাঁই নেই ওদের কাছে! ক্রিসতফ অভিভূত হ'য়ে গেল। উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইউক্রাটকে একখানা চিঠি লিখলে, সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে একটা সীমফোনী ছন্দের কবিতা। একান্ত-সচিবের মারফৎ ওপক্ষের জবাব এল; নিরাগ্রহ অথচ অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ চিঠি, ওর রচনার প্রাপ্তি সংবাদ। সাথে সাথে এও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সমিতির নিয়মানুসারে সীমফোনীটি অবিলম্বে অর্কেস্ট্রায় প্রযোজিত হবে এবং তারপর একটি সাধারণ রিহার্ষেলের অনুষ্ঠানে পরীক্ষিত হ'য়ে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের যোগ্যতা অযোগ্যতা স্থির হবে। নিয়ম নিয়মই। ক্রিসতফ শিরোধার্য ক'রে নিল। যদিও জানে এ শুধু নিয়ম-রক্ষা ওর ক্ষেত্রে। সখের সঙ্গীত বিলাসীরা বাজে মাল নিয়ে ভারী বিরক্ত করে। তাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই আসলে এসব নিয়ম।

কয়েক সপ্তাহ পরে ক্রিসতফকে জানান হ'ল, এবারে ওর সীমফোনীর পরীক্ষা-মূলক রিহার্সে'ল হবে। রিহার্সে'ল নাকি অত্যন্ত গোপনে অনুষ্ঠিত হয়, এমন কি লেখক বা সুরকারের উপস্থিতিও নিষিদ্ধ। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় সকলের পরোক্ষ প্রশ্রয়ে লেখক সর্বক্ষেত্রেই উপস্থিত থাকেন, তবে একটু গা ঢাকা দিয়ে। সবাই জানে, শুধু একটু জেগে ঘুমুবার ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট দিনে একজন বন্ধুর সাথে ক্রিসতফ এল হলে। বসল গিয়ে একটা বক্‌সের আড়ালে। অবাক হ'য়ে গেল ক্রিসতফ ভেতরের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে। নীচের তলার কোন আসনই প্রায় খালি নেই। অথচ অনুষ্ঠানটি হবে একান্তে, ব্যবস্থা এই

রকমই ছিল। নিষ্কর্মা সমালোচকের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, জটলা করছে, কথা বলছে। কিন্তু এদিকের এই আবহাওয়া উপেক্ষা করেই ওদিকে অর্কেস্ট্রা বেজে চলে।

প্রথমেই ব্রাহমের সঙ্গীত। বহু বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেছে ক্রিসতফ ব্রাহম-সঙ্গীতের। ভাবে ও তাই বুঝি এই জোর ক'রে শোনান। নিন্দে করার শাস্তি। এর পরে পর পর বাজল আরো দু'জন সুরকারের রচনা; যাদের অনেক কটু সমালোচনা ক'রে এসেছে ও বরাবর। মনে মনে হাসল ক্রিসতফ—তাহ'লে যা ভেবেছ তাই। মুখের ভাবটা বিরস হয়ে উঠলেও, মানতে হয়—শাস্তি দেবার অভিনব কৌশল বটে। সঙ্গীতের রস গ্রহণ করতে পারুক আর নাই পারুক, কৌশলটুকুর কৌতুক পুরোপুরি উপভোগ করে। ব্রাহমের সঙ্গীত শুনে শ্রোতারা উচ্ছ্বাসে হাততালি দেয়। এধারে তাদের বিদ্রূপ ক'রে হাততালি দেয় ক্রিসতফ

তারপর আসে ওর নিজের পালা। শ্রোতারা, বাজিয়েরা সবাই ফিরে ফিরে তাকায় ওর বক্সের দিকে। তারা জানে ও ওখানেই আছে। ওর বুক দুরু দুরু করে। সঙ্গীন মুহূর্ত। কঠিন পরীক্ষার সময় এ সঙ্গীত-শিল্পীদের, অমনি বুক কাঁপে সবারই। নির্দেশকের দণ্ড মাথার ওপরে ওঠে—সব শব্দ, সব যন্ত্র স্তব্ধ; বাঁধ ভাঙবার আগে সুরের বেগে জলের স্তম্ভিত প্রস্তুতি বাঁধের কূলে। উদগ্র প্রতীক্ষার শংকা-ঘন মুহূর্ত। এ মুহূর্ত সব শিল্পীর জীবনেই আসে। নিজের রচনার সুরে রূপায়ন এই প্রথম ক্রিসতফের। ওর স্বপ্ন-লোক হ'তে সুর-শিশুরা আজ প্রাণ পেয়ে নেমে আসবে মর্তের মাটিতে। কেমন ক'রে? কোন রূপে? কেমন জানি তাদের স্বর? ওদের দাপাদাপি যেন ওরই বুকের তলায় বাজে। শংকিত বক্ষে ও কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ ধ্বনি-তরঙ্গের তটে।

কিন্তু একি? শুধুই কতকগুলি এলোমেলো কোলাহল, রূপ

সংজ্ঞাহীন? ওরই সঙ্গীত? ভুল হয়নি তো? সুর-যন্ত্রের বুকে কোথায় সেই দৃপ্ত দীপ্ত সুর-ঝংকার! ইমারতের সম্মুখ ভাগকে ধারণ ক'রে রাখে বলিষ্ঠ স্তম্ভ, কোথায় সেই বলিষ্ঠ হাতের পরিবেশনা যা স্তম্ভের মত ওর সঙ্গীতটিকে ধারণ করবে! শিথিল হাতের নিরাগ্রহ আঘাতে যে-সুর জাগল তা প্রাণহীন; অতি দুর্বল। সমস্ত ইমারতটি যেন ধ্বসে পড়ে গেল। চারিদিক ধুলোয় অন্ধ হ'য়ে গেল। বুকের তলায় কান পাতে—কোথায় ওর ছন্দময়ী ভাবনা? এই কি সেই? সেই সুরের স্বপ্ন? এ যে শুধু মাতালের প্রলাপ, শুধু বীভৎস চীৎকার। লজ্জায় মরে যায় ও। ও যেন নেশা ক'রে মত্ত অবস্থায় ধরা পড়ে গেছে সকলের সামনে। না, এ ওর লেখা নয়! নয়! নিশ্চয় নয়! কিন্তু বৃথা এ ভাবনা এখন। আর পথ নেই। নির্বোধ প্রযোজক গুণীর সৃষ্টিকে এমনি ভাবে ধূলোয় লুটিয়ে দিলে— গুণীর এত বড় সর্বনাশ যে ঘটালে সে কে? এ প্রশ্ন কোনো দিন কি জাগবে না তার মনের কোণে? বুকে হাত দিয়ে বলতেই হবে—আমি, আমি সেই সর্বনেশে। শ্রোতাদের মনে এ প্রশ্ন জাগে না। প্রযোজক, গায়ক, অর্কেস্ট্রা, সকলের ওপরেই তাদের পূর্ণ আস্থা। সংবাদ পত্রের পাতার ওপরে যেমন অটল বিশ্বাস ওদের তেমনি এদের পরেও। সংবাদ পত্রের মতই এদেরও ভুল প্রমাদের উর্ধ্বে বলেই শ্রোতারা জানে। ওদের কাছে অনুষ্ঠানের যা কিছু ত্রুটি তা লেখকের, প্রযোজকের নয়। এখানকার এই শ্রোতাদের দলও এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে রাখতে চান ব'লে তাঁদের মনে সংশয় আরো কম। ক্রিসতফ নিশ্চিন্ত রইল ইউফ্রাট নিশ্চয়ই চুপ ক'রে থাকবেন না। অর্কেস্ট্রা থামিয়ে দিয়ে নিশ্চয়ই আর একবার নূতন ক'রে আরম্ভ করবেন। যন্ত্রগুলিও সব এক সাথে বাজছে না। খুশিমত চলেছেন বাজিয়েরা।

একজন আরম্ভ করলেন এক মাত্রা দেরীতে। তারপর খানিক ক্ষণ বাজিয়ে থেমে গিয়ে নির্বিকার চিত্তে তিনি বাজনা পরিষ্কার করতে সুরু করলেন। একটা বাজনা বাজলোই না; ওটার জন্য নির্দিষ্ট অংশও অতএব বাদ পড়ে গেল অবলীলায়! সব এলোমেলো বিশৃঙ্খল। সংগীত-পরিকল্পনাটি যে শিল্পীর মানস-লোকের কোনও বিশিষ্ট স্বপ্ন দিয়ে গাঁথা ছিল, তার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া গেল না। খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা, একটা কিছু সঙ্গীত-ভাবনা যে ছিল রচনার পিছনে তার ধারণা করাও কঠিন। স্থূল হাতের মোটা কাজে ক্রিসতফের কত সুদীর্ঘ দিনের কত জাগর রাত্রির সাধনা হ'য়ে দাঁড়াল একটা অর্থহীন বীভৎসতা। একি শিল্পীর হাতের রচনা! নিতান্ত মূর্খ যারা সঙ্গীতের স-ও যারা জানে না, অথবা মুখ ভেংচিয়ে লোক হাসানো যাদের পেশা তাদের হাত ছাড়া আর কারু হাত থেকে অমন জিনিস বেরুন সম্ভব নয়। ক্রিসতফ নিজের চুল ছেঁড়ে। ছুটে গিয়ে ওদের থামিয়ে দিতে চায়, বন্ধু ধরে বসিয়ে দেয়; আশ্বাস দেয় প্রধান নির্দেশক মশায় নিশ্চয় দেখে যা হোক ব্যবস্থা করবেন। যদি কেউ দেখে ফেলে ওকে তো ঠিক হবে না। কোন কিছু যদি বলে বসে তবে আরো বিপদ। টেনে ক্রিসতফকে একেবারে পেছনে নিয়ে বসিয়ে দিল। কথা মানল বটে কিন্তু হাতে মাথাটাকে ঠুকতে লাগল নিষ্ঠুরভাবে। প্রত্যেকটা বেসুর আওয়াজের সাথে সাথে ওর ভেতর থেকে একটা বুকফাটা ক্রুদ্ধ আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে চায়।

'সর্বনেশে! সর্বনেশের দল!' যন্ত্রণার আকৃতি বেরিয়ে আসে। মুঠো ক'রে হাতটা মুখের মধ্যে গুঁজে দেয় যাতে কান্নার শব্দ না বেরয়।

শ্রোতারা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। বেসুর বাজনার সাথে মিশে ভেসে আসে

তাদের অনুচ্চ কণ্ঠ। প্রথমে অস্পষ্ট গুঞ্জন তারপর···না, ক্রিসতফের সংশয় থাকে না আর, হাসি—শ্রোতারা হাসছে। ইঙ্গিতটা এসেছে বাজিয়েদের তরফ থেকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকাশ্যেই হেসে লুটিয়ে পড়ে। দেখাদেখি শ্রোতারাও উচ্চরোলে হেসে হেসে গড়ায়। তারা ভেবেছে, হাসির জিনিস এটা, অতএব হাসা কর্তব্য। হাসিটা ব্যাপক হ'য়ে সকলের মধ্যেই সংক্রামিত হ'য়ে পড়ল। সবাই হাসে, শুধু নির্দেশক স্থির গম্ভীর হ'য়ে তাল দিয়ে চলেন।

কনসার্ট শেষ হয় [উৎকৃষ্ট জিনিসেরও শেষ আছে]। এবারে শ্রোতাদের পালা। যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ওদের উল্লাস ফেটে পড়ল। কয়েক মিনিট রইল সে-বিস্ফোরণের ধাক্কা। কেউ শিস্ দিলে, কেউ ঠাট্টা ক'রে দিলে হাততালি; রসিক একজন হাঁকলে: 'আবার, আবার হোক্'; হেঁড়ে গলায় কে একজন নকল ক'রে গেয়ে উঠল; অন্যেরাও সাথে সাথে গলা মেশাল। একজন হাঁকলে: 'ওস্তাদজী কোথায়! ওস্তাদজী।' এত আমোদের খোরাক শ্রোতারা শিগগির পাননি।

নির্দেশক শ্রোতাদের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্থির নির্লিপ্ত ভাবে। ভঙ্গিটা এমনি যেন মানুষগুলোর দিকে ওর দৃষ্টি নেই! কোলাহল একটু শান্ত হ'লে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন কিছু বলবেন উনি। 'স্ স্ স্, চুপ কর, চুপ কর', ধ্বনি উঠল চারদিকে। আরও একটু থেমে বলতে লাগলেন: [স্বর নীরস, তীক্ষ্ণ, কঠিন]

'বন্ধুগণ, এই রাবিশ আমি শেষ পর্যন্ত বাজিয়ে আপনাদের কষ্ট দিতে বাধ্য হয়েছি। সঙ্গীত-গুরু ব্রাহমকে অপমান করার স্পর্ধা যিনি রাখেন সেই ব্যক্তিটির গুণের পরিচয় আপনাদের সামনে ধরতে চেয়েছিলাম শুধু।'

এই টুকু বলেই উল্লসিত শ্রোতাদের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে

গেলেন লাফ দিয়ে। পেছন থেকে ডাকাডাকি, চীৎকার। কিন্তু পিছন ফিরলেন না ইউক্রাট। বাজিয়েরা চলে গেল। শ্রোতারাও যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

চমৎকার দিনটি!

ক্রিসতফ বেরিয়েছে আগেই। হতভাগা নির্দেশক নিজের ডেস্ক ছেড়ে ওঠা মাত্রই ও ছুটে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। ইউক্রাট-এর মুখে চড় মেরে ও বুঝিয়ে দেবে। বন্ধু ধরে রাখতে চেষ্টা করে। ঠেলে সরিয়ে দিলে তাকে। আছাড় দিয়ে প্রায় ওকে নীচে ফেলে দেয় [ কারণ, এই ষড়যন্ত্রে ওরও যোগ আছে এ বুঝে নিয়েছিল ক্রিসতফ ]। ইউক্রাট ও ক্রিসতফ দুজনেরই কপাল ভালো যে মঞ্চের দিকের দরজাটা বন্ধ ছিল। প্রবল ধাক্কাধাক্কি সত্বেও ওটা খুলল না। যাই হোক, শ্রোতারাও উঠে পড়েছে। আর থাকতে পারলে না, ও পালিয়ে এল।

ক্রিসতফের অবস্থা অবর্ণনীয়। মাতাল দৃষ্টিতে হাত দুটো প্রবলভাবে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, পাগলের মত চীৎকার ক'রে আপন মনে কি যেন বলতে বলতে ও পথ চলে—অন্ধের পথ-চলা—চোখ আছে অথচ দৃষ্টি নেই। রাগে চীৎকার ঠেলে আসে গলা দিয়ে। অতি কষ্টে চাপে। রাস্তা প্রায় জন-শূন্য। কনসার্ট-হলটি গত বছর তৈরী হয়েছে শহরের প্রান্তে এই নূতন জায়গাটায়। অজান্তেই ক্রিসতফ শূন্য মাঠের মধ্য দিয়ে গ্রামের দিকে দৌড়ল। হিংস্র হ'য়ে উঠেছে ও, যে লোকটা এমন ক'রে ওকে অপমান করেছে, লাঞ্ছিত করেছে ওর অস্তিত্বকে, তাকে হাতের কাছে পেলে ও খুন করতে পারে। খুন! খুন করলেই কি ওর গায়ের কাদা ধুয়ে যাবে! থামবে শত্রুপক্ষের মুখ-বাঁকানো হাসি? এখনও যে ঝন্ ঝন্ ক'রে কানে বাজছে সেই হাসির রোল। ওরা যে সংখ্যায় অনেক বেশী। কি করতে পারত ও! ওরা

সবাই ছিল এক জোট। এমনিতে প্রতি কথায় ওরা পরস্পরের মাথা-ফাটায়, কিন্তু ওর সর্বনাশ করার জন্য, অপমান করার জন্য জোট-বেঁধেছিল সবাই। আগেই ঠিক ছিল সব। ওর ওপরে আক্রোশ ছিল সবার। কিন্তু কি করেছে ও ওদের! কি সম্ভাবনাময় ঐশ্বর্য ক্রিসতফের মধ্যে—যে-ঐশ্বর্য কল্যাণময়, যা হৃদয়ের দীনতা হরণ করে। ওই ঐশ্বর্যের খবর ও ডাক দিয়ে সবাইকে বলতে চেয়েছিল, নিতে চেয়েছিল সবার সাথে ভাগ ক'রে। ভেবেছিল ওরাও সুখী হবে ওর মত। ধরে নেওয়া যাক্ ওদের ভালো লাগেনি; মানুষটা না হয় ও খারাপই কিন্তু ওর ইচ্ছেটা যে শুভ ছিল, সে জন্যও কি এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই? ওর ভুলটা না হয় তারা দেখিয়ে দিতো। কিন্তু তা না ক'রে এমন নিষ্ঠুর মার কেন মারলে! ওর স্বপ্নকে হত্যা ক'রে, ওর কল্পনাকে বিকৃত ক'রে, দলে, পিষে, পায়ের তলায় মাড়িয়ে, কি উৎকট উল্লাস ওদের। বিদ্রূপের বাণ দিয়ে ঘায়েল ক'রে মারলে ওকে সবাই জোট বেঁধে। কেমন ক'রে পারলে? মনের উত্তাপে ওদের বিদ্বেষ ফুলে ফেঁপে মস্ত বড় হ'য়ে উঠল ওর চোখের সামনে। কিন্তু ভুল। প্রতিভাহীন মধ্যম স্তরের সাধারণ মানুষের সব ক্ষমতাই মাঝারী। খুব জোরাল রকম হিংসে করার ক্ষমতাও তাদের নেই।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে ক্রিসতফ। 'কি করেছি আমি ওদের?' গলা বন্ধ হ'য়ে আসে, মনে হয় ওর সব খোয়া গেছে। নিঃশেষ হ'য়ে গেছে সব। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে কুটিল সংসারটাকে চোখ খুলে যেদিন দেখেছিল, এমনি ক'রে কেঁদেছিল ও সেদিন।

চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল—এই তো সে-জায়গা! কয়েক বছর আগে ওর বাবা এখানেই তো ডুবেছিলেন। বিদ্যুৎ ঝলকের মত খেলে গেল মনের মধ্যে—'আমিও ডুবব।' উঠে দাঁড়াল।

খাড়া পাড়ের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে, আর একটা মুহূর্ত মাত্র। নীচে শান্ত জলের স্নিগ্ধতায় আবেশ লাগে···হঠাৎ মাথার ওপরে গাছের ডালে গান গেয়ে উঠল ছোট্ট পাখী...পাগল-করা মধু-রসের পাগলা-ঝোরা। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ও কান পাতল। জলের মিঠে মর্মর ; নরম হাওয়ার নরম আদরে দুলে দুলে পাকা শস্যের ফিস্‌ফিসানী, পপলার গাছের শিউরে-ওঠা পাতায় পাতায় কিসের মাতামাতি ; ঝোপের আড়ালে, ওই হোথা বাগানের মধ্যে মৌচাকের চারধারে উড়ে উড়ে মৌমাছিরা সুবাস-ভরা গুঞ্জনে বাতাস ভরে তুলেছে। ওপারে গরুটা বসে বসে জাবর কাটছে পরম আরামে। ক্রিসতফের উদাস চোখের কোমল দৃষ্টি ছড়িয়ে গেল চারধারে। ছোট্ট মেয়েটি—কি সুন্দর মাথা-ভরা চুল—কাঁধে একটা ছোট্ট সাজি ঝুলিয়ে বসে আছে পাঁচিলের ওপর। মেয়ে নয়ত, দেব-কন্যা। বসে বসে খালি পা দুখানি দুলিয়ে দুলিয়ে গুন্ গুনিয়ে গান গাইছে। বুকে চোখে ওর কিসের স্বপ্ন। ওদিকের ওই মাঠটায় একটা সাদা কুকুর গোল হ'য়ে কেবলি ছুটছে। ক্রিসতফ একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বসন্তে-মাতা পৃথিবীর রূপে ওর চোখ গেল ভরে ; তার গানে গানে ওর কানে মধু ঝরল। জীব-জগতের শান্তি আর আনন্দের রসে ও ডুবে গেল। পারবে, পারবে, ও ভুলতে পারবে। হঠাৎ দুই হাতে গাছটাকে জড়িয়ে ধরল ; গাছের গায়ে গাল চেপে, চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। লুটোপুটি খেল মাটিতে। ঘাসের মধ্যে মুখ গুঁজে এলিয়ে রইল। হেসে উঠল ভীরু হাসি, সুখের হাসি। জীবনের অজস্র সৌন্দর্যের সম্ভার, অফুরন্ত মাধুরীর উৎসারিত রসে ওর আত্মা কানায় কানায় ভরে উঠল। স্পঞ্জের মত সেই রস ও আপনার মধ্যে শোষণ ক'রে নিল।

'কেন তুমি এত সুন্দর ওগো পৃথিবী ? আর যারা তোমার বুকের

মানুষ, কেন তারা এত অসুন্দর ?' ভাবে ও : 'হোক্ হোক্। এই পৃথিবীকে ভালোবাসি আমি। বাসি। বাসি। বাসবো। অনন্তকাল বাসবো। এ ভালোবাসা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।' মাটির সাথে বুক মিলিয়ে পড়ে রইল। সর্ব অঙ্গ দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে, বুকের কাছে ও পেয়েছে জীবনকে পরম আলিঙ্গনে।

'ভালোবাসি, ওগো তোমায় ভালোবাসি! তুমি আমার! ওরা তোমায় আমার কাছ হ'তে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। যা খুশি ওরা করুক! মারুক! ওরা আমায় মারুক, যত পারে মারুক···জীবন তো শুধু দারুণ সুখ নিয়েই দেখা দেয় না, সে যে দুঃখের বেশেও আসে···

বুকে বল এল। আবার কাজ করতে আরম্ভ করল মাথা উঁচু ক'রে। শিক্ষিত লোকের সাথে আর নয়। ওই সাংবাদিক আর সমালোচকেরা ; আর ওই সারা শিল্প নিয়ে মুনাফা-বাজী করে, শোষণ করে যারা, ওরা শুধু কথার রাজা, কাজের নয়। না, সঙ্গীতকারদের সাথে আর লড়াই ক'রে অনর্থক সময় নষ্ট করবে না ; করুক তারা হিংসে, থাক তাদের যত খুশি অন্ধ সংস্কার। তারা চায় না ওকে ? বেশ তো, নাই চাইলে। ও-ও চায়না কাউকে—ওর নিজের কাজ আছে, তাই করবে। রাজ-দরবারের গোলামী ফাঁস থেকে ও মুক্তি পেয়েছে। বেঁচেছে ও জনসাধারণ ওর শত্রুতা ক'রে ভালোই করেছে—ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! কৃতজ্ঞতার নমস্কার রইল তাদের উদ্দেশ্যে। তারা দুষমনী করেছে বলেই না ও পথের নিশানা খুঁজে পেলো।

লুইসা সর্বান্তকরণে সমর্থন করে। কোনো উচ্চাশা নেই তার। জন্ম নয় তার ক্রাফট বংশে ; ক্রিসতফের বাবা বা ঠাকুর্দার মত নয় লুইসা। ছেলের জন্য সম্মান বা যশ কিছুই চায় না সে প্রতিদিনের অশান্তির

এই কঠিন মূল্যে। নইলে চায় বইকি লুইসা! চেয়েছিল ছেলে বড়লোক হোক, তার যশ ছড়াক দিকে দিকে।

গ্রাণ্ড ডিউকের সাথে ওই বিশ্রী ঝগড়ায় লুইসা খুব কিছু অস্থির হয়নি। কিন্তু ছেলের কষ্ট দেখে ওর বুক ভেঙ্গে গেছে। 'রিভিউ' এবং খবর-কাগুজেদের সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়াতে বরঞ্চ লুইসা খুশি হয়েছে। ছাপা কাগজকে অনেকটা সন্দেহের চোখে দেখে লুইসা। শুধু সময় নষ্ট আর শত্রু-বাড়ান বই তো নয়! 'রিভিউ' ওয়ালাদের সাথে ক্রিসতফের কথাবার্তা অনেক সময় লুইসা শুনতে পেয়েছে। সব যেন উগ্র চণ্ডী! কি সাংঘাতিক ওদের কথার ধরণ। কি রাগ! সর্বদাই ওরা মার-মুখো হ'য়ে আছে। কেউ ওদের চোখে ভালো নয়। যে ভাষা ওরা সকলের সম্বন্ধে প্রয়োগ করে তা সাংঘাতিক। ওদের কথার ধার যত বাড়ে ততই ওদের আনন্দ। দু'চোখে ওদের দেখতে পারে না লুইসা। অবিশ্যি ওরা পণ্ডিত মানুষ, বুদ্ধির জাহাজ। কিন্তু হৃদয় হীন, দয়া মায়া নেই। বাঁচা গেছে, ওদের খপ্পর থেকে যে ছাড়া পেয়েছে ছেলেটা। কি উপকারটাই করছিল ওরা! এ শুধু লুইসার খেয়াল নয়। ভাবালু মেয়ে নয় ও। গভীর বিচার বুদ্ধি দিয়েই ও অশুভটাকে দেখেছিল।

ক্রিসতফ বলে: 'আমায় যা খুশি বলে বলুক, যা খুশি লিখুক। গ্রাহ্য করিনে। আমি আমি হব, আমি থাকব। ওরা ঠেকাবে কি ক'রে? ওদের আর্ট, ওদের আইডিয়া দিয়ে আমার কি হবে? আমি মানি না ওদের।'

মানিনে বলে বিশ্ব-সংসারকে উড়িয়ে দিতে পারা যায় মুখে। কিন্তু চ্যাংড়া ছেলের গুমর অত সহজেই সংসার মানবে কেন? ক্রিসতফ সাচ্চা মানুষ, কিন্তু ও ভুল করেছে, চিনতে পারেনি নিজেকে। ও

সন্ন্যাসী নয়, সংসার ছেড়ে বৈরাগী হবার মত মন নয় ওর। প্রথমে কষ্টটা তত টের পায়নি ; সৃষ্টি-রসে ও মসগুল হ'য়ে রইল। কোনো অভাব বোধ রইল না। কিন্তু হাতের কাজ একদিন শেষ হ'ল। উন্মাদনার জোয়ার ঝিমিয়ে এল অবকাশের ভাঁটিতে। চারদিকে তাকায়, কোথাও কেউ নেই, অরণ্যের নৈঃসঙ্গ থৈ থৈ করে—শিউরে ওঠে ও। নিজকে শুধায়, কেন এই লেখা। যতক্ষণ মানুষ লেখে, কেন লেখা সে নিজেই জানে না ! তখন শুধু লেখা। তারপর শুধু স্রষ্টা আর সৃষ্টি মুখোমুখি। অন্তরের যে প্রেরণায় বিশ্বকর্মার যন্ত্র চলেছে এতদিন, কর্মান্তে যখন তা স্তব্ধ হ'ল, স্রষ্টা অবাক হ'য়ে ভাবে, এ আবার কি ? নিজের সৃষ্টিকে চিনতে পারে না নিজেই। এ যেন কোন অচেনা নূতন। ঠেলে দিতে চায় এক পাশে ; ভুলতে চায়। পারে না। রূপ দেবে, আনবে পৃথিবীর আলোয় সাধনার ধনকে। যন্ত্রের বুকে বুকে লহর তুলে ওর মানস-লোকের অমূর্ত বাণী লোক চক্ষুর সম্মুখে রূপ-পরিগ্রহ করবে ; নয়ত কাগজের বুকে ছাপা হরফের পথে বাণী আপন পথ খুঁজে নেবে। নইলে ওর শান্তি নেই। মন অহর্নিশ তোলপাড় হয়। ভুলবে কি ! ওর মনে হয়, মায়ের সাথে নাড়ীর বন্ধনে বাঁধা ! জীবন্ত প্রত্যক্ষ হ'য়ে সত্মজাত শিশুর মতই ওর দেহের রক্ত-মাসের সাথে জড়িয়ে আছে ওর মানস-লোকের সন্তানেরা। নাড়ী কেটে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে না নিলে শিশু যেমন বাঁচে না, ওর মনে হয় বন্ধন কেটে, ওর কাছ থেকে সরিয়ে না নিলে তারাও বাঁচবে না। বাঁচবে না ওর বুকের তলা থেকে জন্ম নেওয়া ওই সুর-শিশুর দল। ওরা যে বাঁচেও না, মরেও না। এ যে বিষম দায়। যতই ও সঙ্গীত রচনা ক'রে চলে, আপন-সৃষ্টির বোঝা ততই ভারী হ'তে থাকে। শয়নে, স্বপ্নে, জাগরণে ওই এক চিন্তা ওকে আচ্ছন্ন

ক'রে রাখে। এ থেকে ওকে মুক্তি দেবে কে? মাঝে মাঝে কি এক অচেনা আবেগে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে ওর সুর-শিশুরা; পাগল হ'য়ে ওঠে, ভাঙবে এই নাড়ীর বন্ধন, স্রষ্টার মানস-লোকের প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে, আপনাদের উড়িয়ে দেবে, ছড়িয়ে দেবে আত্মায় আত্মায়, চিত্তে চিত্তে—হাওয়া যেমন বীজকে ফলের বন্ধন ভেঙ্গে ছড়িয়ে দেয় অনন্ত বিশ্বের বুকে। এমনি বন্ধ্যা হ'য়ে, নিশ্চলতার আঁধারে বন্দী হ'য়ে আর কতকাল কাটবে ওর? বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে ক্রিসতফ।

থিয়েটর, কনসার্ট প্রতিটি পথ আজ বন্ধ হ'য়ে গেছে। যে-সমস্ত পরিচালকরা একবার ওকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছে, দ্বিতীয়বার ও যাবে না তাদের কাছে, মরলেও। সুতরাং এখন এক উপায়, রচনাগুলো ছেপে বের করা। কিন্তু অর্কেস্ট্রা পাওয়ার চাইতে প্রকাশক পাওয়া সহজ হবে এমন ভরসা ও করতে পারলে না। বার কয়েক কিছুটা চেষ্টা ওর মোটা ধরনে করল ও। আর নয়। স্থির ক'রল ওই মুনাফা-বাজদের হাতের পুতুল হ'য়ে ওদের পিঠ-চাপড়ানি সহ্য করবে না আর। নিজের খরচেই ছাপবে। নিছক পাগলামো। সম্বলের মধ্যে ছিল প্রাসাদ থেকে যে-মাইনেটা পেত তা, আর কয়েকটা কনসার্ট থেকেও কিছু কিছু আসত; এ থেকেই যা একটু সামান্য বেঁচে ছিল। এখন সব পথ বন্ধ। একটু হিসেব পত্র ক'রে খরচ পত্র ক'রে দুঃসময়ের সম্বলটুকু না খোয়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ হ'ত। কিন্তু ও সে দিক দিয়ে তো গেলই না। উপরন্তু যা হাতে আছে তাতে ছাপবার সমস্ত খরচ কুলোচ্ছে না দেখে ধার ক'রে বসল। লুইসা সাহস ক'রে কিছু বলতে পারলে না। ছাপার হরফে নিজের নামটা দেখার জন্যে এমন ভাবে টাকা নষ্ট করাটা খুব সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ নয় ব'লেই তিনি জানেন। তবু ছেলেটা হয়ত

ঠাণ্ডা হ'য়ে ঘরে থাকবে, মায়ের বুকের কাছে। এই ভেবে খুব খুশিই হ'য়ে উঠল লুইসা।

সাধারণের কাছে সহজে বোধগম্য, যা শুনতে তারা ভালোবাসে, শুনে আরাম পায়, এমন জিনিসে ও হাত দিলে না। খাতা থেকে বেছে বের করলে যেগুলো একেবারেই ওর নিজস্ব ধরণে লেখা। এগুলোই সব থেকে ভালো রচনা ওর মতে। পিয়ানোর উপযোগী 'লাইডার' মেশান টুকরো টুকরো কতগুলি সঙ্গীতের সমষ্টি। কোনটা আকারে খুব ছোট, সাধারণ চলতি ঢংএর। কতগুলি আবার বেশ লম্বা-চওড়া, অনেকটা নাটকীয় ধাঁচের। সবগুলোতে মিলে কখনও আনন্দোচ্ছল, কখনও অতি শান্ত কোমল নানা ভাবের দ্যোতনা দিয়ে গাঁথা যেন একখানি মালা। একটা পিয়ানোর গৎ, একটা গান—শুধু গলায়, অথবা বাজনা সহ—এমনি ক'রে সাজানো পর পর। এ সম্বন্ধে ওর নিজের কথা হচ্ছে : 'যখন স্বপ্নে ডুবে থাকি, যা ভাবি সব ব্যক্ত করতে পাইনে ; ব্যথা পাই, আনন্দ পাই, কিছুরই ভাষা পাইনে খুঁজে। কিন্তু এক এক সময় অস্থির হ'য়ে উঠি। বুকের মধ্যে যে ঢেউএর মাতামাতি চলে, যেমন করেই হোক একটা ভাষা দিতে না পারলে যেন আর বাঁচিনে। তখন আপনিই গান বেরিয়ে আসে। কি যে পাই জানিনে, কি যে তার ভাষা তারও ঠিক থাকে না। অস্পষ্ট ভাঙ্গা-চোরা কথাই শুধু হয়ত কয়েকটা। অথবা কথাও নয় ; অর্থহীন, বাঁধুনি-হীন, শুধু কতগুলি ধ্বনি মাত্র। কখনও হয়ত আর একটু দানা বাঁধে ; হয়তো, পুরোপুরি চরণ, বা আস্ত কবিতাও এক আধটা বেরিয়ে আসে। তার পরেই হয়তো আবার স্বপ্নে ডুবে যাই। এমনি ক'রেই আমার দিন যায়। তাই আমার দিনের ভাবনার দানাগুলোই এর মধ্যে গেঁথে তুলতে চেষ্টা ক'রেছি। কিন্তু শুধুই গানে আর আলাপে

কেন দিলাম তার রূপ ? এর চাইতে বড় ফাঁকিও নেই আর, হয়তো অমন চমৎকার সঙ্গতিও আর কিছুতে নেই। সমস্ত আগল ভেঙ্গে আত্মার পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ অবারিত ক'রে দেওয়া চাই। সেই প্রয়াসই পেয়েছি আমি।' বইথানির নাম দিলে ও "একটি দিন", তার বিভিন্ন অংশের আবার বিভিন্ন নাম—যা ওর আভ্যন্তরীণ চিন্তাধারার একটা ধারাবাহিক পরিচয় বহন করে। উৎসর্গের পাত্র, সময়, নাম সবই রহস্যাবৃত—হয়তো কোনো প্রেরণার মুহূর্তের অথবা কোনো প্রিয়জনের স্মরণে ; হাস্যোচ্ছলা কোরিন, বা বিষাদময়ী সেবাইন, কে জানে সেই অপরিচিতা ফরাসিনীই বা হবে—যার উদ্দেশ্যে ওর এই ভালোবাসার নিবেদন ! একমাত্র ওই তার হদিশ জানে।

আরো ত্রিশটি লাইডার বেছে নিল। এগুলো ওর সব চেয়ে বেশী পছন্দ, অতএব শ্রোতাদের অপছন্দ সুনিশ্চিত। সঙ্গীত হিসেবে যেগুলো শ্রুতি-মধুর সে-গুলোকে ও সরিয়ে রাখলে, বেছে নিলে যার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। [ বৈশিষ্ট্যের ওপর জনসাধারণের সব চেয়ে বেশী ভীতি, বৈশিষ্ট্যহীন মামুলী জিনিসে ওরা সহজে খুশি হয় ] …

লাইডারগুলো লিখলে সাইলেশিয়ার সপ্তদশ শতাব্দীর দুই কবির অনুকরণে। দৈবাৎ একখানা সংকলনে এই কবিদের লেখা ও পড়ে এবং তাদের অকৃত্রিম হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়। ত্রিশ বছর বয়সে অকালে ফুরিয়ে গেল প্রতিভার বরপুত্ররা। একজনের নাম পল ফ্লেমিং, সে ককেসাস আর ইসপাহানে ঘুরে বেড়িয়েছে, আত্মাটিকে রেখেছে সমস্ত মালিন্য থেকে উর্ধ্বে ; যুদ্ধের বীভৎস বর্বরতা আর তৎকালীন ব্যাপক দুর্নীতির মধ্যে অসীম দুঃখ সয়েও হৃদয়টি ছিল শান্তির উন্মুখী হ'য়ে। দ্বিতীয় হলেন জোহান ক্রিশ্চিয়ান গাস্থার। প্রতিভাবান মানুষ। কিন্তু ভার-সাম্য ছিল না প্রতিভায় ; ছন্নছাড়া জীবনকে

সে উড়িয়ে দিয়েছিল হাওয়ায়। যে-পথ বেছে সে নিয়েছিল সেটা পিছল পথ। জীবন ওর ক্ষয়ে গেছে গ্লানিতে আর অবসাদে। যে-ভগবান মানুষের শক্তি হরণ ক'রে তাকে শুধু মারেন নিষ্ঠুর হাতে, তার বিরুদ্ধে গাম্বারের কণ্ঠে গর্জে উঠেছিল বিদ্রোহের আগুন। সেই আগুন ঠিকরে পড়ল ক্রিসতফের লেখায়। তারি সাথে রইল ফ্লেমিং-এর প্রেমের কবিতার মিঠে সুর আর হাল্কা ছন্দ। ও তো ছন্দ নয়, যেন খুশি বুকের দোলা। কবির 'তারার প্রতি' কবিতাটি ওর হৃদয় স্পর্শ করে। প্রতিদিন প'ড়ে প'ড়ে ওর তৃপ্তি নেই। যেন ওর সকাল বেলাকার আরাধনার মন্ত্র। ওই কবিতাটির মধ্যেকার প্রশান্ত-বীর্যের সুরটুকু মূর্ত হ'য়ে উঠল ক্রিসতফের সঙ্গীতে।

ধর্ম-গত-প্রাণ পল জারহাউএর আশার সুরটি ক্রিসতফের মার-খাওয়া জীবনের 'পর যেন সুধা ঢেলে দেয়; ও যেন এখানে একটা আশ্রয় খুঁজে পায়। কবির পরিশুদ্ধ অন্তরের স্বপ্নে বিশ্ব-প্রকৃতি ধরা দিয়েছেন ভগবান রূপে। ক্রিসতফ মুগ্ধ হ'য়ে যায়। ওই কাঁচা-সবুজে ছাওয়া মাঠে, বালুর বুকে নাচন জাগিয়ে কুল কুল ক'রে বয়ে চলেছে ছোট্ট নদীটি, জলের ধারে ধারে টিউলিপ আর সাদা নারসিসাসের ভিড়ের মধ্যে আনাগোনা করছে সারসের দল···কি গম্ভীর তাদের চাল। স্বচ্ছ নীলের বুকে পাখা মেলে দিয়েছে সোয়ালো আর ঘুঘু পাখীরা; বৃষ্টির সাথে রবি-রশ্মির নাচন; ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে উঁকি মারে আলোয় নাওয়া আকাশ; সন্ধ্যার গম্ভীর মহিমা; শান্ত হ'য়ে গেছে গৃহপালিত পশুরা, অরণ্য কুঞ্জ বন, মাঠ···সব যেন শান্তির মহা পারাবারে অবগাহন ক'রে উঠেছে; ভগবানের প্রসন্ন দৃষ্টির স্নিগ্ধতা ঝরে পড়েছে ঐ রূপে রূপে। মরমী কবির কতগুলি কবিতা প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও ধর্ম-সঙ্গীত হিসেবে প্রচলিত।

গির্জায় গাইবার জন্যই ওগুলো রচিত হয়েছিল। ক্রিসতফ এগুলোর সুর দেবার জন্য ভারী ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। কবির আসল উদ্দেশ্য ছিল কবিতাগুলোর বৈশিষ্ট্যে। হত্যা ক'রে হালকা গানের খুশির ঝমঝমে সুর দিয়ে বসল। তাঁর 'খৃষ্ট পথিকের গানের' স্বকীয় সুরটি ঢেকে ফুটে উঠল উৎকট স্পর্ধা; তাঁর 'নিদাঘ-সঙ্গীতের' স্নিগ্ধ ধারাটি নূতন সুরে ভর ক'রে টগবগিয়ে ছুটে চলল পাহাড়ী ঝরণার মত। বেঁচে নেই কবি। নয়তো দেখলে ভয়ে শিউরে উঠতেন জারহাউ।

সঙ্কলন বেরুল; সাধারণ বুদ্ধিটুকুও খরচ করেনি ক্রিসতফ। প্রচার ও প্রকাশের ভার দিলে এক প্রতিবেশীকে। এত বড় কাজের কোন যোগ্যতা নেই ভদ্রলোকের শুধু প্রতিবেশী এই পরিচয় ছাড়া। ছাপার কাজ চলল বহু মাস ধ'রে। ভুল সংশোধন করতে মাশুল যা লাগল তার পরিমাণ ভয় পাবার মত। ক্রিসতফ কিছু জানতেও পারলে না। যা আন্দাজ ক'রেছিল, মোট খরচ পড়ল গিয়ে তার দেড় গুণ। ছাপা শেষ হ'য়ে যখন হাতে এল বই, দেখা গেল সে এক রাজ-সংস্করণ। হকচকিয়ে গেল ও, এটাকে নিয়ে এখন কি করবে ও ভেবে পেল না। বাজারে এই প্রকাশকের আওতা ছোট। তার ওপরে সে প্রচার করার পরিশ্রম করলে না। একদিকে লেখকের গুমর, আর এক দিকে প্রকাশকের নিষ্ক্রিয়তা। প্রকাশক যখন এসে বললে ক্রিসতফকে: 'ভালো ক'রে একটা বিজ্ঞাপন লিখে দিন', সে জবাব দিলে: 'না, বিজ্ঞাপন দিয়ে মাল চালাবে না সে। যদি বিকোয় সে আপন দামে আপনি বিকোবে।' সসম্ভ্রমে লেখকের ইচ্ছা শিরোধার্য ক'রে চলে গেল প্রকাশক; বই চ'লে গেল তার গুদামে; সযত্নে রাখা রইল বাক্সে। ছ'মাসের মধ্যে এক খানা বইও বিকোল না।

ওদিকে বই ছাপতে গিয়ে ওর ভাণ্ডারে যে বিরাট গহ্বরটির সৃষ্টি

হ'ল, সেটাকে ভরাট করার পথ খুঁজতে হ'ল। একদিকে দৈনন্দিন অন্নসংস্থান, আর এক দিকে ঋণ পরিশোধ। ও যেন চোখে অন্ধকার দেখে। ঋণের অঙ্কটা আন্দাজী হিসেবকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে, আর যে-টাকা পাবে ব'লে আশা ক'রেছিল, তার অংক গেছে নেমে। তাহ'লে কি লোকসানটা ঘটালো ও না জেনে? না হিসেবেই ভুল? [ সামান্য যোগও নির্ভুল করতে পারে না ] কেমন ক'রে টাকাগুলো গেল সেইটে এখন অবান্তর, যেমন ক'রেই হোক টাকা গেছে এবং গেছে যে তাতে আর সন্দেহ নেই। ছেলেকে বাঁচাবার জন্য লুইসাকে সর্বস্ব উজাড় ক'রে দিতে হ'ল। অনুশোচনার অন্ত থাকে না ক্রিসতফের; ভাবে যত শিগ্‌গির মায়েরটা মাকে ফিরিয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। টুইশানী খোঁজে। জনসমাজের সহানুভূতি ও হারিয়েছে। যেখানে যায় প্রত্যাখ্যান। ছাত্র মেলে না। গ্লানিতে ভ'রে ওঠে ক্রিসতফের মন। কেউ বললে—এর চাইতে কোনো ইস্কুলে শেখাও। অন্ধকারে যেন আলো পায়। লাফিয়ে ওঠে ও।

পাদ্রীদেরই স্কুল, কিন্তু পুরোপুরি নয়। মালিক চতুর, গানের গ না জানলেও বুঝলেন ক্রিসতফ দামী মাল, অবস্থা গতিকে বিকোচ্ছে সস্তায়। কাজেই ভারী মোলায়েম ক'রে গদগদ স্বরে খুব সস্তা দামই হাঁকলেন। ক্ষীণ আপত্তি জানায় ক্রিসতফ। উত্তরে শোনে: পদটা সরকারী নয় বলেই দরটা বাজার দরের অনেক ওপরে।

কাজে লেগে গেল ক্রিসতফ। স্কুলের ছাত্রদের গান শেখানর কাজ। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। তাও সে যাহোক ক'রে চলে এক রকম। কিন্তু বড় মুস্কিল ছেলেগুলোর বাপ মায়েদের নিয়ে। কি শিখলে ছেলেরা দেখাও তাদের, নইলে বিশ্বাস হয় না কারো। প্রত্যেকেই চান

উৎসবে, অনুষ্ঠানে, দশের আসরে তাঁর ছেলে গাইবে। ছেলেও ঐ বাহবাটুকুই চায়। ক্রিসতফ চোখে অন্ধকার দেখে। কিন্তু উপায় নেই। উপায় তো নেই, কিন্তু সান্ত্বনা কোথায় ? এযে আগাগোড়া শুধু ফাঁকি, শুধু বিড়ম্বনা! বিবেকের দংশনে ক্ষত বিক্ষত হয় ওর সত্যনিষ্ঠ আত্মা। এমনি ক'রে শুধু দিন-গত-পাপক্ষয় করতে ওর হাত ওঠে না। ওরই মধ্যে যথাসাধ্য ভালো ক'রে শেখাতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করে রুচি ফিরুক ওদের। সঙ্গীতের রস যে কি বস্তু তা চিনতে শিখুক। কিন্তু শিখবে কে? শিষ্যের দল শুধু হাততালির কাঙ্গাল : শিল্প-সাধনা তাদের নয়। তাই সাড়া পায় না গুরু। ভালো গান হ'লে তাই গুরু ওদের ধ'রে বেঁধে বসাতে পারে না। ওর কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না তারা। অনুভূতিহীন বালখিল্যদের ইস্কুলী পাঠ শেখাবার জন্য জন্ম হয়নি ক্রিসতফের। জানেওনা ইস্কুলী বিদ্যে শেখাবার ফন্দী ফিকির। সুতরাং একেবারে সঙ্গীতের মূল সংজ্ঞা বোঝাতে বসে পোড়োদের। ভালো লাগে না তাদের। বোঝেও না কিছু। মুখ ভ্যাংচায় আড়ালে গুরুকে। আত্ম-ভোলা গুরুর খেয়াল নেই। পিয়ানোর প্রথম পাঠ দেবে—বাজিয়ে চলল বীঠোফেনের সীমফোনি। ছাত্রকে বলে—বাজাও সাথে সাথে। ফল অনুমেয়। রাগে ফেটে পড়ে ও। ছাত্রকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, নিজে বাজাতে থাকে—ডুবে যায় কোন রসের সাগরে। প্রাইভেট ছাত্র-ছাত্রীদের বেলাও ওই একই ধারা। ফ্যাসনেবল য়্যারিস্টক্র্যাট পাড়ার তরুণী রূপসী মানী ছাত্রীকে বলেই বসে হয়তো : 'আপনার ঝিটার হাতও আপনার চেয়ে ভালো।' হয়তো বা কোনো ছাত্রীর মাকে লিখে বসল : 'আপনার মেয়েটিকে শেখানোর চাইতে মাটি কাটায় মেহনত কম। অত মেহনত আমার সইবে না। পৈত্রিক প্রাণটার মায়ায় কাজটি ছাড়তে বাধ্য

হচ্ছি, মাপ করবেন।' লাভের মধ্যে দু'চার মাসের বেশী আর কোন ছাত্র ছাত্রী টেঁকে না। মা বোঝান কত। নিজেও ভাবে ব'সে ব'সে কেন এমন হয়। মার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয়, আর যাই করুক স্কুলের চাকুরিটা ছাড়বে না কিছুতে। সামলেই চলে স্কুলে। একটি দিনও দেরী করে না। কিন্তু সওয়ারও সীমা আছে। গানের ক্লাশে গাধা ছেলেটা জলের মত সহজ জিনিসটাকে বারংবার ভুল করছে। ধৈর্য থাকে কতক্ষণ? স্কুলের অনুষ্ঠান হবে। হুকুম হ'ল ফরমায়েসী একটা কোরাস গান শেখাতে হবে ছেলেদের। (গান নির্বাচনের অধিকার নেই ওর। বিশ্বাস নেই ওর ওপর কারো) অর্থহীন, নিতান্ত তৃতীয় শ্রেণীর একটা গান। এ বিড়ম্বনা আর যেন সইতে পারেনা ও। তবু মুখ বুজে থাকে। কঠিন সংযমে ধৈর্য ধরে শিখিয়ে যায় ফরমায়েসী রাবিশই। কিন্তু বুকের ভেতরে আগুন জ্বলে। সারা সত্তা বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। কোন এক অতর্কিত মুহূর্তে বদ্ধ মুষ্টি নিরুদ্ধ ক্রোধের আবেগে আছড়ে পড়ে টেবিলের ওপর। চমকে ওঠে ছেলের দল। মাঝখানে থেমে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ক্রিসতফ:

'ওরে থাম তোরা থাম। কান আমার গেল। তার চাইতে শোন বসে, হ্বাগনার বাজিয়ে শোনাচ্ছি।'

ছেলেরা ফাঁক পায়। পেছনে বসে তাস খেলতে শুরু করে। টিকৃটিকির অভাব নেই। অধ্যক্ষের কানে সংবাদ পৌঁছোতে দেরী হয় না। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন ওকে ওর কাজ—ছাত্রদের সঙ্গীত-প্রীতি বর্ধন করা নয়, সঙ্গীত শেখান। বকুনি খায়, ভেতরটা ওর কুঁকড়ে যায়। তবু মাথা নিচু ক'রে শোনে, পাছে চাকুরিটি যায়। ক'বছর আগে ওর ভবিষ্যৎ ছিল রাঙ্গা, ছিল ধ্রুব নক্ষত্রের মত নিশ্চিত, সমুজ্জ্বল। তবু সেদিন ছিল ও কাঁচা মাটি। আজ কঠিন সাধনায় সে-মাটি থেকেই

বেরিয়ে এসেছে খাঁটি জহর। অথচ আজের দিনেই এমনি ক'রে বিড়ম্বনার পাঁকে মুখ থুবড়ে থাকা! হায়রে ভাগ্য!

ইস্কুলের কাজ যা হোক এক রকম লাগে। কিন্তু ভারী খারাপ লাগে ওর সহ-কর্মীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে হাজিরে দেওয়া। ঐটেই নাকি রেওয়াজ। বড় অপমানজনক মনে হয়। তবু যেতে হয়। গেছেও ক'জনের বাড়ী। কিন্তু লোকগুলোকে ওর পছন্দ হয় না একটুও। বিতৃষ্ণায় আপাদ-মস্তক যেন বিষিয়ে থাকে। কারো বাড়ীতে পা বাড়াতে আর প্রবৃত্তি হয় না। ওর হাবভাব চাল চলনে মনে মনে বিরক্ত হন অনেকে—বিশেষ ক'রে যারা এযাবৎ নির্বিচারে পূজা পেয়েছেন সবার কাছে। কেউ কেউ বা চোখ লাল করেন ভারী অপমান হ'ল বলে। বিদ্যায় বুদ্ধিতে পদে ক্রিসতফকে সবাই ছোট বলে মনে করে। ফলতঃ ওর প্রতি তাদের ব্যবহারটা অভিভারকী চালের। দিন রাত ঐ একটা কথা শুনতে শুনতে নিজের সম্বন্ধে কেমন একটা হীনতা-বোধ হ'য়ে যায় ক্রিসতফের। ওদের সামনে নিজেকে সত্যি বোকা বোকা মনে হয়। বলবার মত কথা খুঁজে পায় না। কি বলবে! ওরা শুধু মাষ্টার—তার বাইরে ওদের আর কোন সত্তা নেই। ওরা যে মানুষ সে-কথা বুঝি ভুলেই গেছে। এমনি ডুবে গেছে ওরা ওদের পেশা-গত জীবনে। ওরা আজ মজ্জায় মজ্জায় শুধু মাষ্টার। ওরা মানুষ না হ'য়ে শুধু পুঁথি হ'লো না কেন? না, পুঁথিও নয়, শুধু ভাষা-তত্ত্বের নোট।

ক্রিসতফ এড়িয়ে চলে ওদের, যাতে দেখা না হয়। কিন্তু একেবারে পালিয়ে বেড়াবার সাধ্য কি ওর? মাসে একদিন স্কুলের বড় কর্তার বাড়ী গিয়ে সেলাম দিতে হয় সবাইকে। এটা অবশ্য-পালনীয়। প্রথম বার ক্রিসতফ চুপচাপ গা ঢাকা দিয়েই রইল। ভাবলে নগণ্য

মানুষ, অনুপস্থিতিটা ভিড়ের মধ্যে লক্ষ্য হবার কথা নয়। কিন্তু হিসেবে ওর ভুল হয়েছিল। সেই থেকে এমনি বড় রকম লক্ষ্যণীয় হ'য়ে রইল যে কোন অজুহাতেই আর পালাবার সাধ্য রইল না ওর। মাও বোঝালেন অনেক ক'রে। অতএব পরের বার ও যাওয়াই ঠিক করল। কিন্তু যাবার সময় মুখ দেখে মনে হ'ল যেন কারো অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় শ্মশানে যাচ্ছে।

শুধু এদের ইস্কুলেরই নয়, শহরের অন্য স্কুলের মাষ্টার মশায়রাও এসেছেন সপরিবারে। ছোট্ট ঘরখানায় গাদাগাদি হ'য়ে ব'সতে হয়েছে; তবু ওরি মধ্যে পদানুসারে দল ভাগ করেই বসেছেন সবাই। ক্রিসতফের দিকে একবার তাকালও না কেউ। কাছাকাছি দলটা শিক্ষা, রন্ধন-প্রণালী নিয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। মাষ্টার-গৃহিণীরা রান্না বিষয়ে নিজ নিজ মৌলিক আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন। পত্নী-গরবে গরবী স্বামীরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন সাড়ম্বরে। অপর পক্ষে পতিদের পাণ্ডিত্য প্রচারে নিরত পতি-গরবিণীদের কল-কণ্ঠের গুঞ্জনে কক্ষখানি মুখরিত। ক্রিসতফ একটা জানালার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কোন দিকে যে তাকাবে বেচারা বুঝতে পারছে না। কখনও বোকার মত হাসতে চেষ্টা করে, কখনও বা একেবারে মূর্তির মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুখ গোমরা ক'রে। ভারী বিরক্ত লাগে। মরে যেতে ইচ্ছে করে। কিছুটা দূরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি মেয়ে। তারও অবস্থা ক্রিসতফের মতই। দু'জনের চোখ ঘরের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়। এতক্ষণ ওরা পরস্পরকে লক্ষ্য করেনি। আবহাওয়াটা অসহ্য হ'য়ে উঠছে দুজনেরই। হঠাৎ হাঁই তুলবার জন্য মুখ ফেরাতে গিয়ে চোখে চোখ প'ড়ে যায়। চার চোখ একসঙ্গে মিশে যায় গভীর

এক প্রীতি-ভরা বোঝা-বুঝিতে। ক্রিসতফ একটু কাছে সরে এল। মেয়েটি চুপি চুপি বলে :

'কেমন, মজা লাগছে না বেশ ?'

ক্রিসতফ পেছন ফিরে জানালা দিয়ে মুখ বের ক'রে জিভ বের ক'রে ভ্যাংচায়। হেসে গড়িয়ে পড়ে মেয়েটি। হঠাৎ খেয়াল হয়, পাশে বসতে ইঙ্গিত করে ক্রিসতফকে। পরিচয় করিয়ে দেবার কেউ নেই, অতএব নিজেদেরই সারতে হয় ও পর্ব। ঐ ইস্কুলেরই প্রকৃতি বিজ্ঞানের নবাগত প্রফেসর রাইনহার্টের স্ত্রী ইনি, এখনও কারো সঙ্গে পরিচয় হয়নি। চেহারায় রূপসী নন ; নাকটা খুব উঁচু, কিন্তু দাঁতের সারি সুদর্শন নয়। চেহারায় নেই দীপ্তি। কিন্তু দীপ্তিমান চোখ দুটি দর্শনীয়। হাসিটি ভারী মিঠে, ভালোবাসা ভরা। পাখীর মত কলকল ক'রে কথা বলতে লাগল মেয়ে। ক্রিসতফ শান্ত ভাবে সংযত হ'য়ে জবাব দেয়। সভাস্থ জীবদের নিয়ে সরস সমালোচনা করতে করতে হেসে লোটায় দু'জনে। চারপাশে মানুষ, শুনতে পাবে সবাই, গ্রাহ্যি নেই। এতক্ষণ বেচারারা এক কোণে অনাহূতের মত অবহেলা বয়ে চুপচাপ ছিল দাঁড়িয়ে। ক্ষণিকের দৃষ্টি-প্রসাদও পায়নি কারো। ওরা যেন ছিলই না এখানে। কিন্তু এখন চারদিক থেকে সবগুলি রক্ত চক্ষু ওদের যেন বিঁধতে লাগল। এত ঢলাঢলি ! রীতিমত বেহায়াপনা। কিন্তু মানুষ দুটোর কোন বৈলক্ষণ্য নেই। এতগুলো রক্তচক্ষুর বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই তাদের। বরঞ্চ ওদের চোখ মুখ যেন বলছে —কেন, এতক্ষণ না ভারী তুচ্ছ করেছ আমদের ! এখন কেমন মজা ?

শ্রীমতী রাইনহার্ট স্বামীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বেহদ্দ কুৎসিৎ চেহারা। ফ্যাকাশে মুখ, তাতে আবার বসন্তের দাগ। চোখে

মুখে কঠিন অভিজ্ঞতার ছাপ ; কিন্তু তার সাথে মিশে আছে একখানি অতি কোমল হৃদয়ের ভাষা।

ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র ক'মাস। প্রথম প্রেমের গভীরতা ওদের চোখের আর মুখের ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় ভাষায়ই উচ্চারিত। সকলের সামনে ওরা নিঃসঙ্কোচে অন্তরঙ্গ হ'তে পারে। কিঞ্চিৎ হাস্যাস্পদ হ'লেও কেমন জানি প্রাণস্পর্শ করে। ক্রিসতফের নৈশ-ভোজের নিমন্ত্রণ হ'ল নূতন বন্ধুদের বাড়ী। ক্রিসতফ ক্ষমা চায়—বড় ক্লান্ত দেহে-মনে। বাড়ী ফিরে সটান গিয়ে শুয়ে পড়বে। শ্রীমতী রাইনহার্ট অমনি ছাড়বার পাত্রী নন। অমন মানসিক অবস্থায় একলা থাকার সম্ভাবিত বিপদের আশংকায় শিউরে উঠেন। ক্রিসতফের আপত্তি টেঁকে না। গভীর নৈঃসঙ্গের মধ্যে এই সহৃদয় সহজ মানুষগুলোকে পেয়ে যেন বেঁচে গেল ও। ওরই মত নিতান্ত সাধারণ মানুষ। আড়ম্বর নেই, অহংকার নেই ; কেমন যেন বিনা ডাকেই কাছে যাওয়া চলে।

প্রফেসরের ছোট্ট বাড়ীখানাও মালিকের মতই ; তার অনাড়ম্বর শ্রীর মধ্যে ভারী মনোরম একটি আত্মীয়তার ছন্দ। বাড়ীখানি যেন কথা কয়, সর্বত্র তার নীতির বাণী। প্রতিটি আসবাব, বাসনপত্র যেন খুশিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেবলি বলছে দু'হাত বাড়িয়ে : 'ওগো পরম অতিথি, এসো এসো, সু-স্বাগত! কুশল তো বন্ধু।' সোফার উপরকার শক্ত গদিটিও যেন গুন্‌গুনিয়ে বলে উঠল :

'মাত্র দু' দণ্ডের জন্য এলে, বন্ধু ?'

কফির পেয়ালাটিও যেন বলে :

'আর একটুখানি নাও না!'

সুস্বাদু খাবার ভরা প্লেট। খানিকটা যেন নীতি নীতি গন্ধ। এ ছাড়া রান্না ভালোই। একটা প্লেট যেন বলে উঠল :

'ভেবে চিন্তে কাজ করো, নইলে জীবনে সিদ্ধি নেই।'

আর একটা বললে :

'বুঝলে, ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতায় দুনিয়া বশ।'

ক্রিসতফ ধুমপান করে না, তবু টেবিলের ওপরকার ছাই-দানটি যেন পরম অন্তরঙ্গতায় দু'হাত বাড়িয়ে দিলে :

'সিগারেটগুলো জ্ব'লে পুড়ে মরে। আমার বুকেই তাদের আশ্রয়। চিনতে পারলে আমায় ?'

হাত ধুতে গেল ক্রিসতফ। সাবান-দানীর মধ্যে সাবানটা যেন বললে : 'সুস্বাগত, হে সুন্দর !'

তোয়ালেখানা বুঝি বলার মত কিছু হাতড়ে পেলে না, অথচ তার মুখ নিস্‌পিস করছে। ক্রিসতফের মনে হয়, খুব প্রাসাঙ্গিক না হ'লেও বিজ্ঞের মত যেন বলছে তোয়ালে : 'প্রাতঃকালের সৌন্দর্য যদি উপভোগ করতে চাও তবে খুব ভোরে উঠবে।'

ক্রিসতফ পাথরের মত বসে থাকে চেয়ারে, নড়তে ভয় করে। কোথা থেকে আবার কোন উপদেশ তেড়ে আসবে। ওর বলতে ইচ্ছে হয় :

'চুপ কর, রাক্ষসের দল, চুপ কর। তোদের কথা আমি বুঝতে পারছি না। তোরাও আমায় বুঝতে পারছিস না।'

হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত হেসে ওঠে ও। গৃহস্বামীকে বোঝায়, স্কুলের কাণ্ড-কারখানার কথা মনে ক'রে ওর হাসি পেয়ে গেছে। সত্যি কথা ব'লে বেচারাদের আঘাত দিতে ও চায় না। যাই হোক খানিক ক্ষণের মধ্যেই ও সামলে ওঠে। অদ্ভুত আবহাওয়ায় মানিয়ে নেয় নিজকে। এত দরদ-ভরা মন এদের, বেশ লাগছে মানুষগুলোকে। রুচি হয়ত নেই, কিন্তু বুদ্ধির পরিমার্জনা আছে। নূতন জায়গা ; রাইনহার্টরা যেন থৈ পায় না। ছোট্ট শহর হ'লে হবে কি—কট্টর

কারখানী আইন। তুমি এলে আর অমনি সমাজের একজন হ'য়ে বসলে, সে হবার জো নেই। কারখানার মত রীতিমত আবেদন কর, তারপর তার বিবেচনা হবে, তবে তোমার টিকিট মিলতে পারে। এক-টুকুতেই এখানকার হাওয়া চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। নূতন যারা এল, পুরানোদের প্রতি তাদের ব্যবহারের বিশেষ কতগুলো বিধি প্রচলিত আছে। এখনও রাইনহার্টরা তা রপ্ত করে উঠতে পারেনি। প্রফেসর হয়ত চুপচাপ মেনে নিত সব। কিন্তু শ্রীমতী রাইনহার্ট অত সহজে অনুচিতকে শিরোধার্য করার মেয়ে নন। দেখাই যাক না। কর্তব্য-পালন একটু রয়ে সয়েই হোক। ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হ'লেও, ওরই মধ্যে একটু যাদের ভালো ব'লে মনে হয় তাদের বাড়ী গিয়ে বিহিত প্রথম সাক্ষাৎ করতে লাগল। এই ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই ওদের লিষ্টির লেজুড়ে গিয়ে পড়লেন। নীরবে ফুঁসতে লাগলেন তাঁরা এই অনুচিত স্পর্ধায়। এঞ্জেলিকা রাইনহার্টকে (স্বামী ডাকে লিলি ব'লে) নিয়ে যত ফ্যাসাদ। দুরন্ত জংলী মেয়েটার স্বভাব আর শোধরায় না—ব্যবহার কিছুতেই ড্রইংরুমী কেতায় উচিত মত আনুষ্ঠানিক হ'য়ে ওঠে না। ও মুক্ত, সহজ। হোমরা-চোমরাদের সাথেও ওর আলাপনে এমনি অন্তরঙ্গতার সুর বাজে যে রাগে তাদের মুখ লাল হ'য়ে ওঠে। ওর রসনার বাঁধন থাকে না। মনে যেমনি যে-কথা উঠল, অমনি সেটি বলা চাই। তর্ক করে, বোকার মত কথা বলে; আর তাই নিয়ে আড়ালে সবাই মুখ বাঁকিয়ে হাসে। আবার রাগে যখন,—রাগতেও পারে তেমনি—রীতিমত ভয়ংকর হ'য়ে ওঠে। তাই ওর শত্রু বাড়ে প্রতিদিন। এবং তারা ওকে ক্ষমা করে না। অনুচিত কথা একটা বলেই জিভ কাটে লজ্জায়; মনে মনে গাল দেয় জিভটাকে। কিন্তু তখন আর শত গাল দিয়েই বা হবে কি। স্বামী শান্ত, গম্ভীর ভালো

মানুষ। ভয় পান স্ত্রীর প্রগল্‌ভতায়; মৃদু তিরস্কার করেন। কিন্তু দুষ্টু মেয়ে ছুটে গিয়ে স্বামীর গলা ধ'রে চুমু খায়; যেন কতই লজ্জিত হয়েছে এমনিভাবে বলে: 'সত্যি বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে। ঠিকই বলেছ তুমি। আর কক্‌খনও হবে না, দেখে নিও।' কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। তার পরেই যে কে সে। একেবারে ক্রিসতফেরই দোসর।

যে-সব কথা ওর বলা উচিত নয়, তা উচিত নয় ব'লেই বেশী ক'রে সর্বক্ষণ ব'লে হাস্যাস্পদ হয়। যখন তখন জার্মানী আর ফ্রান্সের চাল চলনের তুলনা করাও লোক হাসানোর ওর আর একটা কৌশল। ও নিজে জার্মান [ এবং অত্যন্ত গোঁড়া ]। কিন্তু বড় হয়েছে আলসেস্‌এ ও ফরাসী আলসেশিয়ানদের মধ্যে। সেখানকার ল্যাটিন সভ্যতার প্রভাব এড়াতে ও পারেনি। অধিকৃত দেশগুলির অধিবাসী অধিকাংশ জার্মানই পারেনি। এমন কি সবথেকে মোটা চামড়ার লোকের পক্ষেও সে-প্রভাব এড়ান সম্ভব হয়নি। আবার বিয়েও হল ওর এক জার্মানের সঙ্গে। সেই থেকে স্বামীর সাথে জার্মান সমাজেই বাস। দুই ভিন্ন-মুখী স্রোতের মধ্যে পড়ে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটল, খুব সম্ভবতঃ তারই ফলে ল্যাটিন সভ্যতার প্রতি ওর আকর্ষণ এত উগ্র হ'য়ে উঠেছে।

ক্রিসতফের সাথে প্রথম আলাপেই ওই পুরানো প্রসঙ্গ পেড়ে বসল। ফ্রান্সের স্বচ্ছন্দ সুন্দর আলাপন ভঙ্গিটি ওর বড় ভাল লাগে। ক্রিসতফেরও ভালো লাগে। কোরিনই ক্রিসতফের ফ্রান্স···নীল ঝলমলে চোখ; হাসি-মাখা অধর, সহজ দিলখোলা ব্যবহার, সুধা-ঝরা কণ্ঠ। আরো আরো জানতে চায় ক্রিসতফ—সবখানি জানতে চায়। এমন ক'রে আর কারো সাথে মতের মিল হয়নি। আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে লিলি। বলে: 'কেন যে আমার ফরাসী বান্ধবীটি চ'লে গেল! কি করবে, সইতে পারলে না ও, তাই চলে গেল।'

মুহূর্তে কোরিনের ছবি মুছে যায়। দেশলাইএর কাঠিটি হঠাৎ নিভে গেলে আঁধার আকাশের গায়ে স্তিমিত-দীপ্তি তারার দল যেমন ঝলমল ক'রে ওঠে, তেমনি ক'রে আঁধার পটভূমিকায় ফুটে উঠল আর একখানি মুখ, আর দুটি চোখ।

চম্‌কে ওঠে ক্রিসতফ। বলে: 'সেকি? সেই ছোট্ট খাটো গভর্ণেস মেয়েটি?'

লিলি রাইনহার্ট বলে: 'সে কি? তুমিও চেন নাকি তাকে?'

ক্রিসতফ বর্ণনা দেয়। একেবারে মিলে যায় দু'খানি ছবি। ক্রিসতফ বলে: 'চিনতে তুমি? বল, বল, আমায় বল সব তার কথা। যা জান সব বল।'

লিলি রাইনহার্ট বলে ঃ অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিল ওরা। দু'জনের মাঝে কোন আড়াল ছিল না। কিন্তু তবু বিশেষ কিছু জানে না ও তার সম্বন্ধে। ঘটনাক্রমে এক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে দু'জনের দেখা হয়। লিলিই এগিয়ে গিয়ে আলাপ করে। নেমন্তন্নও করে বাড়ীতে। সেই থেকে বন্ধুত্ব। তারপর আরো বার দুই এসেছিল ওর বাড়ী। ভারী চাপা মেয়ে, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ওর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতে পারেনি লিলি। ওর নাম আঁতোয়ানেৎ জ্যানে। সাতকুলে না ছিল কেউ, না ছিল গাঁটে কানাকড়ি। থাকার মধ্যে ছিল একটি ভাই। প্যারীর এক নির্বান্ধব বোর্ডিং ইস্কুলে থেকে পড়ত সে। ছেলেটা ওর চোখের মণি। বলার মধ্যে এক ওই ভাই-এর কথাই বলত। ভাই-এর কথা বলতে বসলে ওর আর মনের আগল থাকত না। দরদ দিয়ে শুনত লিলি। অমনি ক'রে ও মেয়ের মন পায় ও। ভাইয়ের পড়ার খরচ জোগানর জন্যই বিদেশে চাকুরী নিয়ে যায় আঁতোয়ানেৎ। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারত না। এ বিচ্ছেদে

হু'জনেরই ভারী কষ্ট হ'ত। চিঠি পেতে দুটো দিন দেরী হ'লে ভেবে ভেবে দু'দিকে দু'জনে শয্যা নিত। ভাই এর অমঙ্গল আশংকায় সর্বদাই যেন কাঁটা হ'য়ে থাকত অাঁতোয়ানেৎ। দুদিকে দু'জনেরই সমান অবস্থা। ব্যথায় দিদির বুকখানা সর্বদা ভ'রে থাকত। ছোট ভাইটি কোন্ দূরে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে এই ভাবনাই শেলের মত ওর বুকে বাজত। কেবলি মনে হ'ত ভাইটির অসুখ ক'রেছে। মুখ-চোরা ছেলে নিশ্চয় কাউকে বলেনি। অনেক সময় এসব বাজে ভাবনার জন্য লিলি ওকে বকেছে; অনেক বুঝিয়ে তবে ওকে শান্ত করত। কিন্তু সেই বা কতক্ষণ! অাঁতোয়ানেৎ-এর বাড়ী-ঘর আত্মীয় স্বজন, কেবা আছে, ও কি করে না করে তার কিছুই জানতে পারেনি লিলি; ওর মনের ভেতরটাও লিলির অজানাই র'য়ে গেছে। লাজুক মেয়ে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে জড়সড় হ'য়ে যেন নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেত। যতটুকু ও দেখেছে—চমৎকার কালচার্ড, বুদ্ধিমতী দীপ্তিমতী মেয়ে। ঐটুকু বয়সেই জীবনকে পুরোপুরি চিনে নিয়েছে। অত্যন্ত সরল, সহজ ধর্মভাবাপন্ন মেয়ে। দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন। সহজে ওকে ঠকান যায় না। যে পরিবারে কাজ করত, ভারী কড়া মায়া দয়াহীন লোক তারা। খুব কষ্ট পেত ওখানে ও বেশ বোঝা যেত, কিন্তু মুখে কখনও কিছু বলেনি। শেষ পর্যন্ত কেন যে চলে গেল অাঁতোয়ানেৎ তা লিলি জানে না; ওরা ওর নামে যা তা কুৎসা রটিয়েছে। এনজিলিকা এক বর্ণও বিশ্বাস করেনি। শুধু শুধু মিথ্যে কলংক রটানো হয়েছে মেয়েটার নামে। ছোট শহর, লোকগুলোর তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, শুধু নিরীহ লোকের গায়ে কাদা ছিটানো। করুকগে, বয়েই গেল। কে ওদের তোয়াক্কা রাখে! তাই না?'

'নিশ্চয়ই!' মাথা নীচু ক'রে জবাব দেয় ক্রিসতফ।

'তাইতেই চ'লে গেল বেচারী।'

'যাবার সময় তোমাকে ব'লে গেছে কিছু ?

'এমন কপাল, ঠিক ঐ সময়েই ক'টি দিনের জন্য বাইরে যেতে হ'ল আমার। যাবার সময় দেখা হ'ল না। ফিরে এসে দেখি ছোট একটু চিঠি লিখে রেখে গেছে। যাচ্ছে সেই খবর, আর ধন্যবাদ। কোথায় যে গেল ঠিকানাটা অবধি দেয়নি।'

'আর চিঠি পত্র লেখেনি ?'

'না।'

নীরব রাত্রির কালোর আড়ালে আর একবার সেই বিষাদ-ছাওয়া মুখখানি মিলিয়ে গেল। ভেসে উঠল অপসৃয়মান ট্রেণের জানালায় শেষ বারের মত দেখা সেই শুকতারার মত চোখ দু'টি।

ফ্রান্স সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে ক'রে লিলি রাইনহার্টকে ও অস্থির ক'রে তোলে। ও নিজে ফরাসী দেশ চর্ম-চোখে দেখেনি কখনও। কিন্তু ওর ভাবে ভঙ্গিতে সে কথা বোঝে কার সাধ্য। শ্রীযুক্ত রাইনহার্ট অবশ্যি ফ্রান্স সম্বন্ধে স্ত্রীর চাইতে বেশী খবর রাখেন। স্ত্রী বেশী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলে তিনি রাশ টানতে যান। কিন্তু বাধা পেয়ে লিলি আরো মুখর হ'য়ে ওঠে। মুগ্ধ হ'য়ে ক্রিসতফ শুধু শোনে রহস্যময়ী ফ্রান্সের কথা।

ফরাসী বইয়ের ছোট্ট একটা লাইব্রেরী আছে রাইনহার্টদের। তাতে আছে কিছু স্কুল-পাঠ্য বই, কিছু উপন্যাস, আর পাঁচমিশেলী বই খান কতক। বইগুলো পড়ার অবাধ অধিকার পেয়েছে ও। কিন্তু ও জানে না ফরাসী ভাষা। অদম্য জ্ঞান-পিপাসা নিয়ে শুধু ভাবে ক্রিসতফ লাইব্রেরীর দিকে তাকিয়ে, কত বড় সম্পদ ও মুঠোর মধ্যে পেয়েছে।

তুলে নিলে একখানা স্কুল পাঠ্য বই। নানারকম লেখার সংকলন।

রাইনহার্ট বলেছে, যদি সত্যি সত্যি ফরাসী সাহিত্যের কমল বনে প্রবেশাধিকার চায় ক্রিসতফ তবে স্কুল পাঠ্য বই দিয়েই শুরু করতে হবে। যারা ওর চাইতে বেশী জানে, অগাধ শ্রদ্ধা তাদের ওপর ক্রিসতফের। তাদের কথা ওর কাছে বেদবাক্য। পড়তে আরম্ভ ক'রে দিল সেই দিন থেকেই। যে ঐশ্বর্য হাতের কাছে পেয়েছে তাকে পুরো ক'রে চিনে নিতে হবে যে।

ক্রমে প'ড়ল থিওডোর আরী বারো, ফ্রাঁসোয়া পেতে দ্য লা ক্রোয়া, ফ্রেদরিক বদ্রী প্রভৃতি ফরাসী লেখকদের লেখা। প'ড়ল কবিতা পীয়েরে লাসমবোদে, অাঁদ্রে ভঁা হাসেল, অাঁদ্রো, মাদাম কোলে, গুস্তাভ নাদো, হিউগো, সেনেদোলে আদি কবির কাব্য। কাব্যের বিপুল প্রবাহের মধ্যে ও হারিয়ে যায়; শুধু হারিয়ে নয়, ডুবে একেবারে তলিয়ে যায়। তারপর ফেরে গদ্যের দিকে। তার আকাশ জুড়ে ফ্লেশিয়ে, ফার্দিনা-এদোয়া বুইসোঁ, মেরীমি, ভলতেয়ার, লামে-ফ্লোরি, দ্যমা, রুসো, মিরারো, ক্লেয়ারতিয়ের মত সাহিত্যিকেরা জ্যোতিষ্কের মত জ্বলছেন। আছেন ম্যাক্সিমিলিয়ে, শ্যামস ফ্রেদরিক পেল-এর মত বিদগ্ধ সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক। আরেকখানা সংকলনের মধ্যে নূতন জার্মান সাম্রাজ্যের ঘোষণা পত্রখানিও আছে দেখল। জার্মানদের সম্বন্ধে ফ্রেদরিক রুগমোর লেখাও রয়েছে। লিখেছেন তিনি, উন্নত স্তরের জীবন যাপন করবার জন্যই জার্মান জাতির জন্ম। ফরাসীদের মত লঘু বা চপল নয় তারা। গরীয়ান তার আত্মা, গভীর তার মরমী হৃদয়ের ভালোবাসা। অত বড় পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল, চরিত্রবান ও দীর্ঘায়ু-সম্পন্ন জাতি সংসারে বিরল। শিল্পে জার্মানীর প্রতিভা জন্মগত। অন্যান্য প্রত্যেক দেশের মানুষ সংকীর্ণ স্বাদেশিকতা-সম্পন্ন; কিন্তু বিশ্ব-প্রেমী জার্মান জাতি সমগ্র মানবতাকে বক্ষে ধাধণ করে।...

আর পড়তে পারে না ক্রিসতফ। বই বন্ধ ক'রে ফেলে। বিস্ময়ে ও স্তব্ধ হ'য়ে যায়, কেমন যেন অবসাদ আসে। ব'সে ব'সে ভাবে, ফরাসীরা বড় ভালো লোক ; কিন্তু ভারী দুর্বল চরিত্র।

আরেক খানা বই তুলে নেয়—আর একটু উঁচু স্তরের। হয়তো বা উঁচু ক্লাশের পাঠ্য। অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের লেখা দ্বারা বইখানি সমৃদ্ধ। কিন্তু লেখা ও লেখকের নির্বাচনে বিশেষ যেন একটা পক্ষপাত দেখা যায়। অবশ্য ভাষা এখনও এতটা আয়ত্ব হয়নি ওর ; বুঝতে বেশ কষ্ট হয়। অনেক সময় ধৈর্যচ্যুতি হয়। ইচ্ছে হয় বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। মনে হয় কোনো দিন বুঝি আর শেষ হবে না ওই অর্থহীন কালির আচড়গুলো।

কিন্তু ধীরে ধীরে অর্থের আভাস ফুটে ওঠে। একটা তীক্ষ্ণ-ধার আলোর ছুরি যেন কেটে বসে বুকের মধ্যে। এখানে ওখানে শব্দগুলো বাংময় হ'য়ে ওঠে। যে-সংশয় প্রথম হয়েছিল, দেখা যায় তা মিথ্যে নয়। সংকলয়িতা জার্মান ; সম্ভবতঃ ফরাসী লেখকের আপন জবানিতেই ফ্রান্সের চেয়ে জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এবং ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই অনুরূপ লেখা বাছাই করেছেন ভদ্রলোক। আত্ম সমালোচনা বিষয়ে ফরাসীরা অকুণ্ঠ। স্বদেশের ক্ষুদ্রতম গলদেরও বিচার করেছে ওরা নির্মম হ'য়ে। প্রতিপক্ষের ভালোকে সামনে তুলে ধ'রে তার পরিপ্রেক্ষিতে ওরা আত্ম-দর্শন করেছে। জার্মান সংকলয়িতা ফরাসী জাতির চারিত্রিক এই বলিষ্ঠতার সুযোগ গ্রহণ করতে ছাড়েন নি। ভাবেননি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনন-শীল ব্যক্তির কাছে এ প্রচেষ্টা বিপরীত সাক্ষ্যই দেবে। এবং তাই ক্রিসতফের কাছে ফরাসীদের এক নব পরিচয় উদ্ঘাটিত হ'য়ে গেল। শত্রুকেও অকুণ্ঠ চিত্তে প্রশংসা করার

মত এত বড় ঔদার্য, অমন নির্ভীকভাবে আত্ম-উদ্‌ঘাটন এবং আত্ম-বিশ্লেষণ ও আর দেখেনি। মুগ্ধ হ'য়ে গেল ও।

মিশেলে অকুণ্ঠ-চিত্তে দ্বিতীয় ফ্রেদরিকের গুণগান করেছেন। লঁাফ্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ট্রাফালগার যুদ্ধ-রত ইংরেজদের উদার প্রশস্তি। ফরাসীরা নেপোলিয়নকে যে ভাষায় গাল দিয়েছে, তার শত্রুরাও পারেনি তা। মলিয়েরের চাবুক, আর লা ফঁতের তীক্ষ বিদ্রূপের আঘাত পড়েনি ফ্রান্সএ হেন বস্তু নেই। অভিজাতশ্রেণী ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছে বোয়ালোর ক্ষুরধার শ্লেষে। ভলতেয়ারের অগ্নিক্ষরা বাণী গর্জে উঠেছে লড়াইএর বিরুদ্ধে ; রেয়াত করেননি ধর্মকে অবধি, এমনি কঠিন তিরস্কারে জর্জরিত করেছেন নিজের জন্ম-ভূমিকে। আবার সাধারণ লেখক, সমালোচক মহলে সমালোচনা করতে গিয়ে উলঙ্গ সত্য ভাষণের প্রতিযোগিতা পড়ে গেছে। বাহাদুরী নিতে গিয়ে শ্লীলতার সীমা লংঘিত হয়েছে ; লঘু-গুরু জ্ঞান, মর্যাদাবোধ একেবারে জলাঞ্জলি গেছে। রীতিমত অরাজকতা ঘটেছে সাহিত্যের জগতে। ভালো মানুষ গোছের জার্মান-সম্পাদকেরা ভয় পেয়েছেন অনেক সময়।

কিন্তু ক্রিসতফের ভালো লাগে এই অনাবৃত সত্যের ঔদার্য। ধাক্কাও খায় সময় সময়। কারণ শত হলেও ও জার্মান। উদারতম-দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন জার্মানেরও এতটা স্বাধীনতা সইবে না। যেখানে যে-ভাবেই থাকুক, জার্মানরা নিয়ম-শৃংখলায়ই অভ্যস্ত। ক্রিসতফ দিশেহারা হ'য়ে পড়ে মাঝে মাঝে। তবু পড়ে পুঁথির পর পুঁথি। মন রসাপ্লুত হ'য়ে ওঠে। ক্ষণে ক্ষণে যেন সে-দিনের বিপ্লবের পাগলা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগে চোখে মুখে।

লুইসা শোয় পাশের ঘরে। এক ঘুমের পর জেগে দেখে ছেলের ঘরে আলো। দেয়ালে টোকা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে : 'ওরে তোর

অসুখ-বিসুখ করেনি তো?' ওর ঘরে চেয়ার সরানোর শব্দ হয়। বেরিয়ে আসে ক্রিসতফ একটা মোমবাতি আর খোলা বই হাতে, মুখ ফ্যাকাশে, রাত্রিবাস পরা, অতি গম্ভীর অদ্ভুত মুখের চেহারা। লুইসা ভয় পেয়ে উঠে বসে বিছানায়, পাগল হলো কি ছেলে? ক্রিসতফ হাসতে থাকে, বাতি শুদ্ধ হাত নেড়ে মলিয়ের-এর লেখা নাটকের একটা জায়গা আবৃত্তি করতে থাকে জোরে জোরে। মাঝপথে একটা কথার আধখানা মুখে রেখেই হঠাৎ হেসে লুটিয়ে পড়ে। তারপর মায়ের পায়ের কাছে ব'সে হাঁপাতে থাকে। হাতের বাতিটা কাঁপে ওর হাসির সাথে। মার মুখ থেকে উদ্বেগের কালো ছায়াটা স'রে যায়। কঠিন স্বরে ধমকে ওঠেন ছেলেকে:

'কি হচ্ছে এসব শুনি? এই মুহূর্তে শুতে যা বলছি, এক্ষুণি যা।... মাথাটি খাচ্ছিস? এর পর তো পাগল হবি!'

আবার আরম্ভ করে ক্রিসতফ: 'শোনই না! এটুকু শুনতে হবেই তোমায়।' মায়ের পাশে ব'সে প্রথম থেকে পড়তে আরম্ভ ক'রে নাটকখানা। কোরিন যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে—ভেসে আসে তার কৌতুকোচ্ছল, তীক্ষ্ণ, ভরা কণ্ঠস্বর।

লুইসা বাধা দেয়: 'যা বলছি উঠে, এক্ষুণি যা। ঠাণ্ডা লাগবে শেষটায়। জালিয়ে খেলি। যা, ওঠ শিগগির! আমার ঘুম পেয়েছে।'

বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই ক্রিসতফের। সে পড়েই চলে। গলার স্বর পর্দায় পর্দায় চড়ে। সাথে সাথে হাতের প্রবল আস্ফালন নাটকীয় ভঙ্গিতে। হাসিতে ওর দম বন্ধ হ'য়ে আসে: 'আঃ বলোনা ছাই, চমৎকার না জায়গাটা?'

মা কানে আঙ্গুল দিয়ে পেছন ফিরে শোন চাদরে মুখ ঢেকে।

বলেন: 'উঠলি লক্ষ্মীছাড়া ছেলে?' মনে মনে হাসেন ছেলের হাসি শুনে। ক্রিসতফ নাছোড়বান্দা। হাল ছাড়তে হয় লুইসাকে শেষ পর্যন্ত। ক্রিসতফ পড়া শেষ ক'রে শুধায়:

'ঠিক বলো দেখি এবারে, ভালো লাগল কিনা; বল না—।' জবাব আসে না। ঝুঁকে পড়ে দেখে মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। মৃদু হেসে মাকে আলতো ক'রে চুমু খেয়ে, আলতো ক'রে মাথায় হাতখানা বুলিয়ে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে যায়।

রাইনহার্টদের লাইব্রেরী থেকে আরো বই নিয়ে এল। নানা রকমের বই আছে সেখানে। নির্বিচারে গো-গ্রাসে গিলতে থাকে একদিক থেকে। কোরিন আর সেই পরিচয়হীনার দেশের মাটিকে ও একান্ত ক'রে ভালোবাসতে চায়। ওর অফুরন্ত উদ্যম, ওর বিপুল জীবন বেগ পথ খুঁজে পায় ফরাসী সাহিত্যের অমৃত লোকে। নিতান্ত সাধারণ সাহিত্যের মধ্যেও ও রত্নের সন্ধান পায়; এমনি কথা বা এমনি লাইন হঠাৎ হাতে ঠেকে, প'ড়ে মনে হয় উদার হাওয়ায় বুকটা ভ'রে গেল।

ক্রিসতফ তার নূতন বন্ধুদের বাড়ী প্রায়ই যায়; কথাবার্তা কয় খাওয়া দাওয়া করে। লিলি রাইনহার্ট-এর আন্তরিক আদরে ও মুগ্ধ। ওর জন্য নিজের হাতে রাঁধে সে ষোড়শোপচারে। অবশ্য এ ব্যাপারে ক্রিসতফই চরম লক্ষ্য নয়। এক হিসেবে ও উপলক্ষ্য মাত্র। কারণ, ঠাকরুণ নিজে রসনা-বিলাসিনী। ক্রিসতফের রসনা-রঞ্জনের সাথে তার মনোরঞ্জনও করে সে গভীর স্নেহে। জন্ম-দিনের দিন নিজের হাতে নানা কারুকার্য ক'রে চমৎকার একখানা কেক বানিয়ে ওকে উপহার দিলে। শুধু এই নয়। ক্রিসতফের কল্যাণ-কামনায় উন্মুখ হ'য়ে থাকে রাইনহার্টরা। সঙ্গীতের একটি বর্ণও জানে না দু'জনের কেউ। তবু

অকৃত্রিম স্নেহে ওর লাইডার-এর একেবারে খানকুড়ি কপি [ এই প্রথম বিক্রি ] কিনে বসল রাইনহার্ট। জার্মানীর নানা জায়গায় পাঠালে; বিশ্ববিদ্যালয়ে এক একখানা ক'রে পরিচিতদের কাছে পাঠলে। যাদের কাছ থেকে ও পাঠ্য বই কেনে সে-সব দোকানেও পাঠালে কিছু। কিছুদিন কোন সাড়া নেই—শিক্ষিত সমাজের এই উপেক্ষায় ব্যথা পায় রাইনহার্টরা। কিন্তু ক্রিসতফকে ওরা জানতে দিলে না কিছু। বড় আঘাতই পাবে সে। অতএব তার অজ্ঞাতই থেকে গেল হৃদয়বান বন্ধুর অকৃত্রিম স্নেহের এই পরিচয়। যাই হোক, জীবনের ধন সত্যি কিছু ফেলা যায় না; একদিন না একদিন পূর্ণের পদ পরশ তার উপরে পড়বেই। বহু বছর অফলা কেটে যায় বটে কিন্তু অকস্মাৎ একদিন অভাবনীয়ের দানে সিদ্ধি মিলবেই, ওই আশা ছাড়তে পারে না রাইনহার্টরা। কিন্তু বিশ্বাসও হ'তে চায় না যে পৃথিবীর বুকে এতগুলো মানুষের মধ্যে কারো অন্তরস্পর্শ করলে না ক্রিসতফের এই রচনা। নিশ্চয়ই আছে সমঝদার মানুষ, চাপা পড়ে আছে তারা সুদূরে কোন অপরিচয়ের আড়ালে—হয়তো বা কুণ্ঠা, হয়তো বা জীবনের কঠিন সংগ্রামে জর্জরিত তারা—পারছে না তাই কণ্ঠ খুলতে।

একজন মাত্র একখানা চিঠি লিখেছিল। মাস দুই তিন পরে ক্রিসতফও পেলে একখানা পত্র—ছোট্ট শহর থুরিঙ্গিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের কাছ থেকে; অতি আন্তরিক, উচ্ছ্বাসে-ভরা এক চিঠি।

কিন্তু চিঠিখানা না খুলেই পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াল ও দুদিন। তৃতীয় দিনে রাইনহার্টদের বাড়ীতে এসে খুলল। ওর আনন্দ আর ধরে না, কিন্তু বন্ধুদের আনন্দ আরও বেশী। এক সঙ্গে ওরা চিঠি পড়ে। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কি ইশারা করে রাইনহার্ট, চোখে পড়ে না ক্রিসতফের। প'ড়তে প'ড়তে মাঝপথে হঠাৎ ওর সমস্ত খুশির ওপর

অন্ধকার নেমে আসে। ও থেমে যায়। ব্যস্ত হ'য়ে রাইনহার্টরা জিজ্ঞাসা করে :

'কি হ'লোহে! থামলে কেন?' ওকে তুমিই বলে ওরা।

ক্রিসতফ রেগে চিঠিটা আছড়ে ফেলে দিলে টেবিলের ওপরে :

'অসহ্য! এ আর সহ্য করা যায় না।'

'কি হ'লো কি?'

'পড়েই দেখ।' বলে এক কোণে গিয়ে মুখ গোমরা ক'রে বসে রইল।

রাইনহার্টরা চিঠি প'ড়ে কিছুই বুঝতে পারে না। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছাড়া ওর মধ্যে তো বিপরীত নেই কিছু। অবাক হ'য়ে বলে :

'কই খারাপটা কি বুঝতে তো পারছিনে!'

'চোখ নেই তাই পারছো না।' ব'লে চিঠিখানা রাইনহার্টের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'চোখের মাথা খেয়ে প'ড়ে দেখ একবার। লোকটা ব্রাহমের শিষ্য।'

সত্যি সত্যিই ব্রাহমের লাইডারের সাথে ওর লাইডার-এর তুলনা করেছেন ভদ্রলোক। ক্রিসতফের চোখ দিয়ে জল পড়ে, 'হায়রে বন্ধু!' বলে ও : 'বন্ধুর দেখা যদি পেলাম, তাও খোয়াতে হ'ল!'

ব্রাহমের সঙ্গে ওর তুলনা! ওর সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল। বাধা না পেলে হয়ত বেচারা ভদ্রলোককে গালাগাল দিয়ে একটা চিঠি লেখে ফেলত। অথবা মাথা ঠাণ্ডা হ'লে শেষ পর্যন্ত এসব পত্রের উত্তর না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ভেবে চুপ ক'রে যেত। কিন্তু রাইনহার্টরা কোনও রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে একটা চিঠি লেখালে। অনিচ্ছায় লেখা, কাজেই খুব আগ্রহের সুর বাজল না। ঠাণ্ডা চিঠিখানা পেয়েও অধ্যাপকটির উৎসাহে ভাটি পড়ল না।

উচ্ছ্বসিত ভাষায় পরম আদরে আরও দু'তিনখানা চিঠি লিখলেন তিনি। অজানা বন্ধুর অকৃত্রিম আন্তরিকতায় শেষ অবধি ক্রিসতফের মেজাজ ঠাণ্ডা হ'ল বটে কিন্তু চিঠি পত্র লেখার অভ্যাস তেমন না থাকাতে শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষেরই কলম বন্ধ হ'ল এবং ক্রিসতফের মন থেকে ব্যাপারটা একেবারেই মুছে গেল।

রাইনহার্টদের ওখানে ক্রিসতক এখন আরো ঘন ঘন যায়। প্রায়ই দিনের মধ্যে একাধিকবার যায়। সন্ধ্যা তো বাঁধা আছেই। সারাটা দিন একা একরকম বন্ধই থাকে। তাই, কেউ ওকে বুঝুক আর নাই বুঝুক, তবু কারো সাথে একটু মন খুলে যা খুশি তাই বলার, কারণে অকারণে একটুখানি হাসার, হাত পা ছড়িয়ে বুক ভরে একটু নিশ্বাস নেবার ওর রীতিমত দৈহিক প্রয়োজন।

কৃতজ্ঞতা দেখাবার অন্য কোন পথ না পেয়ে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিয়ানো বাজিয়ে শোনায় বন্ধুদের। লিলি রাইনহার্ট না সঙ্গীত-রসিক, না তার সমঝদার। ব'সে ব'সে হাই উঠতে থাকে। কিন্তু বেচারা ক্রিসতফের জন্য ওর ভারী মায়া হয়! তাই হাই চেপে উৎসাহ দিতে হয়, আগ্রহ দেখাতে হয়। শ্রীযুক্ত রাইনহার্টের সঙ্গীত বিদ্যা তাঁর স্ত্রীরই মত। তবু তিনি হঠাৎ হঠাৎ পাশের কোন কলির কোন সুর শুনে বিগলিত হ'য়ে ওঠেন, কখনও বা প্রবল উচ্ছ্বাসে চোখে জলের ধারা অবধি বয়ে যায়। ক্রিসতফের হাসি পায়। দু'জনেই প্রাণপণে বোঝাতে চান যে ক্রিসতফের সঙ্গীতের ওরা খুব সমঝদার। ক্রিসতফও এমনি ভাব দেখায় যেন অতবড় সমঝদার পেয়ে ও বেঁচে গেছে। মাঝে মাঝে ওর দুষ্ট বুদ্ধি জাগে। বাজাতে বাজাতে হঠাৎ আবোল তাবোল বেসুরো বাজাতে সুরু করে। ওর হাতের নূতন রচনা ভেবে বন্ধুরা

গদগদ হ'য়ে উঠেন। ও হেসে ফেলে। বোকা বনে গিয়ে গুম হ'য়ে থাকে বেচারারা। তারপরই হয়তো নূতন একটা খুব ভালো সুর বাজায়। কিন্তু নেড়া বেশী বার বেলতলায় যায় না। ক্রিসতফ ওদের ঠকাচ্ছে ভেবে চিৎকার ক'রে ওঠে : 'কি আবোল তাবোল বাজিয়ে কানের মাথা খাচ্ছো।'

'বটেরে রাসক্যাল...' ক্রিসতফ হেসে ওঠে : 'এই তোমাদের বোঝা! জানো এটা আমার তৈরী সেরা একটা গৎ। বন্ধুদের জব্দ ক'রে শিশুর মত খুশি হ'য়ে ওঠে ক্রিসতফ। শ্রীমতী রাইনহার্ট কপট ক্রোধে উঠে এসে এক থাপ্পড় লাগাল ওকে। হো হো ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়ে ও। সাথে সাথে বন্ধুরাও হাসে।

ওদের অমন ক'রে স্নেহে জড়িয়েছে যে সে সঙ্গীত-বিশারদ ক্রিসতফ নয়, সে চাল-চুলো-হীন একটা পাগল-ছেলে আর তার সরল,প্রীতি-সরস ব্যবহার—সে বাস্তব পৃথিবীর খেলার পুতুল ক্রিসতফ। ওর নামে ঝুরি ঝুরি নিন্দা ওদের কানে এসেছে, কিন্তু তাতে আরো কাছেই এসেছে ও। ছোট শহরের গুমোট আবহাওয়ায় ক্রিসতফেরই মত রাইনহার্টদেরও দম বন্ধ হ'য়ে আসে। ওর মতই এদের মনেও অলি-গলির গোলকধাঁধা নেই। সরল সোজা মানুষ ওরা। মানুষকে ওরা নিজের চোখ কান, মন দিয়েই বিচার করে। ক্রিসতফ ওদের কাছে একটি বিরাট-দেহ-বিশিষ্ট শিশু বিশেষ। সংসারের হিসেব জানে না—জানে না হিসেব ক'রে রেখে চেপে কথা কইতে। ওর সরল মনটাই ওর শত্রু।

এত কাছে থেকেও ওর চরিত্রের নাগাল ওরা পায়নি, ওর মনের গহনে ডুব দিতে ওরা পারেনি, পারবে না কোন কালে—এ ও জানে; মনে মনে বড় ব্যথা পায়। কিন্তু ভালো মুখে দুটো কথা কইবার লোকেরও

ওর এত অভাব যে, বুঝুক আর নাই বুঝুক ভালোবেসে ওরা যে ওকে কাছে ডেকেছে এই ওর ঢের। গত বছরের অভিজ্ঞতায় ও শিখেছে অনেক। বছর দুই আগে হ'লে এমন ক'রে ভালোছেলের মত রাইন-হার্টদের সাথে ও মিশতে পারত না, হয়তো বা সইতেও পারতো না ওদের। মনে আছে অয়লারদের কি বিষ নজরেই না দেখত ও। হাসি পায় সে-কথা মনে ক'রে। সে ক্রিসতফ নেই আর এখন। ও এখন অনেক শিখেছে। অভিজ্ঞতার আগুনে পাক ধ'রেছে মনের পরতে পরতে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকটা তোলপাড় ক'রে। সত্যি শিখেছে। কে যেন কানে কানে বলে যায়: ক'দিন হে এ শেখা? ক'দিন?'

হাল্কা হ'য়ে যায় মনটা, কিছু সান্ত্বনাও আসে যেন। কোথায় গেলে পাবে ও এমন সুহৃদ যে ওকে বুঝবে, যে হবে ওর আত্মার দোসর। ওর সর্বস্বের মূল্যও যদি মিলত, কতই বা বয়স! কিন্তু এরই মধ্যে দুনিয়ার পরিচয় পেল যে তাতে বুঝতে আর বাকী নেই যে ওর বুকের মধ্যে যে স্বপ্ন বাসা বেঁধে আছে—তা কঠিনতম সাধনার দ্বারাই সাধ্য। নয়তো বুকের স্বপ্ন বুকেই মেলাবে। অতএব ওর পূর্বগামী শিল্প-সাধকের ভাগ্যে যে সুখ জুটেছে তার বেশী ওরও জুটবে না। রাইন-হার্টদের কাছ থেকে আনা বইয়ের মধ্যেই ও পড়েছে কারো কারো জীবনেতিহাস—কি কঠিন সাধনা, কি কঠিন তপশ্চরণ ক'রে গেছেন সতর শতকের জার্মান সঙ্গীতাচার্যরা। কি বিপুল তাদের দুঃখবরণ। বিশেষ ক'রে আচার্য শুজ। আশ্চর্য বীর সাধক। বারে বারে ইওরোপীয় দস্যুর দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর সোনার দেশের বুকের ওপর। যুদ্ধ ধ্বংশ, অত্যাচার—শহরের পর শহর পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেছে; পদ-দলিত, লাঞ্ছিত হয়েছে সে গৌরব-ভূমি; গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান হয়েছে

মহামারীতে…তারই মধ্যে অচঞ্চল পদক্ষেপে চলেছেন মহাবীর আপন সাধনাকে বক্ষে ধারণ ক'রে। দুঃখে দারিদ্রে দেহ ভেঙ্গেছে, মার পড়েছে বুকে মুখে—কিন্তু কোন প্রতিবাদ করেন নি, কিছু চাননি উদাসী বৈরাগী দুনিয়ার কাছে। ক্লান্ত দেহ মন আকুল হ'য়ে শুধু একটু বিশ্রাম মেগেছে। অবাক হ'য়ে ক্রিসতফ ভাবে—এর পরেও কি মানুষের নালিশ করার পথ থাকে? কি পেয়েছেন এই সাধকেরা? শ্রোতা পাননি, সমর্থক পাননি। ভবিষ্যৎটুকুও ছিল না। অনিশ্চয়তাকে সামনে নিয়েই ওরা লিখেছেন নীরব গৃহ-কোণে আপনার মনে বসে; নিবেদন করেছেন অদেখা দেবতাকে। জানতেন—আজের সৃষ্টি হয়তো বা বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যাবে কাল। তবু হাত থামেনি, তবু আসেনি অবসাদ, আসেনি বিষাদ, আপন আনন্দে গান গেয়ে চলেছে পাগলা ভোলার দল। গান গাওয়াতেই ছিল তাঁদের আনন্দ। জীবনে দাবী তাঁরা বড় বেশী রাখেন নি। শুধু বাঁচতে চেয়েছেন, চেয়েছেন মেহনত দিয়েই জোটান দু'বেলা দু'মুঠো মোটা অন্ন খেয়ে বুকের ভাষা চোখের স্বপ্নকে দেবীর রূপে ফুটিয়ে তুলতে, আর চেয়েছেন দু'চার জন খাঁটি সবল-প্রাণ মানুষ, শিল্পী নয়ত সাধারণ মানুষ, যারা ওঁদের না বুঝলেও সংশয় রাখবেনা। সরল হৃদয়ের গভীর সত্য দিয়ে শুধু বিশ্বাস করবে, আর নিজেদের বিশ্বাস দিয়ে পাবে ওঁদের বিশ্বাস। এইটুকুই শুধু চেয়েছিলেন ওর পূর্ব-গুরুরা। কি সাহসে ক্রিসতফ তার বেশী চায়? কোন দাবীতে? সুখের একটা নিম্নতম মাত্রা আছে, সেইটুকুই শুধু দাবী করা চলে। তার পরে যা, তা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের হাতে।

অপূর্ব প্রশান্তিতে নূতন ক'রে বুক ভরে যায়। রাইনহার্টদের যেন আরো বেশী ক'রে ভালো লাগে ওর। কিন্তু দু'দিন পরে ভালো-

প'ড়ে পুড়িয়ে ফেলতেও পারে না। ভয় করে। কম্পিত হাতে চিঠি খোলে ; পড়তে গিয়ে হৃৎপিণ্ড যেন থেমে যায়—সেই পুরানো কথা, সেই হীন, জঘন্য মিথ্যা অপবাদ,—হয়ত শুধু আরেক রকম ক'রে বলা। গোপনে ওরা চোখের জলে ভাসে। ভেবে অস্থির হয় কে এই পাষণ্ড যে ওদের সর্বনাশ করবার জন্য এমন মরিয়া হ'য়ে উঠেছে !

সেদিন যখন আর একখানা চিঠি এল, আর সইতে পারলে না লিলি রাইনহার্ট। কেঁদে প'ড়ল গিয়ে স্বামীর কাছে। একমাত্র তখনই লিলিও জানতে পারল স্বামীর অবস্থাও ওরই মত। ক্রিসতফের কাছে বলবে কি ? সাহস হয় না কিন্তু ওকে সাবধান করতে হবে যে। অনেক লজ্জায় অনেক কুণ্ঠায় ক্রিসতফকে একটুখানি বলতে গিয়েই লিলি চমকে উঠল ; ক্রিসতফকে বঞ্চিত করেনি সর্বনেশেরা। সেও চিঠি পেয়েছে সমান ভাবেই। মানুষ এত সাংঘাতিক হ'তে পারে ! অবাক হ'য়ে ওরা ভাবে। লিলির ধ্রুব বিশ্বাস যে সারা শহরই এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে। কি যে করবে ভেবে ঠিক পায় না কেউ। ক্রিসতফ আস্তিন গুটোয় মাথা ভাঙ্গবে...কিন্তু কার ? কার মাথা ভাঙ্গবে ? আর তা ছাড়া হৈ হৈ ক'রলে প্রমাণ হ'য়ে যাবে যে ওরা সত্যি অপরাধী। পুলিশে খবর দিলে আরও কেলেংকারী হবে। চারদিকে ছড়াবে সব কথা। চুপচাপ থাকবে, সে-পথও নেই। ওদের সম্পর্কের ভিৎই ন'ড়ে গেল। স্ত্রীকে জানে, বন্ধুকে জানে ; তবু কেন সংশয় আসে রাইহার্টের মনে। ইচ্ছে থাকলেও আগের মত আর বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু জানে কত মিথ্যে, কত লজ্জা ওর এই ভয়ে। লজ্জা রাখবার ঠাঁই নেই ওর। ভাবে, না কান দেবে না, শুনবে না, শুনবে না কারো কথা। বলুক যার যা খুশি। সরল প্রাণের সহজ সৌহার্দ্যকে ও

হত্যা ক'রতে পারবে না মন্দ লোকের মন্দ কথায়। পাগল দু'টোর পাগলামোকে ও বাধা দেবে না।

কিন্তু ভেতরে কোথায় যেন কান্না জমে ওঠে, যার ভাষা দিতে পারে না রাইনহার্ট। মর্ম-ভেদ করা, তীক্ষ্ণ, অসংজ্ঞেয় এক কান্না। লিলি দেখে, বোঝে।

আরো শোচনীয় ওর নিজের অবস্থা। কি ক'রে বোঝাবে স্বামীকে ক্রিসতফের সাথে ওর সম্পর্কের স্বরূপ। ক্রিসতফের মতই ওরও কোনও দিন কোন অসঙ্গত কথা স্বপ্নেও মনে হয়নি। কিন্তু এ'কয়দিন যতগুলো চিঠি পেয়েছে, একই জঘন্য ইঙ্গিত। দেখে দেখে ওর নিজের মনেই সন্দেহ উঁকি মারে, কি জানি হয়তো ক্রিসতফ সত্যি ভালোবাসে ওকে। ক্রিসতফের তরফ থেকে এ পর্যন্ত এর প্রমাণ-যোগ্য কোন ব্যবহার পায়নি—তবু লিলি সাবধান হয়। প্রথম বুঝতে পারেনি ক্রিসতফ। কিন্তু যখন পারল, তখনকার অবস্থা বর্ণনাতীত। এমন অবাস্তব কথা! হাসিও পায়, কান্নাও আসে। লিলি রাইনহার্টের সাথে প্রেম! ছোট-খাটো, ভালো মানুষ, ভালো মনের, নেহাৎ সাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন মেয়ে লিলি রাইনহার্ট। হায় রে কপাল! আর এই অসম্ভব কথাটা বিশ্বাস ক'রে বসল কিনা, লিলি রাইনহার্ট নিজে; আর ওর বন্ধু! ও নিজে গিয়ে ওদের সামনে ঋজু হ'য়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারলে না যে ভয়ংকর মিথ্যে কথা এ-সব, ভয় নেই, শান্ত হও তোমরা!

না, বড় ভালো লোক ওরা। ও পারবে না ওদের দুঃখ দিতে। আবার ওদিকে ওরও কেমন জানি মনে হয়, লিলি নিজেই হয়ত ওর প্রেমে পড়েছে তাই ওর এত সাবধানতা ওর সম্বন্ধে। বেনামী চিঠি গুলির কি অদ্ভুত ক্ষমতা!

পরিস্থিতি যেমনি বেদনাদায়ক্ তেমনি হাস্যকর। বেশীদিন এ অবস্থা চলতে দেওয়াও যায় না। শ্রীমতী রাইনহার্ট মুখে যত বড় বড় কথা বলে আসলে মানুষটা ভারী দুর্বল। শহরের এই প্রচ্ছন্ন বৈরিতায় পাগল হ'য়ে উঠল লিলি। ক্রিসতফ এলে দেখা করে না, নানা অজুহাতে—গিন্নীর অসুখ…কর্তা কাজে ব্যস্ত…কদিনের জন্য সব বাইরে যাচ্ছে…এমনি ধারা অজুহাত শুনে শুনে দরজা থেকে ফিরে আসে ক্রিসতফ। বোঝে ও ওর খোলা মন দিয়ে। সোজাসুজি বলে :

'আর কেন বন্ধু! এবার বিদায় নেওয়াই ভালো। সাহস নেই আমাদের।' চোখের জলে বুক ভেসে যায় রাইনহার্টদের। কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

এবারে একেবারে একা ক্রিসতফ। জয় হ'ল শহরের। কেড়ে নিয়েছে ওরা ওর শেষ প্রাণবায়ুটুকু—ওর স্নেহের বন্ধন। যত সামান্যই হোক ওই বন্ধনই বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে।

[ তিন ]

## মুক্তি

কেউ নেই ক্রিসতফের, একজনও কেউ নেই। যত শুভাকাংক্ষী সুহৃদ ছিল, একে একে ঝরে গেছে সব। গেছে গতেক্রেদও—দুঃখের দিনে যে এসে বারে বারে পাশে দাঁড়িয়েছে। তাকে আজ ওর বড় দরকার। সেই চলে গেছে ক'মাস হ'ল। গেছে আর আসবে না ও জানে। গত বছর গ্রীষ্মের সময় বড় বড় হাতের লেখায় চিঠি এল একখানা কোন গ্রাম থেকে লুইসার কাছে, তার ভাই মারা গেছে। শরীর ভালো ছিল না, তবু ভবঘুরে জোর ক'রে বেরিয়েছিল ঘুরতে। সইল না। সেই গ্রামেরই সমাধিস্থানে তাকে সমাহিত করা হ'য়েছে। গ্রাস ক'রে নিল মৃত্যু ওর শেষ আপন স্বজনটিকে। একমাত্র সেই শান্ত সমাহিত বলিষ্ঠ স্নেহই ওকে আশ্রয় দিতে পারত। আর আছেন শুধু মা; মা কেবল ভালোবাসতেই পারেন। ওকে বোঝেন কই? শুধু ভালোই বাসেন; ওর অন্তরের সাথে, ওর সাথে কোথায় তাঁর যোগ! ওর চারদিক ঘিরে আছে জার্মানীর বিশাল ভূমি আর সাগরের অনন্ত নীল জল। যতবার ও উঠতে চায়, মুখ থুবড়ে পড়ে গভীর হ'তে আরো গভীরে। ডুবে যায় অতলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরম কৌতুকে দেখে ওর শত্রুর দল...

নিদ্রাহারা রজনীর কালো আকাশে একটুখানি আলো দেখা যায়... মনে পড়ে যায় বরেণ্য সুর-শিল্পী হাস্লার-এর কথা। জার্মানীর দিকে দিকে তাঁর যশ। বালক ক্রিসতফ তাঁর স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছিল একদিন। মনে পড়ে ওর ভাবী জীবনের উদ্দেশে শিল্পীর সেদিনকার

অঙ্গীকার। আজের এই ঘোর দুর্যোগের দিনে সেই অঙ্গীকারটুকুর স্মৃতিকেই আঁকড়ে ধরে ডুবন্ত মানুষটি। হাসলার-এর হাতেই রয়েছে বাঁচাবার মন্ত্র। বাঁচাবে ওই গুণীই ওকে। কিন্তু কি চায় ও ? সাহায্য ? না, সাহায্য ও চায় না ; চায় না অর্থ, চায় না কোনও পার্থিব বস্তু ! চায় শুধু একটু বোঝাবুঝি। তিনিও তো ছিলেন স্বাধীন-চেতা। দুঃসহ নিপীড়ন, অত্যাচারের ঝড় ব'য়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। ক্রিসতফেরও পশ্চাতে তাড়া ক'রে ফিরছে জার্মানীর অক্ষম সমাজের অসূয়া। তারা বাঁচতে দেবে না ওকে—দলে পিষে মাটির সথে মিশিয়ে দিতে চায়। হাসলারই তো বুঝবেন তাঁর মত বন্ধনহীন পথের পথিকের মর্ম-বেদনা। একই সংগ্রামের সৈনিক তো ওরা দু'জন।

যেমনি মনে হওয়া, অমনি উঠে পড়ল। মাকে বললে সপ্তাহ খানেকের জন্য বাইরে যাবে। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা ট্রেণে চ'ড়ে বসল। দেরী সইছে না আর। যেন নিশ্বাস নেবার জন্য মুমূর্ষুর শেষ সংগ্রাম।

খ্যাতিমান হয়েছেন হাসলার। কিন্তু তাতে নিরস্ত্র হয়নি ওঁর শত্রুর দল ; মিত্রের দলের হাতে ওঁর ঢাকের কাঠি। তারাই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের মধ্যে ওস্তাদ শিল্পী ব'লে ওকে সপ্তম স্বর্গে তোলেন। সর্বদা নানা মত, নানা দলের মানুষ ঘিরে থাকে শিল্পীকে। রাস্তার দুষ্টু ছেলেরা যেমন মানুষ খ্যাপাবার জন্য ফন্দি-ফিকির খোঁজে, হাসলারও গান লেখেন শুধু শত্রু পক্ষকে চটাবার জন্য। প্রতিভা যখন শিল্প ছেড়ে শত্রু খ্যাপানর পথ খোঁজে, সে পথ হয় সাধারণতঃ এঁদো গলির পথ। এবং তার অন্ধকারে ব'সে কাদা ঘেঁটে হাসলার যে পদার্থ মাঝে মাঝে সৃষ্টি করেন, তার পূতিগন্ধে মানুষের হুক্কার আসে। অসাধারণ সঙ্গীতের প্রতিভা মানুষটার, কিন্তু রুচিটা ভদ্র-পাড়ার নয়, যত অদ্ভুত, কিম্ভূত, অবাস্তব আর বীভৎস নিয়ে ওঁর খেলা। অর্থাৎ

ভদ্র সমাজের রুচি আর শুভ-বুদ্ধিকে আঘাত করাতেই ওর অত বড় প্রতিভার অনুশীলন। ওর বিকৃত-বুদ্ধি নিয়ে লোক-সমাজে হট্টগোল হয়, এবং হওয়াটাকে হাসলার গর্বের বস্তু ব'লে আত্ম-প্রসাদ লাভ ক'রে থাকেন। বুঝুন আর না বুঝুন সম্রাটও শিল্প-চর্চা ক'রে থাকেন; শিল্প-চর্চা ফ্যাসানেব্‌ল জগতের প্রসাধন-প্রক্রিয়ার অঙ্গ। এ হেন হাসলারের খ্যাতিকে জাতির পক্ষে অগৌরব মনে করেন তিনি। এবং সুযোগ পেলেই তা বুঝিয়ে দিতে কার্পণ্য করেন না। সম্রাট-হেন ব্যক্তির বিরূপতায় হাসলারের রাগ হয় না তা নয়। তবে উল্লাস হয় ততোধিক। বন্ধুরা দু'হাত তুলে বাহবা দেয় প্রতিভার বর-পুত্র ব'লে।

অহেতুক স্তুতি, প্রশস্তি আর তোষামোদের ফল হাসলারের পক্ষে শুভ হয়নি। নিজের সম্বন্ধে ওঁর ধারণাটা অত্যন্ত স্ফীত হ'য়ে উঠল। গুমর হ'ল, যা লিখবেন তাই জন-সাধারণ লুফে নেবে। যত খারাপই লিখুন তাই বের করতেই আর সব গুলোর দশটা ক'রে কলম ভাঙ্গবে। সুতরাং আবোল তাবোল যা মাথায় আসে, সব বাজারে ছাড়েন, কিছুই ফেলেন না। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ও অহংকার করতে পারেন হাসলার; তবু বলতেই হবে শিল্পীর পক্ষে এ অহংকার মহতী সৃষ্টির অনুকূল নয়। শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতিই হাসলারের প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা। অবজ্ঞা শুধু অপরকেই নয়; তার ধাক্কা এসে লাগে নিজের ওপর, জীবনের পর, প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্তে। একদা বহু রকম উদার আদর্শে ছিল বিশ্বাস, ধীরে ধীরে কালের প্রবাহে নষ্ট হয়েছে সব। ভাঙ্গনকে ঠেকাবার মত চরিত্রের সে-বলিষ্ঠতা ছিল না। আবার যে বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে তার মিথ্যে মুখোস মুখে এঁটে থাকার মত ভণ্ডামীও পারেননি আয়ত্ব করতে। আজ যা গেছে তারি স্মৃতির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসলার হ'য়ে উঠেছেন ঘোর সংশয়ী। নরম,

ঢিলেঢালা প্রকৃতি দক্ষিণীদের মত—সুখ, দুঃখ, ঠাণ্ডা, গরম কোনটাই খুব উগ্র হ'লে টাল সামলাতে পারেন না। মোটামুটি মাঝারী মাত্রাই ওঁর ধাত-সহ। অলস আয়েসের স্রোতে ভেসে চলেছেন নিজের অজ্ঞাতসারে। ভালো খাবার, কড়া পানীয়, আর আলস্যে গা এলিয়ে রঙ্গীন চিন্তা—এই ওঁর সব চেয়ে বড় কাম্য। এই জীবনেরি প্রতিধ্বনি ওঁর শিল্পসৃষ্টিতে। শিল্প-সৃষ্টি বলতে ও'র অনাদরে, অবহেলায় ঝরে-পড়া ছিটেফোঁটা যাওবা পাওয়া যায়—তা চলতি ফ্যাসানের হুকুম মেনে চলে। ওঁর বিরাট প্রতিভার কতটুকু পরিচয় আর থাকে তার মধ্যে? জানেন, হাসলার, ফুরিয়ে যাচ্ছেন। এ তথ্য ওঁর চেয়ে আর বেশী জানে না কেউ। শুধু বেশীই বা কেন, সত্যি কথা বলতে গেলে শুধু হাসলারই জানেন ও'র ফুরিয়ে যাওয়ার খবর। মনে করতে চান না; তবু কখনও কখনও সত্যটা অতি স্পষ্ট হ'য়ে নিজকে জানান দিয়ে যায়। ঘোর আত্ম-কেন্দ্রিক মানুষ—নিজের খেয়াল খুশি, নিজের দেহ এ নিয়েই ডুবে আছেন। এর বাইরে তার আর দুনিয়া নেই। এককালে যা আদরে বা অনাদরে মনকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে, আজ ওঁর ঔদাস্যে ঠেকে তা ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যায়।

এল ক্রিসতফ আশ্রয় খুঁজতে এই মানুষের কাছেই। শিল্প-সাধনায় ওর কাছে স্বাতন্ত্র্যের যিনি প্রতিরূপ। শীতের বৃষ্টি-ভেজা সকালে কি আনন্দ কি আশা নিয়েই যে ও ছুটে এল এই শহরে; আর কিছু চায়নি ও, চেয়েছে দুটো দরদের, দুটো উৎসাহের কথা যা ওকে শক্তি যোগাবে এই বিমুখ পৃথিবীর বন্ধুর পথে। সংগ্রামকে ও তো ভয় পায় না। সংগ্রাম তো ক'রতেই হবে, সে জানে ও; প্রত্যেক শিল্পীর জীবনেই ওই অমোঘ লেখন। আমৃত্যু শুধু সংগ্রাম। একদিনের তরে তার বিরতি নেই। শীলার সত্যই ব'লেছেন: 'সংগ্রামই হ'ল জন-সাধারণের

সাথে একমাত্র সম্বন্ধ যা নিয়ে মানুষ কখনও অনুশোচনা করেনি।'

এত অধীর হ'য়ে উঠেছিল ক্রিসতফ যে প্রথম যে হোটেলটা পেল জিনিসগুলো কোনও মতে সেখানে ছুঁড়ে ফেলে ছুটল হাসলারের বাড়ীর দিকে। প্রায় শহরের প্রান্তে থাকেন ভদ্রলোক। ইলেক্‌টিক ট্রেণে চ'ড়ে বসল ক্রিসতফ। ভয়ংকর ক্ষিদে পেয়েছে। একটা রুটি প্রায় গোগ্রাসে গিলল। গন্তব্য-স্থান যতই এগিয়ে আসে ওর হৃৎপিণ্ডের গতি ততই বেড়ে যায়।

বাড়ী খুঁজে পেতে বেগ পেতে হ'ল না। সাদাসিদে বাড়ী খানি। কিন্তু ভেতরে কিছু আড়ম্বর আছে। লিফট থাকা সত্বেও সিঁড়ি বেয়েই চলল ধীরে ধীরে। একটু সময় পাওয়া যাবে তৈরী হবার। চারতলার সিঁড়ি, পা যেন আর চলতে চায় না। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা চলে। মনে প'ড়ে যায় আর এক দিনের ছবি। হাসলারেরই দুয়ারে অতিথি ছোট্ট ক্রিসতফ ঠাকুর্দার হাত ধরে। যেন কালকের ঘটনা।

দুয়ারের ঘণ্টা টিপল। প্রায় এগারটা বেলা তখন। খাণ্ডার মার্কা এক পরিচারিকা বেরিয়ে এল। তিরিক্ষি স্বরে জানিয়ে দিলে শ্রীযুক্ত হাসলার অত্যন্ত ক্লান্ত; তাঁর সাথে দেখা হওয়া সম্ভব নয় এখন। নৈরাশ্যের এমনি একটা সকরুণ ছায়া ঘনিয়ে এলো ক্রিসতফের চোখে মুখে যে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ্য মনে হ'ল ও-পক্ষের। ওর আপাদ-মস্তক পাঁতি পাঁতি ক'রে দেখলে। হঠাৎ অত্যন্ত কোমল হ'য়ে ওকে নিয়ে বসাল হাসলারের পড়বার ঘরে। বলল: 'যাই দেখি, গিয়ে বুড়োকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি পারি।' তারপর ওর দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিটিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘরখানির দেয়ালে ইমপ্রেশনিষ্ট পদ্ধতিতে আঁকা কয়েকখানি ছবি,

আর আঠার শতকের কিছু ফরাসী খোদাইএর কাজ। আর্টের সমঝদার ব'লেও খানিকটা ঠাট রাখেন হাসলার। চেলাবৃন্দের ব্যবস্থায় ঘরের সজ্জায় যে খিচুড়ী-পছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়, আসবাব-পত্রের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম নাই। চতুর্দশ লুইয়ের আমলের প্যাটার্ণে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা টেবিল ঘিরে হাল-আমলের আরাম চেয়ার। প্রাচ্য ঢংএর সোফায় স্তূপাকৃতি রংবেরংএর কুশান। আয়না বসান দরজা, জাপানী পরদায় ঢাকা তাক ও ম্যানটেলপিস্। ম্যানটেলপিস্-এর ওপর হাসলারের একটা আবক্ষ প্রতিমূর্তি। একটা গোলটেবিলের ওপর গায়ক গায়িকা ও মেয়ে বন্ধুদের অসংখ্য ছবি। অত্যন্ত অগোছাল টেবিলটা। পিয়ানোটা প'ড়ে রয়েছে খোলা। তাকে রাশি রাশি ধূলো। আধপোড়া সিগারেট ছড়ান সারা ঘরে।

পাশের ঘর থেকে শোনা যায় কার ভয়ানক ক্রুদ্ধ আপত্তির স্বর। উত্তরে গর্জে উঠছে পরিচারিকাটির কর্কশ কণ্ঠ। বেশ বোঝা যায়, এখন কারো সাথে দেখা করতে ঘোর আপত্তি হাসলারের। এবং তা নিয়েই বাদ-প্রতিবাদ প্রভু-ভৃত্যে। কিন্তু পরিচারিকার ভাষা ও স্বরে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের বিন্দুমাত্র স্বীকৃতি নেই। যে-ভাষায় সে কথা কয় শুনে ক্রিসতফ ঘাবড়ে যায়। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে বলা তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। বরঞ্চ মনে হয় সে যেন বেশ উপভোগ করছে। খানিকক্ষণ চলল এ ভাবে। তার পর একটা দরজা খুলে গেল। বক্‌বক্ করতে করতে আর পরিচারিকাকে গাল দিতে দিতে হাসলার এসে ঢুকলেন।

ক্রিসতফের হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেল। এতদিন পরে, তবু শিল্পগুরুকে চিনতে এতটুকুও অসুবিধা হ'ল না ওর। কিন্তু হায় হায় এ কি দেখল! চিনতে না পারলেই যে ছিল ভাল। এ কি সেই

হাসলার। সেই মানুষই, আবার সেই মানুষ নয়ও। তেমনি শিশুর মত মসৃণ কপাল, অকুঞ্চিত পেলব মুখ। কিন্তু এই স্ফীত দেহ, এই মাথা জোড়া টাক, এই নিষ্প্রভ পাণ্ডুর বর্ণ, নেশাগ্রস্তের মত ঢুলু ঢুলু চোখ, সেই মানুষের এই পরিণতি! নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, নুয়ে পড়েছে কাঁধ, মুখ চোখ বিশ্বের বিরক্তিতে কুঞ্চিত, হাত বুক-খোলা ওয়েষ্ট কোটের পকেটে। ছেঁড়া একজোড়া জুতো প্রায় বেরিয়ে আসছে পা থেকে, পাৎলুনের ওপর দিয়ে ঝুলছে সার্ট; পাৎলুনটার বোতাম কটাও সব লাগান হ'য়ে ওঠেনি। নাম বলে ক্রিসতফ। নিষ্প্রভ ঝিমুন ছুটি চোখ চায় ওর দিকে। কলের মত একটা নমস্কার ক'রে মাথা নেড়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে দেন। তারপর একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে কৌচের ওপর ধপ ক'রে ব'সে পড়েন কুশানের স্তূপের মধ্যে। ভিসতফ আবার বলে:

'দেখুন, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল···আপনার অসীম অনুগ্রহ··· আমার নাম ক্রিসতফ ক্রাফট···'

হাসলার পেছন দিকে হেলান দিয়ে দেহ এলিয়ে দেন। হাত ছটো ডান হাঁটুর ওপর জড়ান। হাঁটুতে থুথনি ঠেকিয়ে জবাব দেন:

'মনে পড়ছে না'।

ক্রিসতফের গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যায়। সেই বহুকাল পূর্বের সাক্ষাতের কথা মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু গলা বন্ধ হ'য়ে আসে। এ স্মৃতি, বুকের তলায় লুকিয়ে রাখা যক্ষের ধন; সহজ ভাবে এ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়ত কখনই পারত না। তবু আজ এই মুহূর্তে···এ যে বিষম পরীক্ষা! মুখে কথা যোগায় না, এক বলতে আর ব'লে ফেলে; লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে। হাসলার বাধা দেন না; নিরুৎসুক শূন্য দৃষ্টিতে একভাবে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। হোঁচট

খেতে খেতে কোনমতে আপন কাহিনী শেষ ক'রে আনে ক্রিসতফ। পা দোলাতে দোলাতে নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হাসলার, যেন এখনও ক্রিসতফের কথা শেষ হয়নি। তারপর বলেন :

'তা, হাঁ···কিন্তু তাতে তো আর আমাদের বয়স ফিরে আসবে না···' ব'লে পা দুটো টান ক'রে মেলে দিলেন। একটা হাই তুলে আবার বলেন ; '···মাপ করবেন···ঘুমুইনি কাল···থিয়েটারে খাবার নেমন্তন্ন ছিল কিনা রাতে···' আর একটা হাই উঠল।

এতক্ষণ ধ'রে ওর কাহিনী শুনেও সে-সম্বন্ধে কিছুই বলবে না হাসলার তা মোটেই আসা করেনি ক্রিসতফ। কিন্তু না, কোন উল্লেখও সে করলে না। ক্রিসতফ বলেছে তার মর্মের কথা, হাওয়ায় ভেসে গেছে তা। ও পক্ষের কোনখানে এতটুকু ছোঁয়া লাগে নি। ক্রিসতফের কথা শেষ হ'য়ে গেলে, মস্ত একটা হাই তুলে বললে হাসলার :

'অনেক দিন আছ বুঝি বার্লিনে ?'

'না, আজই সকালে এসেছি সবে।'

'ওঃ—।' একটুও অবাক না হ'য়ে জবাব দেন হাসলার : 'আছ কোন হোটেলে ?'

কিন্তু জবাবটা শোনার জন্য এতটুকু ঔত্সুক্য আছে ব'লে মনে হ'লনা। অলস ভাবে উঠে গিয়ে একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা টিপল। বললে : 'কিছু মনে করোনা।'

সেই পরিচারিকাটি এল তার অভ্যস্ত রণরঙ্গিণী মূর্তিতে।

হাসলার বলে : 'আজ বুঝি আমায় উপোসী রাখবি কিটী ?'

'সভার মাঝখানে খাবার নিয়ে আসব নাকি ?' ঝাঁঝিয়ে জবাব দেয় কিটী।

'নিশ্চয়ই।' ক্রিসতফের দিকে মাথা হেলিয়ে চোখ মিচকিয়ে বলে: 'উনি আমার মনের খোরাক জোটাচ্ছেন, আমি আমার এই দেহটার খোরাক জোটাই।'

'উনি জানোয়ারের মত গিলবেন, আর একজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন, লজ্জা করে না?'

আশ্চর্য, এক বিন্দু রাগ ক'রলে না লোকটা! হেসে জবাব দিলে: 'ভুল করলে যে! অমনি জন্তুর মত নয়, পোষা জন্তু। কিন্তু চুলোয় যাক লজ্জা সরম। তুই আনত দেখি খাবার। লজ্জা আমি জল দিয়ে খাবারের সাথে গিলে ফেলব।'

ক্রিসতফ ভাবে তাইত, ও কি করছে না করছে কিছুই তো জিজ্ঞাসা বাদ করছে না হাসলার। অগত্যা নিজেই আবার কথার মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করে। বলে যায় ছোট শহরের সহস্র প্রতিবন্ধকের ইতিহাস; সেখানকার সংকীর্ণ চিত্ত, রস-বোধ বর্জিত মানুষের অরণ্যে এক প্রান্তে পড়ে-থাকা ওর নিঃসঙ্গ জীবনের কথা। বোঝাতে চেষ্টা করে ওর নৈষ্ঠিক অন্তরের গভীর বেদনার স্বরূপ। কিন্তু হাসলার একটা কুশানে মাথা দিয়ে চিৎ হ'য়ে হাত পা ছড়িয়ে দিলেন। আধ-বোঝা চক্ষু; ক্রিসতফকে বলতে বাধা দেন না। কিন্তু নিজে শুনছেন না এক বর্ণও। অন্ততঃ দেখে মনে হয় তাই। কখনও হয়তো মুহূর্তের জন্য চোখ একটু তুলে বরফের টুক্‌রোর মত হিম কনকনে দু'একটা শ্লেষ অথবা গেঁয়ো লোকদের সম্বন্ধে চোখা চোখা বিদ্রূপ ছুঁড়ে মারেন। ভড়কে যায় ক্রিসতফ। প্রাণ খুলে কথা কইবার আগ্রহ আর থাকেনা। কিটী খাবার নিয়ে আসে; এলোমেলো কাগজ পত্র ছড়ান টেবিলের ওপরই নামায় ট্রেটা। সে চলে গেলে পরে আবার নিজের অসমাপ্ত দুঃখের কাহিনীর জের টানতে চেষ্টা করে ক্রিসতফ; হাসলার ট্রেটা টেনে

নিয়ে এক পেয়ালা কফি ঢেলে ধীরে ধীরে চুমুক দেন। ক্রিসতফকে হঠাৎ মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে কতকটা আত্মীয়তা, কতকটা শ্লেষ মেশান স্বরে জিজ্ঞাসা করেন: 'খাবে হে এক পেয়ালা কফি?'

ক্রিসতফ আপত্তি জানায়। আবার অসমাপ্ত কথা খেই ধরতে চেষ্টা করে। ক্রমশঃই যেন ওর সব গুলিয়ে যেতে থাকে। নিজেই জানে না কি বলছে। ছেলে মানুষের মত থুথনির কাছে প্লেট নিয়ে খাবার গিলছে ওই যে মানুষটি, দেখে ওর মাথা গরম হ'য়ে ওঠে। তবু তারি মধ্যে কোনো রকমে ব'লে ফেলে যে ওর নিজস্ব মৌলিক রচনা আছে কিছু এবং ওর একটা ওভারচার অনুষ্ঠিতও হয়েছে। অন্যমনস্ক ভাবে শোনেন হাসলার। জিজ্ঞাসা করেন: 'কি বললে, কি হয়েছে?'

ক্রিসতফ আর একবার বলে।

'আঃ বেশ বেশ। বেশ ভালো।' রুটি-সুদ্ধ হাতটা পেয়ালায় ডোবাতে ডোবাতে বলেন। ওই পর্যন্ত।

বড় দমে যায় ক্রিসতফ। ইচ্ছে হয় উঠে চলে যায়। কিন্তু বৃথাই কি এত দূর ছুটে এল! অনেক সাহস সঞ্চয় ক'রে ব'লে ফেলে নিজের কিছু রচনা বাজিয়ে শোনাতে চায় ও। কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই থামিয়ে দেন হাসলার ঝাঁঝাল স্বরে:

'না না, ওসব আমি জানিনে কিছু। তা ছাড়া সময় টময় নেই আমার।'

ক্রিসতফের চোখে প্রায় জল এসে যায়। কিন্তু ও মন বেঁধেছে হাসলারকে শোনাবে, তার মতামত শুনবে, তবে যাবে। কাজেই খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও একটু রেগে জবাব দেয়:

'মাপ করবেন আমাকে। একবার কথা দিয়েছিলেন শুনবেন।

এতদূর থেকে, জার্মানীর প্রায় শেষ প্রান্ত থেকে ছুটে এলাম আমি আপনাকে শোনাব ব'লে। শুনতেই হবে আপনাকে।'

এমন কথা কখনও শোনেননি হাসলার; অদ্ভুত ছেলেটার দিকে তাকান। রাগে লজ্জায় চোখ ফেটে জল আসতে চায় ক্রিসতফের।

ভারী যেন মজা লাগল হাসলারের। ক্লান্ত ভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে পিয়ানোটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন: 'নাও হ'ল তো!'

তারপর কুশান টেনে নিয়ে চোখ বুজে এমন ভাবে শুয়ে পড়লেন হাত পা ছড়িয়ে যেন ঘুমুবেন এখন। ক্রিসতফ পকেট থেকে স্বরলিপির তাড়া বের করে। আড়চোখে দেখে নিলেন হাসলার তার বহর। তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলেন চঞ্চল ভাবে।

ক্রিসতফ ভয়ে দুঃখে এতটুকু। কিন্তু তবু বাজাতে শুরু ক'রল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বন্ধ চোখ খুলে গেল হাসলারের। সুন্দরের স্পর্শে ভেসে গেল ঔদাস্য আর অবহেলা, বিস্মিত শিল্পী উৎকণ্ঠ হ'য়ে উঠলেন। স্তব্ধ হ'য়ে নিশ্চল হ'য়ে শুয়ে রইলেন। স্তিমিত চোখ দুটি ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। বিরক্তি-মাখা ওষ্ঠ এক অব্যক্ত ব্যঞ্জনায় শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। তারপর হঠাৎ যেন জেগে উঠলেন গা ঝাড়া দিয়ে জানোয়ারের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রতে ক'রতে। শিল্পীর অন্তরের বিস্ময় আর উল্লাসে ব্যঞ্জনাময় হ'য়ে উঠল সেই স্থূল জান্তব গর্জন। অবর্ণনীয় আনন্দে ক্রিসতফ আত্মহারা। স্বরলিপির ক'খানা পাতা ফুরুল আর ক'খানা বাকী রইল, শুনতে ভুলে গেলেন হাসলার; একটা অংশ শেষ হ'তেই চিৎকার ক'রে উঠলেন: 'থেমোনা, থেমোনা··· বাজিয়ে চল···'

এই প্রথম মানুষের ভাষা বেরুল হাসলারের মুখ থেকে।

'চমৎকার! চমৎকার—' নিজের মনেই চিৎকার ক'রে চলেন:

'অপূর্ব…অপূর্ব…কিন্তু…ধেৎ…' জান্তব কণ্ঠে বিস্ময় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে : 'এ আবার কি ?'

উঠে বসেন হাসলার। নিজের মনে কি যে বলেন, আপন মনেই হাসেন আনন্দে ; কোথাও বা অদ্ভুত সুর সঙ্গতি শুনে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটেন, যেন ভিজিয়ে নিতে চান একটু। এক জায়গায় এসে আর পারলেন না, এমনি চমৎকার সুরের কাজ। লাফিয়ে উঠে ছুটে এসে পিয়ানোর সামনে বসে পড়লেন ক্রিসতফের পাশে। খেয়াল নেই একটা মানুষ ব'সে রয়েছে সেখানে। সব লুপ্ত হ'য়ে গেছে—ওর চেতনার জগতে সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু নেই। শেষ হ'য়ে গেলে ক্রিসতফের হাত থেকে বইখানি নিয়ে পড়লেন একে একে প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা। পড়তে পড়তে আত্মহারা শিল্পী…বিস্ময়, আনন্দ আর অভিনন্দনের সেকি উদ্বেলতা সর্ব অঙ্গে। আর যে কেউ আছে এ ঘরে, সে কথা ভুলেই গেছেন। আবেগে চিৎকার ক'রে ওঠেন : 'এই শালা আবার এসব পেলি কোত্থেকে…'

কাঁধ দিয়ে ঠেলে ক্রিসতফকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই বাজালেন কত গুলো জায়গা। ওর হাতে যেন যাদু খেলে। চাবিগুলোতে হাত বুঝি পড়ে না—যেন বড় আদরের কোমল হাতে আল্তা ক'রে দেওয়া ছোঁওয়া-টুকুন নেচে নেচে বেড়ায় পিয়ানোর বুকে। চিকন, সযত্ন-লালিত দীর্ঘশ্রী দু'খানি হাত—সারা দেহের সাথে একেবারে বেমানান। মাঝে মাঝে কোনও কর্ডে থেমে যায় হাত ; চোখ দু'টো পিট পিট করে, জিভ দিয়ে চুক্ চুক্ ক'রে কি রকম শব্দ করেন আর বারংবার বাজান ওই জায়গাটা। বাজনার অনুকরণে গুণ গুণিয়ে সুর ভাঁজেন, আর হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার ক'রে ওঠেন খুশি বিরক্তি মেশান এক অদ্ভুত ধরণে। এই ভাবেই চলে যতক্ষণ বাজাল ক্রিসতফ। মনে মনে স্বীকার ক'রে নিতে হয় তরুণ

শিল্পীর প্রতিভা। মনের অগোচরে একটা গোপন হিংসা পাক খেয়ে খেয়ে ওঠে। কিন্তু লোভীর মত দু'হাতে পান ক'রেন ওই সঙ্গীতের সুধা।

ক্রিসতফ যে রয়েছে ওর পাশেই সেকথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে নিজের সাথেই চলে ওর কথা, রাগ বিরাগের অভিব্যক্তি। ক্রিসতফ অঞ্জলি ভ'রে কুড়িয়ে নেয় শিল্পাচার্যের আনমনে ছড়িয়ে ফেলা দান, আর লজ্জায় আনন্দে লাল হ'য়ে ওঠে। প্রাণ খুলে দিয়ে বোঝাতে চায় ওর আজন্ম-লালিত স্বপ্ন। হাসলার ফিরেও চায় না ; সরব চিন্তায় ডুবে থাকে আগের মত। হঠাৎ ক্রিসতফের কি একটা কথা যেন মনকে আঘাত দেয়। মুহূর্তে স্তব্ধ হ'য়ে যান। পাতা ওলটাতে ওলটাতে শোনেন ওর কথা, যদিও বাইরে থেকে মোটেই বোঝা যায় না যে একটি কথাও শুনছে লোকটা। ক্রিসতফের উত্তেজনা বাড়ে, ভয় জড়তা কেটে যায়। আশ্বাস আর বিশ্বাসে বুক ভ'রে ওঠে। মুখর হ'য়ে ভাবী দিনের পরিকল্পিত ছবিখানি মেলে ধরে। হাসলার নীরব। ওর কথা শুনতে শুনতে আগের হাসলার জেগে ওঠে। ক্রিসতফ হাত থেকে গানের বইটা নিয়ে যায়, আপত্তি করেন না তিনি। তরুণ বুকের আবেগ ঢেলে নিজের রচনা ব্যাখ্যা করে ক্রিসতফ ; একটা কনুই পিয়ানোর ওপর আর একখানি হাত কপালে দিয়ে তাকিয়ে থাকেন হাসলার তরুণ শিল্পীর দিকে। মনে পড়ে যায় এমনি ক'রেই আরম্ভ হয়েছিল নিজের জীবন ; ক্রিসতফের মতই ওরও বুকের আশা স্বপ্নের দিগন্তে পাখা দিয়েছিল মেলে। কিন্তু ব্যর্থতা আর হতাশার সে এক বুক-ভাঙ্গা অধ্যায়। ক্রিসতফের জন্যও ভাবী দিনের এই একই লিখন—দিব্য-চোখে যেন দেখতে পান হাসলার। তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে মুখে।

পাছে কথার খেই হারিয়ে যায়, সেই ভয়ে চোখ তুলে চাইতে পারে না ক্রিসতফ। হাসলারের নীরবতায় আরও উৎসাহিত হ'য়ে

ওঠে। ও বুঝতে পারে হাসলারের সন্ধানী দৃষ্টি রয়েছে ওর ওপর; প্রতিটি কথা ওর শুনছেন মন দিয়ে; দু'জনের মাঝখানের দূরত্ব ঘুচেছে এবারে। মনে মনে বড় খুশি হ'য়ে ওঠে ক্রিসতফ; কথা শেষ ক'রে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকায় হাসলারের দিকে। ওই ব্যঙ্গ-ভরা মমতা-হীন, কঠিন অন্ধকার দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে চোখের নিমেষে ওর যত ভরসা, হৃদয়ের উদ্বেলিত আনন্দ যেন জমে বরফ হ'য়ে যায়। ও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কয়েক-মুহূর্ত পর কথা বলেন হাসলার—হিম নির্লিপ্ততা। এবার যেন আবার আর এক মানুষ। একটা ছদ্ম রূঢ়তার আবরণ ওপরে। বড় আশায় ক্রিসতফ হাসলারের সামনে খুলে ধরেছিল তার ভবিষ্যতের আশা আকাংক্ষার কথা। কিন্তু ফল ফলল বিপরীত। নিষ্ঠুর ভাবে বিদ্রূপ আরম্ভ করলেন ভদ্রলোক। ও বিদ্রূপ যেন ওর নিজকেই করা। ওই ওঁর নিজস্ব স্বরূপ। এতক্ষণে বুঝি নিজকে ফিরে পেয়েছেন শিল্পী। কঠিন হাতে ছেলেটার সব বিশ্বাস ভাঙ্গবেন ব'লে যেন পণ করেছেন। ওর আত্ম বিশ্বাস, জীবনের পরে বিশ্বাস, ওর শিল্পে বিশ্বাস, কিছুই যেন আর রাখবেন না। নিজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন সামনে। কোথায় রইল ওর সম্ভাবনাময়ী প্রতিভা, আর কোন পথ বা বেছে নিতে হ'ল ওকে সেই কথাই বলতে গিয়ে ভাষা রুচির সীমা ছাড়িয়ে যায়:

'যত সব শুয়রের পাল। এই চায় শুয়রগুলো। তুমি কি ভাবছ সঙ্গীত-রসিক দশটা মানুষও খুঁজে পাবে? দশটা কেন? একজনও আছে?'

'আছে, আমি আছি—' জোরের সাথে বলে ক্রিসতফ।

হাসলার কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকানী দিয়ে ক্লান্ত ভাবে বলেন:

'কিন্তু তুমিও ভেসে যাবে ওই গড্ডালিকা প্রবাহে। হাটের মানুষ যা ক'রছে, তুমিও তাই ক'রবে। কি ক'রে বড় হবে, নাম ক'রবে, কি ক'রে ভালো খেয়ে, ভালো পরে স্ফূর্তি ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দেবে ওই ধান্ধায়ই ঘুরবে আর দশ জনের মত। হয়ত এইই স্বাভাবিক…।'

ক্রিসতফ প্রতিবাদ ক'রতে চেষ্টা করে। কিন্তু মাঝখানে থামিয়ে দেন হাসলার। ক্রিসতফ-এর হাত থেকে বইখানি নিয়ে নিষ্ঠুর ভাষায় আলোচনা করতে আরম্ভ করেন। অথচ এক মুহূর্ত আগে এরই প্রশংসায় মুখর হ'য়েছিলেন। সত্যকারের ভুল ত্রুটির তো কথাই নেই; কিন্তু তা ছাড়া আরো যা বললেন তা নিতান্ত সেকেলে সংকীর্ণ দৃষ্টির সমালোচকের কথা; এবং সারা জীবন ওই কথাই ওঁকে শুনে আসতে হ'য়েছে, ওই বিড়ম্বনাই সইতে হয়েছে: বলেন: 'কি হবে এ সব দিয়ে? যত সব বাজে।' সাদা কথায় একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন ক্রিসতফকে। মুখ ফিরিয়েই ছিলেন হাসলার; কিন্তু হার মানতে হ'ল। ক্রিসতফের সুর-ঝংকারে ওর বিমুখ চিত্ত সাড়া না দিয়ে পারল না। কিন্তু জোর ক'রেই এত বড় ঘটনাটাকে দু'হাতে মুছে ফেলবার জন্য যেন মরীয়া হ'য়ে উঠেছেন ভদ্রলোক।

শিউরে ওঠে ক্রিসতফ। কোন উত্তর দেয় না। কি উত্তরই বা দেবে এমন অসম্ভব কথার! অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা ক'রে ভালোবাসে যাকে তারই মুখ থেকে এহেন কথা! নিজের কাছেই নিজে লজ্জায় মরে যায় ক্রিসতফ। তা ছাড়া জবাব দিলেই বা শুনবে কে? বন্ধ বইখানা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন হাসলার; ভাবলেশ-হীন চোখ… দৃঢ়-বদ্ধ ওষ্ঠে গভীর তিক্ততার কুঞ্চন। ক্রিসতফের অস্তিত্ব খ'সে পড়ে চেতনা হ'তে। অবশেষে বলেন:

'সব চেয়ে বড় দুঃখের ব্যাপার কি জান? কে বুঝবে তোমায়? একটা মানুষও তো খুঁজে পাবে না।'

আবেগে আত্মহারা হ'য়ে যায় ক্রিসতফ। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়, গভীর ভালোবাসায় হাতখানি গুরুর হাতের ওপর রেখে বলে :

'আমিই আছি যে!'

হাত সরিয়ে নিলেন না হাসলার। তরুণ চিত্তের এই আকুতিতে, কে জানে ওর হৃদয়ের কোন তারে ক্ষণিকের স্পন্দনও জাগল কিনা। নিষ্প্রাণ চোখ দু'টি তাকিয়ে আছে ক্রিসতফের দিকে। কিন্তু কোন আলোর ঝলক জাগল না তাতে। বিদ্রূপ আর অবজ্ঞা উচ্চারিত হ'য়ে উঠল, সেই নিরালোক দৃষ্টিতে। ক্রিসতফের উত্তরের স্বীকৃতি জানিয়ে মাথাটি নত করলেন। অত্যন্ত কায়দা-দুরুস্ত ভাবে হ'লেও ভঙ্গিটা লোক হাসানোর মত। বললেন :

'অত্যন্ত সম্মানিত হ'লাম।'

উঠলেন হাসলার। বইখানা পিয়ানোর ওপর ছুঁড়ে ফেলে মাকুর মত লম্বা দুটো পা ফেলে দিয়ে গট গট ক'রে এসে কৌচের ওপর বসলেন। ক্রিসতফের বুঝতে বাকী থাকে না লোকটার মনোভাব। দুঃসহ অপমান। মাথা সোজা ক'রে বুক ফুলিয়ে জবাব দিতে গেল—সবারই বুঝতে হবে তোমায় এমন কোন কথা নেই। এমন মানুষও আছেন যিনি একটা গোটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। তাঁরা ভাবেন মানুষের জন্য। এবং তাঁরা যা ভাবেন, জন-সমাজকে তাই ভাবতে হয়। কিন্তু কে শুনবে? আবার মুখ ফিরিয়ে বসেছেন হাসলার। ওঁর অন্তর্জীবন আজ তার শক্তি হারিয়েছে, তাই দরদী মানুষটা হারিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে। অতি সরল মানুষ ক্রিসতফ। এই আকস্মিক পরিবর্তন বুঝে উঠতে পারে না। ভাবলে হার হ'ল। কিন্তু জয় যে

হাতের কাছে এসেছিল! কেমন ক'রে হার মানবে এখন। মরীয়া হ'য়ে ওঠে ও। খাতা খানা নিয়ে যেসব জায়গাগুলো ত্রুটিজনক মনে হয়েছে হাসলারের কাছে, সেগুলো বোঝাতে চেষ্টা করে। থম্‌থমে মুখে নীরবে শুয়ে থাকেন হাসলার; হঁ্যা না কোনও কথাই নেই; শুধু প্রতীক্ষা করেন কতক্ষণে ওর শেষ হবে।

ক্রিসতফ দেখে কিছুতেই আর কিছু হবে না; বৃথা পরিশ্রম। মুখের কথা মুখে রেখেই খাতাখানা মুড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ে। হাসলারও ওঠেন। ক্রিসতফ লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হ'য়ে গেছে। বারে বারে ক্ষমা চায় জড়িত কণ্ঠে; হাসলার ছোট্ট একটুখানি নমস্কার করেন; তার মধ্যে বিরক্তি মেশান একটা রূঢ় আভিজাত্যের ভাব প্রখর ভাবে উচ্চারিত। হিম ঔদাস্থে হাতখানি বাড়িয়ে দেন ভদ্র ভাবে। দরজা পর্যন্ত এগিয়েও দেন; কিন্তু না রইল কোন সম্ভাষণ, না রইল থেকে যাওয়া বা আবার আসার নিমন্ত্রণ।

আর একবার রাস্তায় এসে দাঁড়ায় ক্রিসতফ—ভাঙ্গা বুকে। পা চলে নিরুদ্দেশ ভাবে; কোথায় যে চলেছে জানে না। যান্ত্রিক ভাবে কটা রাস্তা পার হ'য়ে এসে উপস্থিত হ'ল একটা ষ্টেশনে। যে গাড়ীতে এসেছিল সেই লাইনেই ষ্টেশনটি। কিছুই না ভেবে চিন্তে উঠে পড়ল গাড়ীতে, কোনো মতে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ল আসনে। সর্বাঙ্গে কোথাও এক বিন্দু শক্তি নেই। চিন্তা সব এলোমেলো হ'য়ে ছড়িয়ে গেছে। কিছু ভাবতে পারছে না, চেষ্টাও করছে না। নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে ওর ভয় করছে। ভেতরটা যেন একেবারে শূন্য হ'য়ে গেছে। শূন্য হ'য়ে গেছে সারা শহরটা। দম বন্ধ হ'য়ে আসছে: বড় বড় বাড়ীগুলি, কুয়াশার জাল —সব যেন ওর বুকের ওপর চেপে ব'সে ওর টুটি চেপে ধরছে। পালাও ক্রিসতফ, পালাও! পালাও! পালাও এখান থেকে। ওই একটি

মাত্র চিন্তা জেগে আছে ওর সম্বিতে—পালাতে হবে এ শহর থেকে যত তাড়াতাড়ি পারে। এখান থেকে পালালেই বুঝি ওর নিদারুণ স্বপ্ন-ভঙ্গের স্মৃতি মুছে যাবে।

হোটেলে ফিরে এল। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা। দু'ঘণ্টা আগে মাত্র এসে উঠেছিল এখানে। আলোয় আলো হ'য়েছিল বুক খানা তখন। এখন একেবারে মরে গেছে সে-আলো।

খেল না, ঘরে পর্যন্ত ঢুকল না! শুধু বিল চাইলে। অবাক হ'য়ে গেল সবাই। রাতের টাকা সুদ্ধ দিয়ে—'চললাম' ব'লে বেরিয়ে প'ড়ল। বোঝালে সবাই এখন শিগ্‌গির কোন ট্রেণ নেই, কোথায় গিয়ে ঘুরবে তার চেয়ে হোটেলে থেকে বিশ্রাম করুক। কিন্তু না, কারো কথা কানে তুলবে না। ষ্টেশনে সে তক্ষুনি যাবে। ছেলেমানুষী জিদ্‌। প্রথমে যে গাড়ী পাবে, উঠে বসবে তাতেই, যেখানকার গাড়ীই হোক। যত শিগ্‌গির পারবে এ-শহর ছাড়তে হবে। ছুটি নিয়েছিল শুধু হাসলারের সাথে দেখা করার জন্য নয়, এখানকার মিউজিয়ম দেখবে, কিছু কনসার্ট শুনবে দু'চারজনের সাথে আলাপ পরিচয় করবে। এতদূর ওর পরিশ্রম ক'রে আসা, অর্থব্যয়, সব তলিয়ে গেল—শুধু একটা কথা ওর সর্ব-সম্বিৎ আচ্ছন্ন ক'রে রইল : যেতে হবে···

সুতরাং এল ষ্টেশনে। ঠিকই ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে গাড়ী নেই। তারপরও যেটি আছে সেটি এক্সপ্রেস নয় [ সব থেকে সস্তা ক্লাসএই যেতে হবে ওকে ] রাস্তায় থামতে থামতে যায়। আর একটা গাড়ী আছে—ঘণ্টা দু'এক পরে ছাড়ে কিন্তু দুটো একই সময়ে প্রায় পৌঁছয়। এটাতে গেলেই ভালো হ'ত। কিন্তু তাতে আরো দু'টি ঘণ্টা এ শহরে কাটানো! অসহ্য। সুদীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা ঠায় ব'সে রইল; বিরাট, অন্ধকার শূন্য হলগুলি যেন হাঁ ক'রে আছে। অবিশ্রান্ত কোলাহল;

অহরহ কত বিচিত্র ছায়াদের কর্মব্যস্ত আনাগোনা। মুহূর্ত দাঁড়াবার সময় নেই কারো, এত তাড়া। অথচ ওর কাছে সব অর্থ-হীন! অচেনা, নূতন মুখ সব। একটি পরিচিত দরদী বন্ধুর মুখ নেই এ-মিছিলে। ঝাপসা দিনের আলো নিবে এল ধীরে ধীরে! বিজলী বাতি জ্ব'লে উঠল কুয়াশার ঠুলির আড়ালে। চাপা আলো রাত্রির বুকে ছ'ড়িয়ে প'ড়ে কালো রাতকে কালোতর ক'রে তুলল। সময় যায়; বড় মন্থর তার গতি। দুঃসহ হ'তে দুঃসহতর হ'য়ে ওঠে প্রতীক্ষা। কয়েক মিনিট পরে পরেই ট্রেণের সময়-লেখা বোর্ডটা গিয়ে দেখে, ঠিক সময় দেখেছে তো! সময় কাটাবার জন্য আর একবার ওটা আগা-গোড়া পড়তে আরম্ভ ক'রল। হঠাৎ একটা জায়গার নাম চোখে প'ড়ল। জায়গাটা যেন চেনা চেনা। চিন্তা ক'রতে ক'রতে মনে প'ড়ে যায় এখানেই তো থাকেন বুড়ো গুলজ্—সেই যিনি ওকে কয়েকখানা সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন অনেক উৎসাহ দিয়ে। আজ এই দুঃখের মুহূর্তে কেন জানি বড় ইচ্ছে হ'ল একবার যায় সেই অদেখা বন্ধুর কাছে। ঠিক রাস্তায় পড়ে না জায়গাটা—আর একটা ব্রাঞ্চ লাইনে ঘণ্টা কয়েক পথ। অর্থাৎ সারাটা রাত্রিই কাটবে পথে, বার দুই তিন গাড়ী বদল, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ীর জন্য হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকা। হঠাৎ ঠিক ক'রে বসল যাবে; এসব অসুবিধার কথা ভাবলে না। যেখান থেকে যে ভাবে হোক একটু সহানুভূতির আজ বড় দরকার ওর। সুতরাং আর মুহূর্ত ভাববার সময় দিলে না নিজেকে; সোজা গুলজ্-এর কাছে টেলিগ্রাম ছেড়ে দিলে পরের দিন সকালে পৌঁছুচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলে, তাই তো এটা কি হ'ল! অনুতাপের আর সীমা রইল না। সেধে আবার দাগা খাওয়া! মরীচিকার পেছনে ছোটার কি আর অবসান হবে না? কিন্তু এখন ভেবে আর লাভ নেই। ফিরবার উপায় নেই আর।

শেষ পর্যন্ত ওই কথাই ওলট-পালট হ'তে থাকল মনের মধ্যে। সব কিছুরই শেষ আছে, প্রতীক্ষার শেষ হল। ট্রেণ এল। সব থেকে আগে ছুটে গিয়ে চড়ে ব'সল ক্রিসতফ। ট্রেণ চলতে আরম্ভ ক'রলে তবে পাগল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ছে; জানালার মধ্য দিয়ে দেখা যায় শহরের প্রান্ত-রেখা মিলিয়ে যাচ্ছে মেঘলা আকাশের কালোয়। ওর মনে হয়, আজের রাতটা ওখানে কাটাতে হ'লে ও মরেই যেত।

ঠিক এমনি সময়ে—সন্ধ্যা প্রায় ছ'টায় হাসলারের কাছ থেকে ক্রিসতফের নামে একখানা চিঠি এল হোটেলে। ক্রিসতফের সাক্ষাৎ আলোড়ন জাগিয়েছে ওর মনে। সারাটা বিকেলে অত্যন্ত তিক্ত মনে এসব কথাই ভেবেছে ব'সে ব'সে। মন কেমন ক'রেও উঠেছে—বেচারা এত দূর থেকে আগ্রহ শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছিল। আর ও তাকে বিদেয় ক'রল অনাদরের মুষ্টি-ভিক্ষা দিয়ে! রাগ হয় নিজের ওপর। আসলে এ যে ওর ইচ্ছাকৃত তা ঠিক নয়। মাঝে মাঝে কি যে হয়, মেজাজ বিগড়ে যায় অকারণে, সামলাতে পারে না। ভেবেছিল—অপেরার একটা টিকিট পাঠিয়ে দেওয়া যাক ছেলেটাকে; এবং অনুষ্ঠানের পর একটা সময় ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে কথাবার্তার জন্য, হয়ত কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে। বেচারা ক্রিসতফ, এ সব কিছুই জানতে পারলে না।

ক্রিসতফকে অপেরায় না দেখতে পেয়ে হাসলার ভাবেন, রাগ হয়েছে ছেলের। হোক, বয়ে গেল। অত্যন্ত চ'টে যান।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন, ক'রে চ'লে গেলেন।

রাত গেল, ভোর হ'ল। একটি রাত্রির ব্যবধান। কিন্তু কোথায় ক্রিসতফ। কত দূরে চ'লে গেল সে···! অনন্ত কালের পথ চলায়ও এ দূরত্ব ঘুচবে না। চির বিচ্ছেদের দুই প্রান্তে ছিটকে পড়ল হাসলার আর ক্রিসতফ

পীটর গুলজ-এর বয়স পচাত্তর। স্বাস্থ্য কোন কালেই ভাল ছিল না। দীর্ঘ দেহটি নুয়ে গেছে—মাথাটি ঝুঁকে পড়েছে প্রায় বুকের কাছে। গলাটি ব্যাধিগ্রস্ত; সর্বদা নিশ্বাসের কষ্ট। হাঁপানী, সর্দি-কাশি, ব্রংকাইটিস প্রায় জীবনের সাথী। রাতের পর রাত বালিশে মাথা ঠেকিয়ে উপুড় হ'য়ে ব'সে উপোসী ফুস্‌ফুস দুটোয় বাতাসের যোগান দিতে গলদ্‌ঘর্ম হন। সে কি মর্মান্তিক সংগ্রাম একটুখানি নিশ্বাসের জন্য! পরিষ্কার ক'রে কামান মুখের প্রতি রেখায় সে-সংগ্রামের ইতিহাস তীক্ষ্ণ অক্ষরে লেখা। লম্বা নাকটা ডগার দিকে একটু ফোলা। দাঁত প'ড়ে যাওয়ায় গাল গেছে ব'সে। চোখের নীচ থেকে আরম্ভ ক'রে থুথ্‌নির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সে বসা-গাল জুড়ে জরার রেখা যেন কেটে কেটে বসা। একটা পরিপূর্ণ মানুষের পরিপূর্ণ অবসানের সকরুণ মূর্তি। জীবন তার বেদনার ভাণ্ড উজাড় ক'রে দিয়েছে গুলজকে। সেই বেদনার পাহাড় কেটে কুঁদে বিশ্ব-ভাস্কর এই মূর্তি গড়েছেন। কিন্তু তবু সদানন্দ গুলৃজ। ওষ্ঠের প্রসারে কি গভীর ভালোবাসা! কি গভীর প্রশান্তি। হাল্কা সবুজ রং-এর স্বচ্ছ চোখ দুটিতে মানুষটির সমস্ত আত্মা উদ্ভাসিত। শান্ত গভীর সহজ প্রাণখোলা মানুষ, উদার আকাশের মত তার নিরাবরণ ব্যাপ্তি। কি যেন আছে ওই চোখে। জরাজীর্ণ মুখখানি অপরূপ হ'য়ে আছে দুটি চোখের কোমল আলোয়।

জীবন ঘটনা-বহুল নয়। স্ত্রী মারা গেছেন পঁচিশ বছর। সুদীর্ঘ নৈঃসঙ্গ বহন ক'রে আসছেন অনপচীত প্রেমে। রূপ গুণ বুদ্ধি সবই মহিলাকে ভগবান দিয়েছিলেন কৃপণ হাতে। কিন্তু স্বামীর হৃদয়ে মহেশ্বরী হ'য়ে রইলেন ওই নিগু'ণা মেয়ে। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর প্রতিটি রাতে শোবার আগে বিদেহিনী প্রিয়ার সাথে জমত ইহলোক-বাসী

স্বামীর অনুরাগে-রাঙ্গা, ব্যথার রাগিনীতে আলাপ যেন। একটি রাতও ভুল হয়নি। ঘর-কন্না যেদিন ছিল, সে-দিনের মত আজও এপারের মানুষটির সর্ব-কর্মের অংশ-ভাগিনী হ'য়ে আছেন ওপারের মানুষটি। সন্তান-হীনতার দুঃখ বেদনায় এনেছিল রিক্ততা। এবং সেই রিক্ততাকে মর্যাদা দিয়েছিলেন গুলজ বুভুক্ষু হৃদয়ের বাৎসল্য ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে। ছাত্রদের তিনি পুত্র স্নেহেই বুকের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রতিদান পেয়েছিলেন সামান্যই। কৃতজ্ঞতা অবশ্য পেয়েছেন কখনও কখনও ছাত্রদের কাছ থেকে। কারণ, তাদের ভালো-মন্দ সর্বদাই তাঁর নিজের ভালো মন্দ হ'য়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে এসে দেখাও ক'রে যেত কেউ কেউ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হ'য়ে যাবার পর তারা চিঠি-পত্র লেখে কিছু দিন। তারপর বন্ধ হ'য়ে যায়। উত্তর কালে তাদের উন্নতির খবর পান সংবাদ পত্রের পাতায় পাতায়। স্নেহময় গুরু আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে ওঠেন, যেন তাঁর নিজেরই কৃতিত্ব। ছাত্ররা চিঠিপত্র না লিখলে কখনও আঘাত পাননি মনে; নিজেই হাজার রকমে তাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। কখনও তাদের গুরুভক্তির ওপর সংশয় প্রকাশ করেননি। এমন কি, সব চেয়ে যে স্বার্থপর ছেলে—তার সম্বন্ধেও ওই একই কথা। যে বুক-ভরা স্নেহ ছাত্রদের ঢেলে দিয়েছেন, বিশ্বাস করতেন শিষ্যের দলও অমনি ভালোবাসাই বাসে গুরুকে।

কিন্তু সব চেয়ে বড় আশ্রয় ওঁর পুঁথির পাতায়। তারা ভোলেও না, ভোলায়ও না। বিশেষ ক'রে যাঁদের লেখা ওর ভালো লাগে, বৃদ্ধের কাছে এক পরম বিস্ময় তাঁরা। বিচিত্র তাঁরা, মানুষের বুদ্ধির অগোচর। এক গভীর প্রেমের উপলব্ধিতে অনন্তকালের বুকে শাশ্বত হ'য়ে রইলেন। সেই প্রেমের বাণী অক্ষয় হ'য়ে রইল শ্রদ্ধাবানদের জন্য। গুলজ ছিলেন

নন্দন-শাস্ত্র ও সঙ্গীতেতিহাসের অধ্যাপক। বুড়ো অধ্যাপক নন গুলজ। কত কালের ওই শ্যামলা গাছটা।...কত পাখীর গানে গানে রোমাঞ্চিত...কত রকমের কত গান! কত দূর হ'তে ভেসে আসা; কত যুগ যুগের কথা কয় তারা। মিঠে লাগে না শুনতে। কোন কোন গান, মনে হয় যেন বড় চেনা; একেবারে আপনার বুকের ভাষা। প্রত্যেকটি কথা কলি যেন ওঁর অতীত জীবনের চেতন মনের অবচেতন মনের সুখ দুঃখের সুরে সুরে বাঁধা। আবার কোন কোনটা একেবারে অচেনা। কোনোদিন শুনেছে ব'লে মনে হয় না। এত কালের তোমার যত না-পাওয়া চাওয়ার ধন, ওরা যেন তারি খবর আনে। আর তোমার ভুখারী হৃদয় উন্মুখী হ'য়ে ওঠে বৃষ্টিধারার জন্য পিয়াসী পৃথিবীর মত। সুতরাং বৃদ্ধ গুলজ তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের স্তব্ধ একান্তে ব'সে কান পেতে শোনেন পাখীর কলোচ্ছাস-রণিত বনানীর গুঞ্জরণ; সেই যে রূপকথায় আছে মায়া-পাখীর গানের মায়ায় কোন এক মঠের সন্ন্যাসী ঘুমিয়ে ছিলেন কতকাল; তেমনি ক'রে কাল চ'লে গেল মুগ্ধ অধ্যাপকের ওপর দিয়ে; এল জীবনের সন্ধ্যা। কিন্তু বৃদ্ধের মনখানা সেই বিশ বছরের সীমায় এসে ঠেকে রইল চিরদিনের মত।

শুধু সঙ্গীত নয়, কাব্য-রসিকও ছিলেন অধ্যাপক। পুরানো নূতন সব রকম কবিতা ভালোবাসেন। বিশেষ ক'রে ভালোবাসেন নিজের দেশের কবিতা। এবং তারও মধ্যে গ্যেটে সব চাইতে প্রিয়। অন্যদেশের কবিতাও যে ভালো না বাসতেন তা নয়। পাণ্ডিত্য অসাধারণ; ভাষা জানেন অনেক কটা। জার্মানীকে সমস্ত অন্তর দিয়ে পূজা করেন। কিন্তু তার সম্বন্ধে নেই ওর দর্প। হার্ডার বলেছেন: 'স্বদেশ সম্বন্ধে যাহারা অহংকার করে তারা মূর্খ।' আর কবি শিলার ব'লেছেন: 'শুধু নিজের দেশের জন্য লেখা সংকীর্ণ দৃষ্টিরই পরিচায়ক।'

দুজনের মধ্যেই অধ্যাপক আপন অন্তরের প্রতিধ্বনি খুঁজে পান। মনটা বড় ভীরু। কিন্তু হৃদয়খানি বিশাল: সৌন্দর্যের অভিসারী। পৃথিবীর কত সৌন্দর্যকে স্বাগত করবার জন্য হৃদয়টি মেলাই থাকে। সাধারণ মানুষের ওর কাছে ছিল বিশেষ প্রশ্রয়। অথচ গুণ বিচারে ভুল করেননি কখনও। জনসাধারণের তারীফ-পাওয়া বাজে আর্টিষ্টদের খুব শক্ত কথা ব'লে গাল দিতে না পারলেও মৌলিকত্ব ও প্রতিভার পরিচয় পেলে জনমতের উপেক্ষা থেকে তাদের রক্ষা করতে কখনও দুর্বলতার পরিচয় দেননি। ওঁর অত্যধিক নরম মনই ছিল ওঁর বড় বিপদ। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতেন যেন কারো ওপর অবিচার না হয়। অতএব দশের রুচির সাথে নিজের রুচিটা যখন মিলত না, ঠিক ক'রে নিতেন ভুলটা ওঁরই। নিজের ভালোলাগাটা তাদের সাথেই মিলিয়ে নিতেন। ভালোবাসা আর ভালোলাগাকে ছড়িয়ে দিয়ে কি সুখই যে পেতেন। এই খাঁটি মানুষটির নিষ্ঠা-পূত হৃদয়টির পক্ষে ওই দু'টি জিনিসের যতটা দরকার তা বোধ হয় তার দুর্বল ফুসফুসের পক্ষে হাওয়ারও অতটা দরকার ছিল না; সুতরাং মস্ত বড় বুকখানার শুভ্র ভালোবাসাটুকুকে প্রকাশ করবার অবকাশ যারা দিলে তারা যে ওর কত বড় কৃতজ্ঞতার পাত্র, তা শুধু জানত ওঁর অন্তর। ক্রিসফের লাইডারটি যে-দিন হাতে এসে পড়েছিল অধ্যাপকের, কি সমাদরে যে তা অভিনন্দিত হয়েছিল, ক্রিসতফ ভাবতেও পারে না। নিজের সৃষ্টিকে সে নিজে হয়ত এর ভগ্নাংশও দিতে পারেনি। ওর চিত্তলোকে যে আগুনে রাঙ্গা হ'য়ে উঠেছিল, ওর গানগুলো, ওর হিসেবে তারি ক'টি স্ফুলিঙ্গ—ছিটকে বেরিয়ে এসেছে বাইরে: অমনি আরো কত বেরুবে। কিন্তু শুল্‌জের কাছে তো তা নয়—তাঁর কাছে এ যে আবির্ভাব! একটা নূতন জগৎ আলোর কমল হ'য়ে সহসা দল মেলে

বিকশিত হ'য়ে উঠল।··· 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোক পুলকে' একটা নিখিল দ্যুলোক ভূলোক প্লাবিত হয়ে গেল। ওঁর জীবন সেই আলোয় আলোময় হ'য়ে গেল।

এক বছর হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে ইস্তফা দিয়েছেন অধ্যাপক। ক্রম-ক্ষীয়মান স্বাস্থ্যে পড়ানোর মেহনৎ সয়নি।

রোগ-শয্যায় শুয়ে গুলজ। উল্‌ফস্ লাইব্রেরী নতুন যত সঙ্গীতের যই পান সংগ্রহ ক'রে নিয়মিতভাবে পাঠিয়ে থাকেন তাঁকে। এমনি একটি পার্শ্বেল এল—ক্রিসতফের লাইডারখানিও ছিল তার মধ্যে। বাড়ীতে কেউ ছিল না, কোনও আত্মীয় স্বজন কেউনা। একেবারে একা বৃদ্ধ। হেফাজতী করে পুরানো পরিচারিকাটি। তার মালিকানায় নির্ভর করতে হয় রুগ্ন মনিবকে। মাঝে মাঝে আসেন বন্ধু-বান্ধব কেউ কেউ—তাঁদের বয়স প্রায় ওরই মত। স্বাস্থ্যের অবস্থাও প্রায় তাই। সুতরাং আবহাওয়া খারাপ হ'লে, তাঁদেরও ঘর থেকে বেরুবার উপায় ছিল না। সুতরাং এই দেখা-সাক্ষাৎটুকুও ঘটে উঠত না। শীতের দিন তখন। রাস্তা বরফে ঢাকা। অনেক দিন কারো দেখা মেলেনি। গুলজ-এর ঘরের মধ্যে অন্ধকার। খোলা জানালার পথটা পীতাভ ঘন কুয়াশায় ঢাকা—যেন হলদে পরদা ঝুলছে জানালায়; দৃষ্টির সামনে থেকে বাইরের পৃথিবীটাকে সম্পূর্ণ আড়াল ক'রে রেখেছে। কেমন একটা ভারী, দম-রুদ্ধ-করা উত্তাপ উঠছে অগ্ন্যাধার থেকে। পাশের গির্জার সপ্তদশ শতাব্দীর তৈরী ঘণ্টাগুলো বাজে পোনের মিনিট পরে পরে—সেই পুরানো একঘেয়ে সুরে, থেমে থেমে, তালে বেতালে; গুলজ-এর ধূসর মনের তটে বড়ো গম্ভীর থম্‌থমে তার প্রতিধ্বনি বাজে। স্তূপীকৃত বালিশে হেলান দিয়ে কাশছিলেন আর প্রিয় কবি ম তাঁর কাব্য পড়বার চেষ্টা করছিলেন ফাঁকে ফাঁকে। অন্য দিনের মত কেন

জানি আজ বইটা পড়তে ভালোলাগছিল না। হাত থেকে পড়ে গেল বইটা, তুললেন না। হাঁপাতে হাঁপাতে কোন সুদূরের স্বপ্নে হারিয়ে গেল মন। বই-এর পার্শ্বেলটা পাশে প'ড়ে। খুলতে সাহস হচ্ছিল না। মনটা আজ কেমন যেন বিষাদে ছাওয়া। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পার্শ্বেল খুললেন সন্তর্পণে। চশমাটা পরে পড়তে আরম্ভ করলেন গানের বইগুলো। মনটা জানি আজ কোথায়। কোন স্মৃতির রাজ্যে কেবলি ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছুতেই বাধা মানছে না।

ক্রিসতফের বইখানিই রয়েছে হাতে। হঠাৎ চোখ পড়ে যায় একটা গীতাংশের ওপর—সতের শতকের কোনও এক অতি ধর্মপ্রাণ, সরল-হৃদয় কবির লেখা—ক্রিসতফ শুধু ঢেলে সাজিয়েছে হাল আমলের ধাঁচে।

"ওরে হতাশ,
তোমার তরেই আশার আগুন জ্বালা;
কঠিন হাতে দুঃখে দহন করি,
নির্ভয়ে পথ চলা।
আঁধার ঘরের দুয়ার দেরে খুলি
এবার যে শেষ পহর গোনা তোর;
আনন্দেরি সূর্য তোরি লাগি
রাঙ্গিয়ে দেবে দুঃখ রাতের ভোর।"

বৃদ্ধ শুলজ এর আগেও প'ড়েছেন এ কবিতা! কিন্তু আজএর প্রতিটি শব্দ যেন বাংময়। এমন গভীর আত্মীয়তার সুরটি তো আর কখনও…। নিবিড় নির্ভরতায় এই যে সুরটির অপূর্ব স্নিগ্ধ একতানে

ঘুম-পাড়ানী গানের মত বিক্ষুব্ধ অন্তরে বড় গভীর শান্তি বিছিয়ে দিয়ে যায়।...গুলজ-এর মনে হয় ওর আপন অন্তরের সাথে এর কোথায় যেন মিল আছে। না শুধু মিল নয়—ও চিনেছে এ ওরই আত্মার ভাষা! কিন্তু সে এই জরাজীর্ণ, দুর্বল মানুষের এতটুকু আত্মা নয়। সে আরও সতেজ, আরও শক্তিধর। কঠিন পথ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে চলেছে সামনে: আশার বাতিখানি জ্বালিয়ে রাখতে চেষ্টা ক'রছে। অতন্দ্র চোখ দুটি রয়েছে খোলা; কবে আড়াল ঘুচিয়ে খোলা দৃষ্টির সামনে আনন্দের দেবতা আবির্ভূত হবেন। হাত কাঁপতে থাকে বৃদ্ধের। ধারায় ধারায় ছোখের জল গড়ায় গাল বেয়ে! প'ড়ে চলেন:

"ওরে ওঠরে এবার ধূলোর শয্যা ছাড়ি,
দুঃখ গুলি উড়িয়ে দে তোর যত
ঝোলাঝুলি ঝাড়ি।"

অদ্ভুত! অদ্ভুত! ক'রেছে কি ক্রিসতফ! কোথায় পেলে এমন দৃপ্ত প্রাণ! এমন কিশোরের মত উদ্দাম আবেগ! এর পরের কটি লাইন আরো চমৎকার। কি অকৃত্রিম সরলতা আর গভীর বিশ্বাস, একখানা বলিষ্ঠ প্রাণের খোলা হাসিতে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে:

মনে রাখিস্,
তোর উপরে নাই ভুবনের ভার,
রাজার রাজা আছেন, তাঁরে
সকল সঁপি করিস নমস্কার।

সব চেয়ে শেষের অংশগুলির কি অপরূপ নির্ভীক ভঙ্গি! তরুণ শিল্পীর তেজী ঘোড়ার মত মনের কাছে বিশেষ ক'রে ভালো লাগায় মূল থেকে অবিকল উদ্ধৃত হ'য়েছে এই অংশটি :

"যতই তাঁরে আঘাত হানুক
অধম জনে,
রুদ্র আমার অটল রবেন
আপন সিংহাসনে।
তাঁর ইচ্ছাটি সফল হবেই, করিস্‌নে সংশয়
বজ্র যে তাঁর বাঁশী হ'য়ে বাজবে ভুবনময়।"

...তারপর কি উদ্বেল আনন্দের জোয়ার...অসম্বৃত রণোন্মাদনা... রোমক বীরের বিজয়োল্লাস যেন বাঁধ ভেঙ্গে গেছে...

বৃদ্ধের সারা দেহ রোমাঞ্চিত। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে পাতার পর পাতা পড়ে যায়—বুক কাঁপে, চোখের জলে বুক ভাসে। কম্পিত কণ্ঠ আবেগে উচ্ছ্বসিত হয় : 'ওঃ ভগবান!...ভগবান!...'

কান্না হাসি মিশে যায়। একি সুখ! প্রবল কাশির বেগে দম বন্ধ হ'য়ে আসে। পরিচারিকা সেলোমে দৌড়ে আসে। অবস্থা দেখে চমকে ওঠে...এই বুঝি শেষ। বৃদ্ধের কাশির সাথে সাথে শোনা যায় তার আবেগভরা কণ্ঠ : 'ভগবান!...ভগবান!...'

মাঝে মাঝে নিমেষের জন্য কাশি থামলেই হাসতে থাকেন বিকার-গ্রস্তের মম। পাগল হ'য়ে গেল নাকি বুড়ো?—ভাবে সেলোমে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে যায় ওর কাছে। গায়ের ঝাল মিটিয়ে বকতে আরম্ভ করে :

'মাথা খারাপ না হ'লে একটা গান প'ড়ে অমন করে কেউ। দিন তো দেখি ওটা আমার হাতে। সরিয়ে রেখে দিচ্ছি। খবদরার আর ওটা হাতে ক'রেছেন তো।'—

কিন্তু কাশতে কাশতেও শক্ত ক'রে হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছেন বইখানা গুলজ। ঘর থেকে চ'লে যাবার জন্য ধমকান সেলোমেকে। একা থাকবেন। বড় দরকার একা থাকার। কিন্তু কিছুতেই যাবে না সেলোমে। বৃদ্ধ আরো রেগে যান, আরো জোরে জোরে গাল দেন ; এবং উত্তেজনায় আরো বেশী কাশির ঝোঁক ওঠে। অবাক হ'য়ে যায় সেলোমে, এত দিনের মধ্যে রাগতে তো কখনও দেখেনি মনিবকে। কখনও তো এমন ক'রে জেদ করেননি কিছু নিয়ে। ভয় পেয়ে ও হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু গাল দিয়ে শোধ নেয়। বলে, ভীমরতী ধ'রেছে বুড়োর। এতদিন ও ভেবেছিল ভদ্রলোকের কাছে আছে। ছিঃ, অমন ভাষা ভদ্রলোকের মুখে। শুনলে চাষাভুষোও যে লজ্জায় মুখ ঢাকবে। বাপ্‌রে বাপ্‌ চোখগুলো কি! ঠিকরে বেরিয়ে আসছে গর্ত থেকে। চোখ না হ'য়ে যদি পিস্তল হ'ত ও দুটো তাহ'লে ওর মাথাটা আর ঘাড়ের ওপর থাকত না এতক্ষণ!···সেলোমের মুখ চলছে তো চলছেই। আর সহ্য ক'রতে না পেরে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়েন গুলজ ভয়ংকর রেগে। কঠিন হুকুমের স্বরে চিৎকার ক'রে ওঠেন :

'যাও, যাও বলছি বেরিয়ে।'

দরজাটাকে ধড়াস ক'রে বন্ধ ক'রে বেরিয়ে যায় সেলোমে রাগে গজরাতে গজরাতে : বেশ যাবে, বেরিয়েই যাবে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা শুকিয়ে ম'রে গেলেও আর এ মুখো হবে না। দেখে নেয় যেন বুড়ো।

ঘরখানা অন্ধকার হ'য়ে আসে, ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

সন্ধ্যার স্নিগ্ধতার বুকে গির্জার ঘণ্টাগুলি বেজে বেজে যায় শান্ত প্রখরতায়। বড় লজ্জা ক'রছে, কি ক'রে অত ধৈর্য হারালেন আজ! বুকের মধ্যে তুফান। চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছেন, নিথর, নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ। নিশ্বাসও বুঝি প'ড়ছে না। কখন বুকের এ ঝড় থামবে। কখন শান্ত হবে মনের আকাশ! ক্রিসতফের লাইডারখানা বুকে আঁকড়ে ধরে থেকে থেকে শিশুর মত হেসে উঠছেন জোরে জোরে।

পরের কয়েকটা নিঃসঙ্গ দিন এক বিপুল আনন্দের তরঙ্গে নেচে নেচে ভেসে গেল। অসুস্থতার কথা মনে নেই, মনে নেই এসেছে শীত, আলোর রং গেছে ফিকে হ'য়ে, মনে নেই আছেন শূন্য ঘরে। চারদিক এক অরূপ আলোয় আর অরূপ ভলোবাসায় অপরূপ হ'য়ে গেছে। মৃত্যু এসে একখানা হাত তো ধ'রেছে। এই অবেলায়ও এক অচেনা বন্ধুর তরুণ বুকের স্পন্দনের মধ্যে নিজের জীয়ন-মন্ত্র শুনতে পেলেন বৃদ্ধ শুলজ। বৃদ্ধ শুলজ নূতন ক'রে আবার বেঁচে উঠলেন।

বৃদ্ধের কল্পনায় ক্রিসতফের যে ছবি-খানি ফুটে ওঠে, তার সাথে রাস্তার মানুষটির কোন সাদৃশ্য নেই। প্রাণের অনুধ্যানে ভালোবাসার রং ফলিয়ে ফলিয়ে আঁকা ভালোবাসার জনের ছবি—গৌরকান্তি তনু পেলব দেহ; স্নিগ্ধ নীলচ্ছায় দু'টি চোখ; অচঞ্চল, শান্ত স্নিগ্ধ ভীরু কোমল কণ্ঠস্বর…। ছাত্র, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সেলোমে পর্যন্ত আশে পাশের সবাইকে ও সব কিছুকে অমনি ক'রে আদর্শের রংএ রাঙ্গিয়ে নেন। ওটা তাঁর স্বভাব। অত্যন্ত স্নেহশীল, শান্ত প্রকৃতি; বিশ্লেষণ করেন না, মনের শান্তি নষ্ট হয়ার ভয়ে করতে চানও না। কাজেই মানুষটির দুনিয়ায় যারা আছে তারা প্রায় ওঁর নিজেরই প্রতিচ্ছবি, অমনি শান্ত সমাহিত, অমনি শুভ্রতায় মণ্ডিত। মিথ্যা বটে, কিন্তু উদার মিথ্যা। শুলজ-এর বেঁচে থাকার জন্যই এ মিথ্যাটুকু বড় দরকার।

ষোল আনাই যে ঠকেন তা নয়। চব্বিশ ঘণ্টার জীবনে ছোট বড় বহু ব্যাপারে আদর্শবাদে ঘা লাগে। রাতের অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হয় সেসব কথা। জানেন, সেলোমে আড়ালে ওকে কত ঠাট্টা করে; এও জানেন দু'হাতে সে লুটছে। বুঝতে পারেন ছাত্রদের ভক্তি তাদের স্বার্থের দড়িতে বাঁধা। প্রয়োজন ফুরুলেই গুরুর সাথে আর কোন সম্পর্ক নেই। ক'দিনই বা হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়েছেন; এরই মধ্যে সহকর্মীরা ভুলেছেন; ওঁর স্থলাভিষিক্ত যিনি, নানা লেখায় ওঁকে তিনি আক্রমণ করেন নানা ভাবে কত তুচ্ছ কথা, তুচ্ছ ভুলের নজিরে [ সমালোচনার প্রশস্ততম পন্থা ]। এই তো বিকেল বেলার কথা—মুখের সামনে পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলতে বন্ধু কুঁলজ-এর বাঁধল না। দিন কয়েকের নাম ক'রে আরেক বন্ধু যে বইগুলো নিয়ে গেলেন সে আর পাওয়া যাবে না, হ'লে কি হবে বইএর সাথে বৃদ্ধের নাড়ীর যোগ এবং একখানা বই যাওয়া যেন অভাগার একখানা পাঁজরার হাড় খ'সে যাওয়া। সবই জানেন, বোঝেন সবই গুলজ। এমনি নূতন পুরানো বহু ঘটনাই আছে; বহু কথাই মনে হয়। চাননা মনে ক'রতে। কিন্তু ঠেকাতেই বা পারেন কোথায়? সব যে অনু-ভূতির পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। এক এক সময় তীব্র ব্যথার মত একেবারে কেটে বসে বুকের মধ্যে।

'ভগবান! ... ভগবান! ...' ভাষা-হীন বুক-ভাঙ্গা চাপা আর্তনাদ রাত্রির নিস্তব্ধতার বুকে আছড়ে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবেন···না না একি। দুইহাতে সর্বনেশে ভাবনাগুলিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেন। একি ভাবছেন মানুষের সম্বন্ধে! মানুষের মধ্যে সত্য যে এখনও আছে। সেই সত্য বিশ্বাস যে রাখতেই হবে। আশা দিয়ে হৃদয়কে বাঁধতে চেষ্টা করেন প্রাণপণে। তবু নিষ্ঠুর আঘাতে চোখের ঘোর

কেটে যায়। কিন্তু আবার লাগে ঘোর নূতন ক'রে। নইলে বাঁচতো না এ মানুষ।

অদেখা মানুষ ক্রিসতফ শুল্‌জ-এর জীবনে আগুন হ'য়ে জ্ব'লে উঠল আলোর উষ্ণতায়। সেই ক্রিসতফেরই প্রাণ-স্পর্শ-বর্জিত কাঠখোট্টা প্রথম চিঠি। হয়ত বড় আঘাত পেতেন—[ পেয়েছিলেন কিনা তাইবা কে জানে ! ] কিন্তু স্বীকার করেন নি পেয়ে থাকলেও। বরঞ্চ শিশুর মত খুশি হ'য়ে উঠেছেন। এমনি লাজুক মানুষ ছিলেন, মানুষের কাছে তাঁর দাবী ছিল সামান্য! এতটুকু পেলেও তাই ছিল ওঁর ঢের। তাইতেই ভালোবাসায় কৃতজ্ঞায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠতেন। ওই দু'টি জিনিস ছিল ওঁর বৃদ্ধের জীবনের আসল রসদ ; ও না হ'লে বাঁচতেন না উনি। দেখতে ইচ্ছে করত এই অদেখা বন্ধুকে। কিন্তু অতখানি আশা করবার সাহস নেই। নিজের দেহ অক্ষম ; যাওয়ার উপায় নেই। ক্রিসতফকে আসতে লিখবেন, সে-কথা মনে আসেই নি।

সে-দিন সন্ধ্যেবেলা, খেতে যাচ্ছেন, ঠিক এমনি সময় এল ক্রিসতফের টেলিগ্রাম। প্রথমটা বুঝতেই পারেন নি কিছু। ভাবছেন, নিশ্চয়ই কোন ভুল হ'য়েছে, এ টেলিগ্রাম ওঁর নয়। একবার, দুইবার, তিনবার পড়লেন। উত্তেজনায় চশমাটা বারবার নাক থেকে খসে প'ড়তে লাগল। ল্যাম্পটার আলোও যেন কম ; অক্ষরগুলো নাচতে থাকে চোখের সামনে। তারপর যখন সত্যি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হ'ল, উচ্ছ্বাসে খেতে গেলেন ভুলে। সেলোমে চিৎকার করে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। গলা দিয়ে খাবার নামতে চায় না। ন্যাপকিনটাকে ভাঁজ না ক'রে [ যা কক্‌খনও করেন না ] অমনি ছুঁড়ে ফেলে উঠে পড়েন ; হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে লাঠি আর টুপীটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বন্ধুদের খবর দিতে। এতবড় একটা খবর সবাইকে না বিলিয়ে একা একা ভোগ

করবেন কি ক'রে বৃদ্ধ শুল্‌জ। তাই প্রথম কথাই মনে হ'ল খবরটা বন্ধুদের দিতে হবে।

বিচারক স্তামুয়েল কুনজ আর দাঁতের ডাক্তার অস্কার পটপেটশ্মিড বন্ধুদের মধ্যে এ দু'জনেই ক্রিসতফের কথা জানেন এবং গভীর আগ্রহ পোষণ করেন শুল্‌জ-এর মত। চমৎকার গাইতে পারেন অস্কার। প্রায়ই তিন বন্ধুতে মিলে ক্রিসতফ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গাওয়া হয় ওর রচনা যখন যা হাতের কাছে আসে; অস্কার গান করেন, শুল্‌জ বাজান আর কুন্‌জ শোনেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আনন্দের তরঙ্গে ওদের হৃদয় নাচে। কতদিন গাইতে গাইতে মনে হয়েছে, অহো যদি থাকত এখন ক্রিসতফ।

অত বড় একটা সুখের খবর বহন ক'রে আনন্দে ভাবতে ভাবতে পথ চলেন শুল্‌জ। হাসেন নিজের মনে। শহরের বাইরে থাকেন কুন্‌জ। আধঘণ্টার পথ প্রায়। সন্ধ্যা হয়েছে, কিন্তু অন্ধকার হয়নি। এপ্রিলের কোমল সন্ধ্যা, স্বচ্ছ আকাশ। নাইটিঙ্গেল পাখীর গানে পাগল হ'য়ে উঠেছে দিক্‌ দিগন্তর। বৃদ্ধের বুক কাঁপে উদ্বেল সুখে। আজ নিশ্বাস নিতে কষ্ট নেই; চলার গতিতে সেই বালক কালের হাল্কা হাওয়া লেগেছে। অন্ধকারে হোঁচট খেলেন বহুবার। ভ্রূক্ষেপ নেই আজ; লম্বা লম্বা পা ফেলে আনন্দে চলেন। গাড়ী টারী এলে হাল্কা পায়ে অনায়াসে পাশ কাটান বিদ্যুৎ গতিতে। গাড়োয়ানদের ডেকে আত্মীয়তা করেন। গাড়ীর ঢিমে আলোয় অবাক হ'য়ে তারা দেখে রাস্তার চড়াই-কাটা এই অদ্ভুত বৃদ্ধকে।

গ্রামের একধারে একটা বাগানের মধ্যে কুন্‌জের বাড়ী। শুল্‌জ যখন পৌঁছুলেন তখন পুরো রাত। দরজায় ধাক্কা দিয়ে গলা সপ্তমে চড়িয়ে ডাক দিলেন শুল্‌জ। একটা জানালা খুলে যায়, তার মধ্যে

উঁকি মারে গৃহস্বামীর ভীত মুখ। সন্ত্রস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন তিনি : 'কে ওখানে ?'

শুলজ হাঁপাতে হাঁপাতে নাচতে নাচতে খুশির খবর দেয় : 'আরে ক্রাফ্‌ট আসছে হে, ক্রাফট···কাল সকালেই···।'

স্বরটা চিনতে বাকী থাকে না, কিন্তু কিছুই বুঝতে না পেরে বলে : আরে শুল্‌জ যে···! কি হে ব্যাপার কি ? এত রাত্তিরে ?'

শুল্‌জ আবার বলেন : 'কাল সকালেই যে আসছে হে!'

কুন্‌জ আরো হকচকিয়ে যায় : 'কি বলছ, মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা।'

'ক্রাফ্‌ট,' চিৎকার ক'রে ওঠেন শুল্‌জ।

খানিকক্ষণ মাথা চুলকান দাঁড়িয়ে কুন্‌জ। তারপর হঠাৎ উল্লাসে চিৎকার ক'রে ওঠেন। বেশ বোঝা যায় এবারে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে তাঁর। বলেন চিৎকার ক'রে : 'দাঁড়াও হে, আসছি আমি।'

বন্ধ হ'য়ে গেল জানালাটা। পরক্ষণেই সিঁড়ির ওপর আলো হাতে একটি মূর্তি দেখা যায়। ছুটতে ছুটতে আসছেন কুন্‌জ। ছোট খাটো মোটা-সোটা মানুষ, মস্ত বড় মাথা ভরা ধবধবে সাদা চুল ; লাল দাড়ি, গায়ের লোম অবধি লাল। ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটেন। মুখে চীনে-মাটির পাইপ। চেহারাটায় কেমন ঘুম ঘুম ভাব। বড় ভাল মানুষ। জীবনে কোন কিছু নিয়েই বিশেষ মাথা ঘামাননি কখনও। শুলজ যে খবরটি দিলেন তাতে ভারি উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন বৃদ্ধ। ল্যাম্প শুদ্ধ খাটো হাতখানি নেড়ে আবার শুধান :

'য়্যাঁ, কি বললে ? আমাদের সেই ক্রাফট ! সত্যি আসছে, য়্যাঁ ?'

'আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহ'লে আর বলছি কি ! এই দেখ।' ব'লে বিজয়ীর ভঙ্গিতে টেলিগ্রাম খানা নাড়তে থাকেন মাথার ওপর তুলে।

একটি লতা-ঝাড়ের মধ্যে গিয়ে দুই বন্ধুতে ব'সে পড়েন একটা আসনে। শুলজ ল্যাম্পটা তুলে ধরেন। অতি সন্তর্পণে টেলিগ্রামটির ভাঁজ খোলেন কুনজ। ফিস্ ফিস্ ক'রে ধীরে ধীরে, একটি একটি অক্ষর ক'রে পড়েন। বন্ধুর কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শুল্জ জোরে জোরে পড়েন নিজে। কুনজ কাগজখানার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকেন; কখন কোথা থেকে করা হ'য়েছে টেলিগ্রাম; কখন পৌঁছেছে, এখানে, ক'টা শব্দ সব খুঁটে খুঁটে পড়া হ'য়ে গেলে সযত্নে ভাঁজ ক'রে মহামূল্যবান কাগজখানা ফিরিয়ে দেন বন্ধুর হাতে। শুল্জ-এর মুখ গভীর আনন্দের হাসিতে ঝল্মল্ ক'রছে। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন কুন্জ:

'চমৎকার ··· কি বলো ··· চমৎকার···'

খানিকক্ষণ ভেবে, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে শুল্জ-এর হাঁটুতে হাত রেখে বলেন: 'পটপেটশ্মিড্‌কে তো দিতে হয় হে খবরটা!'

'এক্ষুণি যাচ্ছি ওখানে।' উত্তর দেন শুল্জ।

'চলো, আমিও যাই।' কুন্জ বলেন।

ভেতরে গিয়ে বাতিটা রেখে আসেন। তারপর দুই বন্ধু চলেন হাত ধরাধরি ক'রে। গাঁয়ের আর এক প্রান্তে পটপেটশ্মিড্-এর বাড়ী। দু'একটা খাপ-ছাড়া কথা ছাড়া আর কোন কথা হ'ল না রাস্তায়। দু'জনেরই মনের মধ্যে খবরটা গুঞ্জন ক'রে ফেরে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন কুন্জ। লাঠিটা মাটিতে ঠুকে বলেন:

'এই যাঃ। সে তো নেই হে এখানে।'

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেছে একটা অপারেশন আছে শহরে। বিকেলেই যাবার কথা ছিল পটপেটশ্মিড্-এর। সেখানে থাকতে হবে দিন দুই।

ভারী মুষড়ে পড়েন দু'জনে। পটমেটশ্মিডই তো আসল মানুষ। তাকেই যদি না দেখান গেল তো হ'ল কি ?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকেন পথের মাঝখানে।

'এখন উপায় ?' জিজ্ঞাসা করেন কুন্জ।

শুল্জ বলেন: 'ক্রাফটকে শোনাতেই হবে পটমেটশ্মিড-এর গান।' তারপর একটু ভেবে বলেন: 'একটা টেলিগ্রাম ক'রে দেখা যাক।'

পোষ্টাফিসে এসে দু'জনে মিলে খুব উচ্ছ্বসিত ভাষায় যা মনে এল তাই দিয়ে চওড়া এক টেলিগ্রাম ক'রলেন। তারপর ফিরে চললেন। শুল্জ বলেন: 'টেলিগ্রাম পেয়েই যদি রওনা হয়, কাল ভোরেই এসে পৌঁছে যাবে।'

কুন্জ মনে করিয়ে দেন: 'তা হবেনা। এত রাতে যাবেনা টেলিগ্রাম, কাল ভোরে যাবে।'

মাথা নাড়েন শুল্জ: 'তাইতো, ভারী মুস্কিল! কপালটাই খারাপ।'

কুন্জকে পরের দিনের নেমন্তন্ন ক'রে, তার দরজা থেকে এগিয়ে চললেন শুল্জ। শত বন্ধু হ'লেও এত রাতে শুল্জকে এগিয়ে দিতে অতদূর যাবেন সে-পাত্রই নন কুনজ। রাস্তার মোড়টুকু পর্যন্তও গেলেন না। একলা ফিরে আসতে হবে অন্ধকারে। আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত হ'য়ে ওঠেন শুল্জ:

'কাল দিনটা কেমন হবে কে জানে।'

কুন্জ আবহাওয়া সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন কিছু। গম্ভীরভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন [ ছোট্ট শহরটির সমস্তটুকু সৌন্দর্য ক্রিসতফকে দেখানর আগ্রহ শুল্জ এর চাইতে কম নয় তাঁর ]: 'না না কাল খুব ভালো দিন থাকবে দেখো।'

এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। অনেকবার হোঁচট গেলেন গুলজ। পথে এক মিষ্টির দোকানে গিয়ে শহরের সব থেকে ভালো নাম করা একটা মিষ্টির অর্ডার দিয়ে গেলেন। কিন্তু বাড়ীর দোর গোড়ায় এসেই মনে পড়ে গেল ষ্টেসনে গিয়ে ট্রেণের ঠিক সময়টা জেনে আসতে হবে। এ সব ক'রে বাড়ী ফিরে এসে বসলেন সেলোমের সাথে কালকের খাওয়া দাওয়া কি হবে না হবে তার পরামর্শ করতে। সব সেরে শুতে বিছানায় গেলেন বটে, কিন্তু ঘুম এলনা। খৃষ্ট-মাসের সময় ছোট ছোট ছেলে পুলেদের যেমন হয়, উৎসাহে উত্তেজনায়, ওর অবস্থাও ঠিক তেমনি হ'য়ে রইল। ছট্‌ফট্ করেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে। রাত তখন প্রায় একটা, হঠাৎ মনে হ'ল একটা বিশেষ তরকারীর কথা। ক্রিসতফকে খাওয়াতেই হবে ওটা। ভারী চমৎকার রঁাধে ওটা সেলোমে, ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে ব'লে আসেন। কিন্তু ভয়ে পারলেন না। তবে উঠে পড়লেন। ক্রিসতফের জন্য ঘর গোছাতে লাগলেন অতি সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে, পাছে সেলোমে টের পায়। তা'হলে বকে আর কিছু রাখবে না মেয়েটা। ভারী ভয় বৃদ্ধের সেলোমের বকুনীকে। ট্রেণ সেই ভোর আটটায়! কিন্তু সারা রাত ভয়ে ভয়ে কাটল পাছে উঠতে দেরী হ'য়ে যায়। ঠিক সময় ষ্টেশনে যাওয়া হবে না তাহ'লে। খুব সকালেই উঠে পড়লেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সত্যি কথাই বলেছিল কুন্জ। চমৎকার দিন হয়েছে। পা টিপে টিপে প্রথমে গেলেন 'সেলারে'-এ। বহুদিন আসেননি এ-ঘরে ঠাণ্ডা আর বিশ্রী সিঁড়িটার ভয়ে। উৎকৃষ্ট মদের বোতল কটা বেছে নিয়ে যেই দাঁড়াতে যাবেন, মাথাটা ছাদে সাংঘাতিক ভাবে ঠুকে গেল। অনেক কষ্টে সামলে বোতল ভরা ঝুড়িটা নিয়ে ওপরে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ওঁর দম বন্ধ হ'য়ে যেতে লাগল। তারপর কাঁচি হাতে নিয়ে

এলেন বাগানে। গাছগুলোকে একেবারে নেড়া মুড়ো ক'রে নিষ্ঠুরের মত ভালো ভালো গোলাপ কাটলেন ; লিলাক গাছে সবে ফুল ফুটেছে ; তার গোছাটাও বাদ গেল না। নিজের ঘরে এসে কামাতে বসলেন তারপর। তাই কি স্থির হ'য়ে বসতে পারেন ! কত জায়গা যে কেটে রক্তারক্তি হ'য়ে গেল। কোনমতে কামানোটা শেষ ক'রে জামা কাপড় প'রে পোষাকটা একটু যত্ন করেই ক'রে বেরিয়ে পড়লেন ষ্টেশনের দিকে। সেলোমে চেঁচাতে চেঁচাতে পেছন পেছন ছুটে এল, কিন্তু এক ফোঁটা চুটও খাওয়াতে পারল না পাগল মনিবকে ; অতিথিও তো না খেয়েই আসছে। এক সাথেই খাবেন দু'জনে।

প্রায় তিন কোয়ার্টার আগে এসে পৌঁছোলেন তবু ক্রিসতফকে ধরতে পারলেন না শুলজ। প্রথমতঃ, টেলিগ্রামে স্পষ্ট লেখা থাকা সত্বেও, ভগবান জানেন কেমন ক'রে ট্রেণটাই ভুল হ'ল। দ্বিতীয়ত, গেটের কাছে যদি একটু ধৈর্য ধরে দাঁড়াতেন, তা হ'লেও বা হত। কিন্তু তা না ক'রে প্লেটফরম ময় খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। জন সমুদ্রের মধ্যে নিজেই গেলেন হারিয়ে। তৃতীয়তঃ, সম্মানিত অতিথি যে শেষ পর্যন্ত চতুর্থ শ্রেণী থেকে নামবেন, কি করেই বা ভাববেন তা। ট্রেণ এসে যাওয়ার পরেও প্রায় আধঘন্টা খোঁজাখুঁজি করলেন ষ্টেশনে। এদিকে অনেক আগেই পৌঁছে গেছে ক্রিসতফ। এবং সোজা সে বাড়ী চ'লে এসেছে। কিন্তু অদৃষ্টে ভোগ থাকলে ঠেকাবে কে। ক্রিসতফ এসে দেখে দরজায় তালা ঝুলছে, কেউ নেই বাড়ীতে। সেলোমে বাজারে বেরিয়েছে। পাশের বাড়ীর ঝিকে ভালো ক'রে বলে গেছে, এই এল ব'লে। কেউ যদি আসে, চ'লে যেন না যায়। ও মেয়ে ক্রিসতফকে খবরের প্রথম অংশটা দিলে কিন্তু পরেরটুক আর বলেনি। ক্রিসতফ অবাক। সেলোমে টেলোমে আবার কে। তাকে ও চেনেনা,

তার সাথে কোনও দরকারও নেই ওর। কিন্তু বাড়ীর কর্তা কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতের অধ্যাপক হের গুলজ? না, তিনিও নেই বাড়ী। কোথায় গেছেন ওবাড়ীর ঝি তা বলতে পারে না। ক্রিসতফ রেগে কাঁই হ'য়ে হন্ হন্ ক'রে পথে নেমে এল।

মুখ কালো ক'রে বাড়ী ফিরলেন গুলজ। সেলোমেও এই একটু আগেই এসেছে। শুনলেন সব কাণ্ডকারখানা। প্রায় কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ। চেঁচামেচী শুরু করলেন, বাড়ী খালি ফেলে সেলোমে বাজারে গেল: উনি ফিরে আসা পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করেনি সে? যদি বা গেল কেন ভালো ক'রে বলে রেখে যায়নি ক্রিসতফকে বসিয়ে রাখতে। সোলামেও পাল্টা জবাব দেয়, কি ক'রেই বা জানবে সে যে বুড়োর এতখানি ভীমরতি ধরেছে! সাত সকালে উঠে ছুটল ষ্টেশনে অথচ মানুষটাকে খুঁজেই পেলে না। কিন্তু আর মুহূর্ত দাঁড়ান না গুলজ। পাশের বাড়ীর লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে চেহারা ইত্যাদির যেটুকু নিশানা পেলেন তাই নিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লেন ক্রিসতফের খোঁজে।

ক্রিসতফের ভয়ানক রাগ হয়েছে, রীতিমত অপমান বোধ করছে। সংবাদ দিয়ে এল, অথচ লোকটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল? কেন থাকতে পারল না বা কিছু বলেও তো রেখে যেতে পারত! ফিরে যাবার ট্রেণের এখনও দেরী আছে। কি করা যায়? শহরটাকেইঘুরে দেখা যাক। দূরে ওই দেখা যায় এলিয়ে পড়ে-থাকা মাঠগুলি। বড় সুন্দর তো। ক্রমশঃ ঢালু হ'য়ে-আসা পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট শহরটি, কোন হট্টগোল তাড়াহুড়ো নেই। সর্বত্র একটা শান্ত আরামের হাওয়া। বাড়ীতে বাড়ীতে ফুলের বাগান; ফলন্ত চেরী গাছ, সবুজ লন, স্নিগ্ধ ছায়া-ঝরান বড় বড় মনোহর গাছের দলে বিচিত্র রূপ। কিছু কিছু পুরানো কালের ধ্বংশ-চিহ্ন এখানে ওখানে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে মর্মর-স্তম্ভের

ওপর কালে কালের রূপসী রাণী আর রাজকুমারীদের শুভ্র মর্মর প্রতিমূর্তি···চারদিকে দেখা যায় শুধু পাহাড় আর শ্যামলী মাটি। গাছে গাছে ফুলের মেলার মধ্যে ব্লাকবার্ডদের খুশির শিষে শিষে অর্কেষ্ট্রা জমে উঠেছে। ক্রিসতফের মনের গ্লানি এই রূপ-রস-গন্ধের উৎসবে কোথায় হারিয়ে গেল। পীটার গুলজ-এর কথাও মনে রইল না আর।

এদিকে বৃদ্ধ গুলজ পাগলের মত ছুটোছুটি করছেন রাস্তায় রাস্তায়, যাকে সামনে পাচ্ছেন জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়াচ্ছেন তারা ক্রিসতফকে দেখেছে কি না? শহরের প্রায় প্রান্তে পাহাড়ের ওপরকার দুর্গ পর্যন্ত গেলেন। হতাশ হ'য়ে আসছিলেন ফিরে। হঠাৎ মনে হ'ল দূরে কাঁটা-ঝোপটার ছায়ায় ঘাসের ওপরে কে যেন শুয়ে আছে। ঠিকই দেখেছে বৃদ্ধের তীক্ষ্ণ চোখের দূর-পাল্লার দৃষ্টি। ক্রিসতফ নয় তো? দেখেনওনি তো এপর্যন্ত লোকটাকে। তা ছাড়া লোকটা এদিকে পেছন ফিরে শুয়ে আছে! মুখও দেখা যাচ্ছে না থামের আড়ালে। তা হ'লে? কি ক'রে একটা নিশানা পাওয়া যায়? পা টিপে টিপে এগিয়ে যান। বুকের মধ্যে তুফান ওঠে; হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো সে···না না, সে তো নয়···

ডাকবার সাহস নেই। হঠাৎ একটা মতলব এল মাথায়। গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন:

ওঠরে এবার ধূলোর শয্যা ছাড়ি
দুঃখ বালাই উড়িয়ে···

ডাঙ্গায় তুললে যেমন ক'রে লাফিয়ে ওঠে মাছ, তেমনি ক'রে লাফিয়ে উঠল ক্রিসতফ। আপনা থেকে সাড়া দিল ওর কণ্ঠ:

···দে তোর যত
ঝোলাঝুলি ঝেড়ে।

কে গায় ওর গান? খুশি-ঝরা চোখ দু'টি চারধারে খোঁজে। মুখ লাল,

মাথার চুল ঘাসে ভরা। ওদিক থেকে ডাক আসে, ক্রি-স-ত-ফ! এদিকে তার প্রতিধ্বনি জাগে—হের গু-ল্-জ!! ছুটতে আরম্ভ করেন দু'জনে। গুল্‌জ রাস্তার ধারের নয়ানজুলি পার হ'য়ে ছোটেন, ক্রিসতফ লাফিয়ে ডিঙ্গোয় মাঠ-পাড়ের বেড়াটা। দু'জনের উচ্ছ্বসিত করমর্দনে অন্তরেব আবেগ ঝ'রে পড়ে। প্রাণ-খোলা হাসি আর কথায় মশগুল হ'য়ে পথ চলে দু'জনে। বৃদ্ধ শোনান ষ্টেশন থেকে ওকে না পেয়ে ফিরে আসার কাহিনী। এই তো একটু আগেই রেগে টেগে ঠিক ক'রেছিল ক্রিসতফ গুল্‌জের সাথে দেখা না ক'রে পরের ট্রেণেই বাড়ী ফিরে যাবে। বৃদ্ধের স্নেহ-ভরা শুভ্র হৃদয়-খানি সেই রাগ ভুলিয়ে ভালোবাসায় ওর বুক ভরিয়ে দিলে। কতটুকুই বা বাড়ী আসার পথ। এরই মধ্যে বহু মনের কথা বলা হ'য়ে গেল। সমবয়সীর মত অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠল অসমবয়সী বৃদ্ধ আর তরুণ।

কুন্‌জ এসেছিলেন ঠিক সময়ে। সব ব্যাপার শুনে চুপচাপ ব'সে অপেক্ষা ক'রছিলেন। প্রাতরাশ এল। ক্রিসতফ ব'ললে একটা হোটেলে খেয়ে নিয়েছে সে। গুল্‌জ-এর মুখখানা কালো হ'য়ে উঠল। প্রথম খাওয়াটাই বাইরে খেতে হ'ল অতিথিকে! গৃহে তার স্থান হ'লো না! অত্যন্ত ছোট, সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু স্নেহশীল মনের কাছে তা অমূল্য। আর এ যে কতখানি আঘাত পেল বৃদ্ধ, বুঝতে বাকী রইল না ক্রিসতফের। বেশ কৌতুকও লাগল মনে মনে। কিন্তু আরো বেশী ক'রে ভালোবাসতে ইচ্ছে হয় মানুষটিকে। খুশি করার জন্য বলে: 'যা খিদে পেয়েছিল। হোটেলের খাওয়ায় কি আর পেট ভ'রেছে।' শুধু কথাই নয়, কাজেও কথাটার সত্যতা প্রমাণ হ'য়ে গেল।

ওর মন বলে, ওরে এবারে তুই সত্যিকারের সুহৃদের দেখা পেয়েছিস। গভীর আশ্বাসে ওর মনের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে গেল। ওর

ভ্রমণ কাহিনী, হাসলারের সাথে সাক্ষাতের কাহিনী হাল্কা রসে মিশিয়ে শোনায় সবাইকে। গুলৃজ-এর চোখ মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। এমনি একাগ্র চিত্তে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, দৃষ্টি দিয়ে পান করেন ক্রিসতফকে যেন উচ্ছ্বসিত হাসির মধ্যে বৃদ্ধের প্রাণখানা গ'লে গ'লে ঝ'রে পড়ে।

তিন জনের মধ্যেকার বন্ধনের সূত্র ক্রিসতফের সঙ্গীত-প্রতিভা। ধীরে ধীরে আলাপের মোড় ফিরে আসে ওইখানে। উৎসুক হ'য়ে আছেন গুলৃজ কখন ক্রিসতফ তার নিজের গান বাজিয়ে শোনাবে। বাজাতে বলবার সাহস হয়না। ক্রিসতফ ঘরের মধ্যে পায়চারী ক'রে ক'রে কথা বলে। এক সময় পিয়ানোটার কাছে আসে ও। কুন্‌জ আর গুলৃজ উদগ্র কামনায় আর ঘন প্রতীক্ষায় কাঁটা হ'য়ে থাকেন। একটুখানি থামুক ক্রিসতফ যন্ত্রটার পাশে। কথা ব'লতে ব'লতে আনমনে ব'সেও পড়ে পিয়ানোর সামনেকার টুলটার ওপর এক একবার। পিয়ানোর দিকে না তাকিয়ে চাবিগুলোর ওপর দিয়ে আঙ্গুলগুলো অমনি নেচে যায় এক একবার। দুই বৃদ্ধের হৃদয়-পিণ্ডের ওঠা-পড়ায়ও নাচন লাগে। কথা ব'লতে ব'লতে এলো মেলো টুংটাং ক'রে চলে ক্রিসতফ। ধীরে ধীরে ওই এলেমেলো টুংটাংই যাদু লাগায়। কথা থেমে যায়, সুর জাগে পিয়ানোর বুকে শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায়। দুই বন্ধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণভাবে সুখের হাসি হাসেন।

ক্রিসতফ ওর লাইডার থেকে একটা বাজাতে বাজাতে জিজ্ঞাসা করে: 'জানেন এটা?'

উল্লসিত হ'য়ে জবাব দেন গুলৃজ: 'জানি! শুধু জানি বলছ কি হে!'

'ধ্যেৎ, বিচ্ছিরি আপনার পিয়ানোটা।' মুখ না ফিরিয়েই বলে

ক্রিসতফ। মুষড়ে এতটুকু হ'য়ে যান বৃদ্ধ। অত্যন্ত লজ্জিত কণ্ঠে বলেন : 'আমারই মত বুড়ো হ'য়ে গেছে ওটা, কি করি বল।'

ফিরে তাকায় ক্রিসতফ। বয়স হ'য়েছে, সেই অপরাধেরই মার্জনা ভিক্ষা যেন বৃদ্ধের দুই চোখে। হেসে ফেলে ক্রিসতফ। শুল্‌জ-এর দুই হাত ধ'রে বলে :

'ওরে বাস্! কে বলে আপনি বুড়ো! আপনি তরুণের রাজা।'

উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন শুল্‌জ ; দেখান জরাজীর্ণ দুর্বল দেহটাকে।

ক্রিসতফ বলে : 'বা রে বা! তাই বলছি বুঝি আমি। আমি ঠিকই ব'লেছি, মোটেই ভুল বলিনি। তাই না কুন্‌জ?' [এরই মধ্যে সম্বোধনে 'শ্রী' টি খ'সে গেছে।]

কুন্‌জ খুব জোরে জোরে সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়েন। শুল্‌জ ভাবেন, তাহ'লে পিয়ানোটার বেলায়ও বোধহয় ওই কথাই খাটবে। ভীরু ভাবে বলেন : 'কতগুলি সুর এখনও এর ভারী মিষ্টি আছে।'

ব'লে টিপলেন ক'টা চাবি। ঠিকই ব'লেছেন অধ্যাপক, বোঝে ক্রিসতফ—পুরোনো বন্ধু। শুল্‌জ-এর চোখের দিকে তাকায়। এবং চোখ দু'টির কথা ভাবতে ভাবতে বলে : 'ওটার চোখ দু'টো যে ভারী সুন্দর র'য়েছে এখনও।'

আলো হ'য়ে ওঠে শুলজ-এর মুখ। পিয়ানোর প্রশংসায় মুখর হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু থেমে যান। ক্রিসতফ বাজাতে আরম্ভ করে। লাই-ডারের পর লাইডার বেজে চলে। ধীরে ধীরে গায় সাথে সাথে। ওর আঙুলের ওঠা পড়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন শুলজ জলভরা চোখে। কুন্‌জ হাত দু'খানা পেটের ওপর জোড় ক'রে রেখে বন্ধ ক'রে তন্ময় হ'য়ে এলিয়ে প'ড়ে আছেন। ক্রিসতফ মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে তাকায় দুই বন্ধুর দিকে।

'দেখেছেন, কি চমৎকার এটা ?—এটা ?  এটা কেমন বলুন তো! আচ্ছা এবারে দেখুন তাহ'লে, এমনি একখানা বাজাব, আপনাদের চুল শুদ্ধ নাচতে শুরু ক'রে দেবে···'এমনি ক'রে চলে ওর উচ্ছ্বাস।

যেন স্বপ্ন ছেনে তৈরী সুর। প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। এমনি সময় হঠাৎ ঘরের কোকিল ঘড়িটা উঠল বেজে। ক্রিসতফ চমকে উঠে রেগে চিৎকার ক'রে উঠল। কুনজও যেন হঠাৎ জেগে উঠলেন। তাঁর চোখও রাগে লাল। শুলজ বুঝতেই পারেননি ব্যাপারটা কি। তারপর যখন চোখে প'ড়ল, ওই পাখীটা লক্ষ্য ক'রেই ক্রিসতফের চেঁচামেচি, তখন ওঁরও মনে হ'ল তাইতো শব্দটাতো ভারী বিশ্রী। একটা চেয়ার টেনে আনলেন, নামিয়ে ফেলবেন অভদ্র ঘড়িটাকে। চড়তে গিয়ে উল্টে পড়লেন প্রায়। কুন্‌জ থামালেন। কিছুতেই আর চেয়ারে উঠতে দিলেন না। অগত্যা সেলোমেকে ডাকেন শুলজ। ধীরে আস্তে তার অভ্যস্ত মন্থরতায় আসে সেলোমে। ঘড়িটা এসে হাতের মধ্যে পড়ে বিনা ভূমিকায়। হকচকিয়ে যায় সেলোমে। ক্রিসতফের তর সয়নি; সেলোমে আসবার আগেই সে ওটা পেড়ে ফেলেছে।

'কি করতে হবে শুনি?' বিস্মিত সেলোমে জিজ্ঞাসা করে।

'যা খুশি। কিন্তু খবরদার, আমাদের চোখের সামনে যেন না থাকে ওটা।' বলেন শুলজ, ক্রিসতফের মতই অধীর হ'য়ে। অবাক হ'য়ে ভাবেন, এতদিন ওটাকে বরদাস্ত ক'রেছিলেন কি ক'রে।

সেলোমে ভাবে সব ক'টা পাগল জুটেছে এক সঙ্গে।

পিয়ানো বেজে চলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। সেলোমে এসে ব'লে গেল খাবার তৈরী। শুলজ ধমকে দেন তাকে। মিনিট দশেক পরে আবার এল, এবং আরো দশ মিনিট পর আর একবার। রেগে আগুন হ'য়ে আছে সেলোমে। ওকে ঘর থেকে চলে যেতে

প্রাণপণে ইশারা করেন গুলজ। কিন্তু সেলোমে এবার শক্ত হয়েছে। মনিবের নিষেধ গ্রাহ্য ক'রলে না। খন্খনে আওয়াজে ফেটে প'ড়ল :

'খাবার আপনারা ঠাণ্ডা, পোড়া যেমন খুশি খান, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। খালি কখন খাবেন, দয়া ক'রে সেটুকু ব'লে দিন। তাহ'লেই ল্যাঠা চোকে।'

গুলজ প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। তারপর ধমকে উঠলেন। ক্রিসতফ উঠল হোঃ হোঃ ক'রে হেসে। কুন্জও হেসে ফেললেন। এবং শেষ পর্যন্ত গুলজও না হেসে থাকতে পারলেন না। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটাতে পেরে সেলোমে মহোল্লাসে ফিরে গেল। এমনি ওর অনুকম্পা মাখানো ভঙ্গি যেন মহারাণী তাঁর দুষ্টু প্রজাদের দুই হাত তুলে প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে ব'লে গেলেন : 'তোদের আমি ক্ষমা করলাম।'

ক্রিসতফ উঠে পড়ে পিয়ানো থেকে। বলে : 'বেচারী ঠিকই বলেছে।'

টেবিলে এসে বসল সবাই। বিরাট আয়োজন। সেলোমে তার গুণপনা দেখাতে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি। গুলজ-এর কাছ থেকে খোঁচা খেয়ে কেবল এমনি সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল সে। অবিশ্যি সুযোগের তার অভাব ঘটে না। গুলজ-এর পুরানো বন্ধুরা খাইয়ে মানুষ। টেবিলে বসলে কুন্জ-এর চেহারাই বদলে যায়। পেটটা বরানের থলি হ'য়ে ওঠে। লোকটিকে দিয়ে রেস্তরাঁর বিজ্ঞাপনের কাজ চলত ভাল। গুলজও কম নন। অসুখ বিসুখেই ঠেকিয়ে রাখে যা। তবে কিন্তু সব সময় পরোয়া বিশেষ করেন না, এবং ভুগতেও হয়। তবে খেয়ে অসুখ ক'রলে বিশেষ নালিশ থাকে না ; সান্ত্বনা থাকে, অনাচার ক'রেছেন। কুনজ-এর মত গুলজ-এরও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিশেষ বিশেষ কতগুলি পছন্দ আছে। সুতরাং পাকা খাইয়েদের জন্য

রেঁধে হাত পেকেছে সেলোমের। কিন্তু আজ একেবারে এলাহী কাণ্ড। যত রকম রান্না জানা ছিল, কিছু বাকী রাখেনি। টেবিলটার ওপর একটি ছোট খাট রন্ধন শিল্পের প্রদর্শনী। বাপ-ঠাকুরদার আশ্চর্য ভোজন-ক্ষমতার উত্তরাধিকার পেয়েছে ক্রিসতফ। তাঁরা আস্ত একটি হাঁস এক গ্রাসে খেয়েছেন। ক্রিসতফের ভারী আনন্দ এত খাবার দেখে। একটা রাক্ষসের খাওয়া খেয়ে ফেললে ও। শুলজ-এর মুখ চোখ থেকে স্নেহ গলে গলে পড়ে। ভালো ভালো মদ এনে ওর গ্লাসে ঢেলে দেন। কুনজ-এরও মুখ খুশিতে ঝলমল করে ক্রিসতফের খাওয়া দেখে। ওর মনে হয় ক্রিসতফ যেন ওর ছোট ভাইটি। সেলোমের মস্ত বড় মুখখানায় আনন্দ যেন আর ধরে না। ক্রিসতফ আসার আগে ওর বিষয় এত শুনেছিল মনিবের কাছ থেকে যে ও ভেবেছিল ও খেতাব-খেলাত ওয়ালা মস্ত বড় হোমড়া চোমড়া ব্যক্তি। কিন্তু ওকে দেখে দুই চোখ কপালে তুলে ব'লেছিল : 'ও মাঃ! এই নাকি?'

সে যাই হোক ওর খাওয়া দেখে ও বেজায় খুশি। আজ পর্যন্ত ওর গুণের এত বড় সমঝদার আর মেলেনি। সাধারণতঃ খাবার টেবিলে দিয়ে ও রান্নাঘরে চ'লে যায়, কিন্তু আজ দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। ক্রিসতফ খায় আর উদ্ভট উদ্ভট কথা বলে। কোমরে হাত দিয়ে হোঃ হোঃ ক'রে হেসে আকুল হয় সেলোমে। সবাই কি যে খুশি হ'য়েছে বলা যায় না। পট্‌মেটশ্মিড নেই সেই দুঃখটা খোঁচা হ'য়ে আছে এই আনন্দের মধ্যে। ঘুরে ফিরেই তার কথা আসে বার বার : আঃ থাকত যদি সে। ওর মত অমন খেতে কেউ পারে না, হাসতেই কেউ পারে না। শেষ যেন আর হ'তে চায় না অনুপস্থিত বন্ধুর কথা! দেখতে পেলনা ক্রিসতফ…বুঝতো তাহ'লে কি মানুষ সে। তা পাবে বোধ হয়। এসে যাবে সন্ধ্যে বেলাই…।

ক্রিসতফ বলে : 'রাত্তিরে তো আমি থাকব না। আমায় যেতে হবে।'

গুলজ-এর উদ্ভাসিত মুখখানা মুহূর্তে কালো হ'য়ে যায়। গলা ধ'রে আসে ব'লতে গিয়ে : 'কি ? চ'লে যাবে ? না না তাকি হয় !'

'সে কি, আমার না গেলে তো চলবে না। আর রাতের ট্রেণ ধরতেই হবে।' হাসতে হাসতে বলে ক্রিসতফ।

গুলজ-এর মনটা বড় খারাপ হ'য়ে যায়। কি যে ক'রবে ভেবে পায় না। ভেবেছিল আজের রাতটা তো বটেই, আরো ক'টা দিন কাটিয়ে যাবে ক্রিসতফ। আবার বলে আস্তে আস্তে :

'না না ক্রিসতফ, তোমার যাওয়া হয় না।...'

কুন্‌জও বলেন : 'সে কি হে! পটমেটশ্মিড যে...'

তাকিয়ে দেখে ক্রিসতফ, গভীর বেদনা উচ্চারিত দুই বৃদ্ধের স্নেহ-কোমল মুখের প্রতি রেখায় রেখায়। বলে : 'এত কষ্ট পাচ্ছেন এর জন্য !... আচ্ছা আমি না হয় কাল সকালেই যাব।'

গুলজ আনন্দে ওর হাত ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে বলেন : 'লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে ! কি যে খুশি হ'লেম ...।'

ছোট শিশুর মত উল্লসিত হ'য়ে ওঠেন গুলজ। কাল যেন কালই আসবে না, অনেক দেরী ক'রে আসবে। থাক তার চিন্তা আজ। আজ যাচ্ছে না ক্রিসতফ। সেইটেই বড় কথা। আজের দিন আর রাত তো ওদের। সারা সন্ধ্যা তিন জনে থাকবে এক সাথে। এই গৃহেরই আশ্রয়ে কাটবে ক্রিসতফের রাত। এই আনন্দেই বিভোর হ'য়ে রইলেন গুলজ। রাতটুকু কেটে গেলেই যে অধ্যায়টি আসবে অতদূর তাঁর দৃষ্টি গেল না।

আবার আনন্দ দানা বেঁধে ওঠে। হঠাৎ গুলজ উঠে পড়েন।

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে, উত্তেজিত স্বরে টোষ্ট প্রস্তাব করেন, আজের বিশিষ্ট অতিথির, যিনি আনন্দে ভ'রে দিয়েছেন এই ক্ষুদ্র গৃহকোণ, চরণপাতে ধন্য ক'রেছেন এই ক্ষুদ্র শহর, এই দীনের আঙ্গিনাকে। পথ তার শুভ হোক। এমনি ক'রে দুই হাতে আনন্দ দিয়ে আবার সে ফিরে আসুক বারে বারে ; জীবন তার সার্থক হোক, পূর্ণ হোক, উজ্জ্বল হোক ; কল্যাণ হোক; কল্যাণ হোক। স্বাস্থ্য পান করতে গিয়ে স্নেহময় বৃদ্ধের হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে শুভকামনায়। তার পর সঙ্গীতের নামে, বন্ধু কুন্জের নামে টোষ্ট প্রস্তাব করেন, বসন্তের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন অভিনন্দন ; ভুললেন না অনুপস্থিত বন্ধু পটমেটশ্মিডকেও। এবারে উঠলেন কুনজ। বন্ধু শুলজ ও অন্যান্যদের স্বাস্থ্য ক'রলেন পান। সর্বশেষে উঠল ক্রিসতফ। সেলোমে ছিল বাকী। ক্রিসতফের স্বাস্থ্য-পানের সুরা নিবেদিত হ'ল শ্রীমতী সেলোমের নামে। সেলোমে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল। হঠাৎ কাউকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ক্রিসতফ একটা জানা খুশির গান ধ'রে দিল। দুই বৃদ্ধ যোগ দিলেন সাথে। ওটা শেষ হ'লে আর একটা, তারপর আর একটা। ঘন ঘন গ্লাসে গাসে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি, প্রাণ-খোলা হাসিতে উচ্ছ্বলিত খুশিতে গানের লঘু তরঙ্গ-ভঙ্গে আর গ্লাশের টুংটাংএ কি যে আনন্দের সাগর উথলে উঠল তা বলে শেষ করা যায় না।

বেলা সাড়ে তিনটায় টেবিল ছেড়ে উঠল সবাই। সকলেরই চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। কুন্জ-এর ভারী ইচ্ছে একটু ঘুমিয়ে নেয়। একটা চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিলে। সারা সকাল ছুটোছুটি ক'রে আর টোষ্ট-এর জন্য এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শুলজ-এর পা আর বইছে না। দু'জনেরই মনে মনে আশা, ক্রিসতফ আবার গিয়ে পিয়ানোয় বসবে এবং বিকেলটা কাটবে বাজনা শুনে। কিন্তু দস্যি ছেলের প্রাণে আজ জোয়ার

লেগেছে। পিয়ানোর চাবীতে দু'একটা টুংটাং ক'রে উঠে প'ড়ল লাফ দিয়ে। জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে ব'লে উঠল : 'চমৎকার দিন, বেরিয়ে পড়া যাক না।' শহরের বাইরের উদার সৌন্দর্য ঘর-ছাড়া ক'রতে চায় ওই পাগলকে। কুনজ-এর বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। কিন্তু উছলে ওঠেন শুলজ। আজের দিনে ঘরে থাকে? চলো চলো দেখিয়ে আনি নদীর ধারটা। কুনজ-এর মুখটা বাঁকা হ'য়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিবাদ না ক'রে উঠে পড়েন সবার সাথে। অতিথিকে নিজের দেশের মন ভোলান রূপ দেখাবার আগ্রহ তাঁরও কম নেই।

বেরিয়ে পড়ে তিন জনে। শুলজ-এর হাত বগলদাবা ক'রে চলেছে তরুণ বন্ধু। বেচারা বৃদ্ধের প্রাণ যায় ওর সাথে ছুটতে ছুটতে। কুনজ কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পেছন পেছন ছোটেন। টগবগ ক'রে কথা বলতে বলতে চলেছেন তিন জন। রাস্তার লোকেরা অবাক হ'য়ে দেখে প্রোফেসারের পাক-ধরা চেহারাটায় অমন কাঁচা রং কোত্থেকে লাগল! শহর ছেড়ে মাঠের পথ ধরে ওরা। কুনজ বলে : 'বড্ড গরম।' জংলী ছেলেটা বলে : 'চমৎকার দিন।' কথায় কথায় তর্ক ওঠে। দাঁড়িয়ে প'ড়ে তর্ক করে দুই বন্ধু। তাইতে ধরা পড়ে না দৈর্ঘ্য। বনের মধ্য দিয়ে পথ। শুলজ আবৃত্তি করেন গ্যেটে আর মোয়াবাইক-এর কবিতা। ক্রিসতফ কবিতা ভালোবাসে, কিন্তু মুখস্ত থাকে না। কবিতা শুনতে শুনতে ও আত্মহারা হ'য়ে যায়। আশ্চর্য হ'য়ে যায় শুলজ এর স্মৃতি-শক্তি দেখে। আরও আশ্চর্য হ'য়ে যায় কি বিপুল মানস-সম্পদের অধিকারী এই বৃদ্ধ। ওর মনখানা যেন কলস্বনা নদী। শুধু বয়সই হয়নি, জরাও এসেছে; প্রায় বারো মাস থাকেন ঘরে বন্ধ; সারা জীবনটা হয়তো এই ছোট শহরে পাঁচিল-ঘেরা হ'য়েই কাটল। তবু আশ্চর্য! আর হাসলার…। জীবনের সূর্য এখনও মাঝ আকাশেই;

নাম ছড়ান দেশ ছেড়ে বিদেশেও ; সারা ইওরোপ ঘুরে বেড়ান মানুষকে বাজনা শুনিয়ে ; বাস করেন শিল্প-জগতের একেবারে কেন্দ্রস্থলে ; অথচ কি স্থবির মন। উৎসাহ কৌতুহল, আগ্রহ কিছু নেই। চলমান সাংস্কৃতিক জীবন থেকে চির-বিচ্ছিন্ন থেকেও গুলজ আধুনিক সাংস্কৃতিক ধারার সাথে যোগসূত্রটি অব্যাহত রেখেছেন। দেশ বিদেশের, অতীত বর্তমানের বহু সঙ্গীত-শিল্পীর জীবনেতিহাসের সাথে ঘনিষ্ট পরিচয় রাখেন। আশ্চর্য বস্তু এই বৃদ্ধের স্মৃতি। অমরাবতীর মন্দাকিনীর মধুক্ষরা ধারা যেন ঝ'রে ঝ'রে সঞ্চিত হয় ওই বিশাল সায়রে। অবগাহন ক'রে ক'রে ক্রিসতফের তৃপ্তি নেই। এত আনন্দ বৃদ্ধ অধ্যাপক পাননি কখনও। অমন ক'রে আপন ভুলে ওর মনের মধ্যে ডুব দেয়নি কেউ। ভালো ছাত্র পেয়েছেন বৈকি, তারা কান দিয়ে শুনেছে, প্রাণ দিয়ে নয়। কত সময় ভেতরে যেন বান ডেকেছে অধ্যাপকের। রুদ্ধ আবেগে ভেঙ্গে পিষে গেছেন বৃদ্ধ, কিন্তু মনের আগল খুলবার সমঝদার পাননি।

দুই বৃদ্ধ আর তরুণের তিন খানা প্রাণ এক হ'য়ে মিলে গেছে। হঠাৎ ঘটল এক অঘটন। গুলজ ব্রাহ্‌ম-এর প্রশংসা ক'রে ব'সলেন কি প্রসঙ্গে। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল ক্রিসতফ। প্রায় বন্ধু-বিচ্ছেদ হবার উপক্রম। ছুঁড়ে ফেলে দিল গুলজ-এর হাত ; ব্রাহ্‌ম্‌কে যার ভাল লাগে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব অসম্ভব। এক মুহূর্তে এতক্ষণের এত আনন্দ যেন বিস্বাদ হ'য়ে উঠল। ভীরু মানুষ গুলজ। তর্ক করতে পারেন না। মিথ্যে ক'রে বলতে পারেন না। তবু বোঝাতে চেষ্টা করেন আস্তে আস্তে। গর্জে ওঠে ক্রিসতফ : 'বাস্ বাস্, যথেষ্ট হয়েছে।'

কোমল প্রাণখানায় একেবারে কেটে বসে। উত্তর জোগায়না মুখে। পররফের মত হিম কঠিন নীরবতার মধ্যে পা গুলো এগিয়ে চলে।

স্পরের দিকে তাকাতে সাহস পায় না দুই জন। কিছুক্ষণ পরে কুনজ একটু কেশে কথার মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করেন। ক্রিসতফের মনের মেঘ কাটতে চায় না। এক আধ কথায় উত্তর সারে। এদিক থেকে বিশেষ সাড়া না পেয়ে, কুনজ এবার চেষ্টা করেন গুলজ-এর সাথে কথা বলতে। কোন মতে যদি এই বিশ্রী গুমট আবহাওয়াটা কেটে যায়। কিন্তু গুলজ-এর গলা কাঠ হ'য়ে আছে। ক্রিসতফ-এর রাগ জল হ'য়ে গেল। আড় চোখে তাকিয়ে দেখে বেচারার অবস্থা। ইচ্ছে হয় হেসে গুমট্‌টাকে হালকা ক'রে দেয়। সত্যিকারের রাগ তো করেনি। এ মানুষকে কষ্ট দেওয়া যায়! সে যে রীতিমত হৃদয়-হীনতা। কিন্তু তবু পারলে না হাসতে। গুম্ হ'য়ে রইল।

বন শেষ হ'য়ে যায়। গভীর নিস্তব্ধতা চারধারে। শুধু শোনা যায় দুই ভাঙ্গা-বুক বৃদ্ধের ক্লান্ত পায়ের শব্দ। ক্রিসতফ আপন মনে শিষ দেয়, তাকায় না পাশের মানুষের দিকে, যেন নেই তারা। তারপর হঠাৎ হেসে উঠে জড়িয়ে ধরে গুলজকে। ওর দুই চোখের দৃষ্টি বাংময়ী হ'য়ে ওঠে: 'ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোর আয়োজনহীন পরমাদ।'

বৃদ্ধের প্রাণ গ'লে যায়। যেন গ্রহণের পর সবিতার উদয়। কিন্তু তক্ষুণি কথা বলতে পারলেন না গুলজ। ক্রিসতফ নিজের হাতের মধ্যে ওঁর হাতখানা নিয়ে এগিয়ে চলে। কথা বলে আরও প্রাণের স্পর্শ দিয়ে। কিন্তু অন্তরের আবেগে, পায়েও বেগ লাগে। খেয়াল থাকে না শ্রান্ত দু'টি মানুষের কথা। গুলজ কোন প্রতিবাদ করেন না। জানেন, আজের এই অত্যাচারের ঋণ দেহকে শুধতে হবে কাল; তবু দেহের ক্লান্তি ছাপিয়ে ওঠে প্রাণের আনন্দ। কাল অসুখ হয় হোক না। চ'লে যাবে ক্রিসতফ। অখণ্ড অবসর থাকবে তখন।

কুনজ ঠিক অতটা পাগল হননি। চলেছেন শ্রান্ত দেহখানা টেনে

নিয়ে। সে এক করুণ দৃশ্য। এতক্ষণে খেয়াল হয় ক্রিসতফের। লজ্জিত হ'য়ে বলে সামনের মাঠটার ওই পপলার গাছের তলায় খানিক-ক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম ক'রে নেওয়া যাক। ঠাণ্ডা লাগবার কথা ভুলে গিয়ে তৎক্ষণাৎ রাজী হ'য়ে গেলেন গুলজ। কিন্তু কুনজ ভুললেন না। ঘর্মাক্ত শরীরে ঘাসে শুলে ঠাণ্ডা লাগার ভয় তাঁর নিজেরও ছিল, তাই বললেন, তার চেয়ে বরং কাছের ষ্টেশন থেকে ট্রেণে ফেরাই ভাল হবে। তাই ঠিক হ'ল। সময় প্রায় হ'য়ে গিয়েছিল; অত্যন্ত ক্লান্ত থাকা সত্বেও ছুটোছুটি ক'রে এসে ট্রেণ ধরতে হ'ল।

হঠাৎ কে একজন বিরাট দেহ ভদ্রলোক একটা কামরা থেকে শরীর টাকে বের ক'রে যত রাজ্যের উপাধি পদবী সহ কুনজ আর গুলজ-এর নাম ধরে হাঁক ডাক করতে লাগলেন। তেমনি হাঁক ডাক ক'রে জবাব দিলেন কুনজ আর গুলজ। প্ল্যাটফরমের যাত্রীদের ঠেলেঠুলে ছুটলেন দু'জন ক্ষুদে মানুষটির কামরার দিকে। ক্রিসতফ অবাক হ'য়ে পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে জিজ্ঞাসা করে: 'কি ব্যাপার?'

জবাব আসে: 'আরে পটপেট্শ্মিড হে!'

নামটা শুনে কিছুই বুঝতে পারে না ক্রিসতফ। খাবার সময় এঁর নামে যে টোষ্ট প্রস্তাব করা হ'য়েছিল, সে-কথা মনে ছিল না। এক চমৎকার দৃশ্য! পটমেটশ্মিড গাড়ীর ভেতরে, এঁরা দুই বুড়ো পা-দানীর ওপর দাঁড়িয়ে; তাঁদের কলরবে আশপাশের মানুষের কানে তালা লাগে। তারা অবাক হ'য়ে দেখে বৃদ্ধদের কাণ্ড। ট্রেণ চলতে আরম্ভ করলে তবে ভেতরে যান দু'জন। ক্রিসতফকে পরিচয় করিয়ে দেন গুলজ। প্রথমটায় পটমেটশ্মিড কাঠের মত শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে কোন মতে মাথাটা নোয়ান একটু। কিন্তু তারপরে সহজ হ'য়ে বার পাঁচ ছয় ওর হাত ধ'রে এমনি ঝাঁকানি দিলেন, হাত দু'খানা প্রায় ছিঁড়ে পড়ার

উপক্রম। পটমেটশ্মিড মানেন, নেহাৎ অদৃষ্ট প্রসন্ন ব'লেই এভাবে পথের মাঝখানে দেখাটা হ'য়ে গেল। নইলে ওঃ…। চিৎকার ক'রে প্রায় বিলাপই করেন ভদ্রলোক—কোন দিন শহরের বাইরে পা বাড়ায় না, কিন্তু ঠিক হের কেপালমেইষ্টারও এলেন আর সময়টি বুঝেই কিনা ওকে বাইরে যেতে হ'ল! টেলিগ্রামটা গিয়েছিল ঠিকই সক্কাল বেলায়। ও ঘুমিয়েছিল। কিন্তু মূর্খোগুলোর কেউ জাগায়নি ওকে। তারপর আর কি, সকালের প্রথম ট্রেণটা আর পাওয়া যায় নি। রোগী পত্তর অন্যান্য কাজ কর্ম সব বাতিল ক'রে পরের ট্রেণটাতেই আসছে। রাস্তায় ছিল বদল। কিন্তু ট্রেণ নয়ত বলদের গাড়ী, বড় লাইনের গাড়ী ধরতে পারলে না। ছাঁকা তিনটি ঘন্টা ঠায় ব'সে সেই গেঁয়ো ইষ্টিশনে। …ভেবেছিল দেরী হ'য়ে যাবে। যাই হোক ভাগ্যি ভালো যে…। বার কুড়ি পঁচিশ … প্রায় প্রত্যেক যাত্রীকে মায় ষ্টেশনের কুলিটাকে পর্যন্ত ধ'রে ধ'রে কাহিনীটি শুনিয়ে শুনিয়ে দম ফুরিয়ে আসে ভদ্রলোকের।

মোটা মোটা লোমশ আঙ্গুল-ওয়ালা থাবাটার চাপে ক্রিসতফের হাতখানা যেন গুড়িয়ে যায়। লম্বায়, মোটায় মানুষটি প্রায় দানবীয় সংস্করণ; চৌক মাথা, ছোট ছোট ক'রে কাটা কটা চুল; চাঁছা-ছোলা বসন্তের দাগ-চিত্রিত মুখ, প্রকাণ্ড বড় বড় চোখ, এতখানি বড় এক নাক, পাতলা ঠোঁট, ভাঁজ-ওয়ালা থুঁথনি, খাটো ঘাড়; পিঠখানা আস্ত গড়ের মাঠ; জালার মত পেট, বাহু দুটি দেহ থেকে আলগা হ'য়ে থাকে মাংসের বহরে; চ্যাটাল চ্যাটাল এত খানি বড় বড় হাতের পাতা আর রাক্কুসে পা। অর্থাৎ শুধু খেয়ে খেয়ে বিকৃত একটা বিশাল মাংসপিণ্ড বিশেষ! ব্যাভেরিয়ার রাস্তায় বিশাল তামাকের পিপেগুলোকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়—এও ঠিক যেন তেমনি একটা মানুষ-পিপে। এত

খানি জায়গা জুড়ে ছড়ান নিজের হাঁটু অথবা পাশের মানুষের হাঁটুর ওপর হাত ভর দিয়ে কথা শোনেন। শুনতে শুনতে আনন্দে, হৃদয়ের উষ্ণতায় মাখনের ডেলার মত গ'লে পড়েন। অনর্গল কথা বলেন; ব্যঞ্জন বর্ণগুলি মুখের মধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে গুলতির গুলীর মত ছিটকে যায়। হঠাৎ সারা দেহ কাঁপিয়ে, মানুষের কানে তালা ধরিয়ে মাথাটা পেছন দিকে ঝুলিয়ে, এতখানি হাঁ ক'রে বিপুল হাসি হাসেন। নাকের মধ্যে কেমন ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ হয়; হাসিটা যেন মুখের মধ্যে গর্ গর্ ক'রে ক'রে পাক খায়। ছোঁয়াচ লাগে কুনজ আর শুলজ-এর। হাসতে হাসতে চোখে জল বেরিয়ে আসে। হাসিটা থামলে ভেজা চোখ মুছে ক্রিসতফের দিকে তাকান। নীরব দৃষ্টিতে কৌতুহল: 'কি হে লাগল কেমন?'

ক্রিসতফ কিছু বলে না। আতংকে মাথার চুল খাড়া হ'য়ে যায়, এই দানবটা ওর সঙ্গীত গায়?

তিনজনে শুলজ-এর বাড়ী যায়। প্টমেটশ্মিডের ভারী ইচ্ছা সে গান গায়। ভাবে ভঙ্গিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ক্রিসতফ এড়িয়ে যায়। গাইবার জন্যে অস্থির হ'য়ে ওঠে বিরাট মানুষটি। বন্ধু দু'জনের আগ্রহ বন্ধুর গান শুনিয়ে দেয় অতিথিকে। অতএব ক্রিসতফ নাচার। নেহাৎ অনিচ্ছায় পিয়ানোতে বসে।

শুলজকে ও আঘাত দিতে চায় না। কিন্তু একটা ভাঁড় ওর সঙ্গীত নিয়ে ভাঁড়ামী ক'রবে এ ওর অসহ্য। তাই নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠে। পাক আঘাত, একটু শিক্ষা হবে বুড়োর। কিন্তু জানত না ক্রিসতফ ওই বিকৃতি-দর্শন মাংস-পিণ্ডেরই কণ্ঠে মধু ভরা। অবাক হ'য়ে গেল ও প্রথম…। শুলজ-এর চোখ ক্রিসতফের মুখের ওপর যেন গাঁথা। কেঁপে ওঠেন বৃদ্ধ, ভাবেন বুঝি বিরক্ত হ'চ্ছে ক্রিসতফ। কিন্তু না, পিয়ানোর

বুকে কুশল হাতের চঞ্চল নৃত্যের সাথে সাথে মুখখানা ওর আলো হ'য়ে ওঠে। শিল্পীর নন্দিত চিত্তের আলোর বিচ্ছুরণ লাগে বৃদ্ধ শিল্প-রসিকের মুখে চোখে। গান শেষ হ'লে ক্রিসতফ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে এমন ক'রে ওর গান গাইতে আর শোনেন নি কখনও। কি বিপুল আনন্দ আর চিত্ত-প্রসাদ উথলে ওঠে শুলজের মনে তা কেউ জানে না। এ আনন্দ পায়নি ক্রিসতফ এত মধু-ঝরা কণ্ঠে ওর নিজের সঙ্গীতে শুনে; পাননি পটমেটশ্মিড বিজয় গৌরব লাভ ক'রেও। যা তাঁরা পেয়েছেন তা তাদের নিজের টুকুই। কিন্তু শুলজ যা পেলেন তা তাকে ছাড়িয়ে গেছে। তার দুই প্রিয় সুহৃদের যত সার্থকতা যত কুশলতা, যত আনন্দ সব মিলে মিশে রসময় হ'য়ে উঠেছে।

বুঝতে পারে না ক্রিসতফ ওই রাক্ষুসে চেহারার নেহাত সাধারণ লোকটা কোথায় পেলে এ অনুভূতি! ওর মানস লোকের যে গভীর আবেগ দিয়ে তৈরী ওই লাইডার গুলি, তা কেমন ক'রে ওই মোটা লোকটার কণ্ঠে এমন সত্য হ'য়ে ভাষা পেল! বহু চেষ্টা করেও তো ক্রিসতফ পেশাদার গাইয়েদের কিছুই বোঝাতে পারেনি। পটমেট-শ্মিড-এর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে ভাবে ক্রিসতফ, সত্যি, এমন গভীর অনুভূতি!

কিন্তু কই, চোখে তার আলো কই! শুধু কৃতিত্বের উল্লাস। কিন্তু কি এক অজানা আবেগে থরো থরো কাঁপছে ওই স্থূল মাংস-পিণ্ডটা। এক অন্ধ আবেগের উন্মত্ত দাপাদাপি। ক্রিসতফের সঙ্গীতের গভীর আবেদন যেন যাদুর ছোঁয়া বুলিয়ে দিলে—পথ না পেয়ে ফুঁসছিল যা, তা পথ পেয়ে ধন্য হ'ল; বাঁধ-ভাঙ্গা বেনোজলের মত প্রাণের আবেগ উছলে উঠল গানের সুরে।

ক্রিসতফের মনে হয় বিশ্ব-সৃষ্টির কর্মশালায় ব'সে কি অনাসৃষ্টিই

না বাধিয়েছে ওই বুড়ো ভাস্করটি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়তে গিয়ে কারটা যে কার ঘাড়ে চাপল সে হুঁস ছিল না খেয়ালী বুড়োর। রামের মাথা হয়তো গেল শ্যামের ধড়ে, শ্যামের হাত দুটো জুড়ল গিয়ে যদুর কাঁধে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার একটা মানুষের জন্য তৈরী সব ক'টা অংশই গেল সাতখানে ছড়িয়ে। এক জায়গায় গেল মাথা, তো আর এক জায়গায় গেল মগজ। হৃদ্‌পিণ্ডটা গেল অন্য আর এক জায়গায়, দেহটা আর এক জায়গায়। এমনি ক'রে মানুষ গুলো হ'য়ে উঠল হরেক রকম টুক্‌রোর জোড়াতালি। এক এক জন যেন দুনিয়ায় সেরা বেহালার মত, থাকেন বাক্স-বন্দী, বাজাবার মানুষ নেই। আবার যারা বাজাতে পারেন সারা জীবন হয়ত তাদের হাতের ভাঙ্গা ছড় আর ভাঙ্গা বেহালা ঘুচল না। আজব দুনিয়া। আরো কথা মনে হয়, কারণ গাইবার কণ্ঠ নেই ক্রিসতফের। এর জন্য ওর নিজের উপর কি কম রাগ? বেসুরো গলাটা শুনলেই ওর সারা দেহ রিরি ক'রে ওঠে।

কৃতিত্বের উল্লাসে আবার গান ধরে পটমেটশ্মিড। এবার রচয়িতার বৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে ওঠে গায়কের নিজস্বতা। স্বভাবতই ক্রিসতফের কানে বাজে। মুখ কালো হ'য়ে ওঠে ওর। বুঝতে পারেন শুলজ। কিন্তু শুলজ বিচার তো করতে জানেন না; জানেন শুধু বন্ধুদের মুগ্ধ-হৃদয়ে কাছে টেনে নিতে। তাই হয়তো পটমেটশ্মিডকে অপরাধী করতে পারতেন না সাধারণ অবস্থায়। কিন্তু ক্রিসতফের প্রতি গভীর স্নেহে তার বুকের ক্ষীণতম ধুক্‌পুকানিটুকুও এসে বৃদ্ধের হৃদয়ের তারে ঘা দেয়; তার চিন্তা-জগতের সূক্ষ্মতম রং-ফেরাও ছায়া ফেলে ওই স্নেহ-সিক্ত বুকে। নিজের মধ্যে আর নেই শুলজ: হারিয়ে গেছেন ওই স্নেহের-পাত্রের মধ্যে। আর এক দিকে আর এক প্রিয়-বন্ধু। বড় কষ্ট পান শুলজ ভেতরে ভেতরে। চেষ্টা করেন পটমেটশ্মিডকে

থামাতে। কিন্তু সে বড় সহজ কাজ নয়। ক্রিসতফের লাইডার শেষ হ'লে শুরু করেন যত বাজে গান, যা শুনে ক্রিসতফ কুঁকড়ে এতটুকু হ'য়ে যায়। ওর দেহ কাঁটা হ'য়ে ওঠে সজারুর মত।

এমন সময় এল খাবার ডাক। খাবার নিয়ে বসে সবাই। তিন বন্ধুর একাগ্র দৃষ্টি ক্রিসতফের ওপর। তারা ওর কথা শোনেন না, অঞ্জলি ভ'রে পান করে। আর ক্রিসতফ ভাবে কোথায় কাদের মাঝে বসে আছে সে? বাড়ী থেকে কত দূরে, কালের আগে হয়তো মনেও হয়নি এই ছোট্ট শহরটির কথা। আর এই তিন বৃদ্ধ কয়েক দিন আগেও ছিলেন অজানা, অচেনা। আজ এই মুহূর্তে শুধু বন্ধু নন, সুহৃদ নন, আত্মীয়ের চাইতেও বড় আত্মীয়। কোন্ যাদুতে এমন হয়? ভাবতে ভারী অবাক লাগে ওর। বিশেষ ক'রে শুলজ...গভীর কৃতজ্ঞতায় ওর অন্তর ভরে যায়। মনে হয় এই মানুষটিই এই ক্ষুদ্র-গোষ্ঠীর আত্মা—ভালোবাসা আর কল্যাণের জ্বলন্ত জীবন্ত প্রতিমা। বাকী দু'জন তাঁর ছায়া মাত্র। কত তফাৎ এই মানুষটির সাথে তাদের। ওরাও ক্রিসতফের বন্ধু বটে কিন্তু সেই বন্ধুত্বেও আলাদা ভাব। কুন্‌জ স্বার্থপর। গান শুনে তার আরামে চোখ বুঁজে আসে, পিঠ চুলকে দিলে মোটা বেড়ালটার যেমন হয়। পটমেটশ্মিড পেলেন আত্মপ্রসাদ; পেশী সঞ্চালনের কাজ হ'ল খানিকটা। ক্রিসতফকে বুঝবার চেষ্টা করলেন না পটমেটশ্মিড। কিন্তু শুলজ আত্মহারা। ভালোবেসেছেন শুলজ।

রাত হয়েছে বেশ। বাড়ী গেলেন দুই বন্ধু। রইলেন শিল্পী আর তার সমঝদার। একান্ত হ'ল অন্তরঙ্গ। শিল্পী বলে:

'এবার শুধু তোমার জন্যই বাজাব বন্ধু।'

রসিক বন্ধুকে পাশে পেয়ে হাতে যাদু খেলে ক্রিসতফের। নতুন

রচনাগুলো বাজায়। শুলজ মুগ্ধ, তার সমস্ত সত্তা পরমানন্দময়। বসেছেন ঘনিষ্ঠ হ'য়ে; নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে শুনছেন আপনাকে ঢেলে দিয়ে। চোখ ফেরাতে পারেন না শিল্পীর দিক থেকে। অতর্কিতে বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে: 'আহা কুন্‌জ যদি থাকত।'

সুখের ভাগ কাউকে না দিতে পারলে সুখ নেই সুহৃদয় স্নেহময় বৃদ্ধের। ক্রিসতফ বিরক্ত হয়।

কোথা দিয়ে একটি ঘন্টা চলে যায়। বাজিয়েই চলেছে ক্রিসতফ। কারো মুখে কথা নেই। যখন শেষ হ'য়ে গেল তখনও স্তব্ধ দু'জনে। সারা প্রকৃতি, পৃথিবী স্তব্ধ। বাড়ী ঘর রাস্তা সব নিদ্রামগ্ন। ফিরে তাকিয়ে দেখে ক্রিসতফ বৃদ্ধের দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে ও। রাত্রির নিস্তব্ধতার বুকে দুলে ওঠে ওদের স্তিমিত কণ্ঠের কথা। পাশের ঘরে ঘড়িটা এক ঘেয়ে নিষ্প্রাণ সুরে টিক্‌টিকিয়ে চলে। ক্রিসতফের প্রশ্নের জবাবে বলছেন শুলজ তাঁর জীবনের কাহিনী। জীবন ভরাই বেদনা; কিন্তু নালিশ নেই। বড় লজ্জা পান। বলেন, ভুল ওর নিজেরই...সুতরাং নালিশ করবার অধিকার তো নেই। সবার কাছেই তো ব্যবহার পেয়েছেন পরম মিত্রের মত!

নালিশ সত্যি করেন না শুলজ। আজও এ ওঁর নালিশ নয়, সুদীর্ঘ সঙ্গী-হীন জীবনের বুক ঝরা রক্ত। কি এক গভীর আবেদনে ভরে ওঠে দৃষ্টি! ক্রিসতফের চোখের মণিতে তার সাড়া খোঁজেন। ক্রিসতফ বোঝে সে-আবেদনের অর্থ। বোঝেন শুলজ; ওকে আঁকড়ে ধরতে চান, বিশ্বাস করতে চান!

বালক আর বৃদ্ধ। দু'জনের মাঝখানের বয়সের তফাৎটা যেন

হাওয়ায় উড়ে গেছে। দুটি সমবয়স্ক ভাই যেন একেবারে পরস্পরের বুকের কাছে সরে এসেছেন ভালোবাসায় কল্যাণ-কামনায়, সাহচর্যে নিবিড় হ'য়ে। দুর্মল স্বভাবতঃই আশ্রয় খোঁজে সবলের। বৃদ্ধ শুলজ আশ্রয় পান তরুণ বন্ধুর আত্মায়।

মাঝ রাত পেরিয়ে গেল। এবার শুতে যেতে হয়। খুব ভোরে উঠে ক্রিসতফকে ট্রেণ ধরতে হবে। শুলজ এমন ক'রে অতিথির ঘরখান সাজিয়েছেন যেন সে মাস ছয় থাকবে। টেবিলের ওপর ফুলদানীতে এক রাশ তাজা গোলাপ আর লরেল পাতার গোছা। লেখার টেবিলে নূতন ব্লটিং পেপার। খাটের কাছে শেলফএ বাছা বাছা ওর সব চাইতে প্রিয় ক'খানি বই। কিছুই বাকী রাখেননি। একেবারে স্নেহ ঢেলে দিয়ে ঘড় সাজিয়েছেন বৃদ্ধ, কিন্তু কোনই কাজে এল না! কিছুই দেখল না ক্রিসতফ। ঝপ ক'রে বিছানায় পড়েই অঘোর ঘুম।

শুলজএর চোখে ঘুম নেই। শুধু মনে হয় আজ সারাটা দিনের কি অনাস্বাদিত আনন্দই না লাভ হ'ল। কিন্তু কাল ক্রিসতফ যখন চলে যাবে! ভেঙ্গে যাবে যে বুক! এ দুঃখ বুক পেতে নিতেই হবে। সারাদিন ক্রিসতফ কোন্ শব্দটি উচ্চারণ করেছে, কি কথা কয়েছে, কেবলি ঘোরাফেরা করে মনের মধ্যে। পাশের ঘরে ক্রিসতফ ঘুমিয়ে আছে; একরকম ওর পাশেই—শুধু ব্যবধান এই প্রাচীরটুকুর। ভাবতেও অদ্ভুত ভালো লাগে। সারাদিনের অত্যাচারে দেহটি ক্লান্ত, আড়ষ্ট। মুষড়ে পড়েছে একেবারে। মনে হচ্ছে সর্দি হয়েছে। হাঁপানির টান উঠবে বুঝতে পারে। কিন্তু ক্রিসতক যাওয়া পর্যন্ত···আর কয়েকটা ঘণ্টা মাত্র যেন পারে দাঁড়িয়ে থাকতে। এই চিন্তায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন শুলজ। ভয় করে কাশি না ওঠে। ক্রিসতফ জেগে উঠবে তা হ'লে। ভগবানের উপর কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে। কাব্য হ'য়ে ওঠে বৃদ্ধের আঁধার

শয্যা। কাব্যের মালা গাঁথা চলে মনের বনে বনে। বিছানা ছেড়ে টেবিলে এসে বসেন। যত্ন ক'রে কবিতাগুলো লেখেন। কাগজে স্নেহসিক্ত ভাষায় উৎসর্গ লিখে নিজের নাম সই ক'রে শুয়ে পড়েন গিয়ে আবার কাঁপতে কাঁপতে, সারা শরীর ঠাণ্ডা হিম। সারারাতে একটুও গরম হল না তা।

ভোর হয়। শুলজএর পাঁজরগুলো টন্ টন্ ক'রে ওঠে, যেন ভোর হ'ল! আবার রাগ হয় নিজের ওপর। আনন্দের কটা মুহূর্তই বা আছে আর। তাকে কেঁদে নষ্ট করবে? কান্না তো রইল তোলা। মুখ গুমরে সুখের স্বল্পায়ু ক্ষণটুকুকে আর হত্যা করা কোন মতেই নয়। কান পেতে থাকে ওঘর থেকে ক্রিসতফের নড়াচড়ার কোন শব্দ আসে কিনা। কিন্তু একভাবেই শুয়ে আছে সে। কোন নড়া-চড়া নেই। সাড়ে ছয়টা বাজে কিন্তু ছেলের ঘুম ভাঙ্গে না। অনায়াসেই ওকে ট্রেণ ফেল করান যায়। ক্রিসতফ হয়তো খুশিই হয় ট্রেণ ধরতে না পারলে। কিন্তু শুলজ তা কখনও করবেন না। বন্ধুর সাথে অমন পেছন দরজার কারবার ওঁর সম্ভব নয়। দু' একবার মনে আসে হয়ত, ঘুম ভাঙ্গলো না—সেতো আমার দোষ নয়। ভালোই হ'ল, আর একটা দিন পাওয়া যাবে ওকে কাছে। জবাব ত আপনিই আসে, না আমার নেই সে-অধিকার।

ওর ঘরে দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে টোকা মারেন। প্রথম শুনতে পায়নি ক্রিসতফ। কি চমৎকার ঘুমুচ্ছে ক্রিসতফ। না জাগালে সারাদিন ঘুমুবে! স্নেহে গলে গিয়ে ভাবেন বৃদ্ধ। কয়েক মিনিট পরে ধরমড়িয়ে ওঠে ক্রিসতফ। সময় শুনে চিৎকার ক'রে ওঠে! হুটপাট ক'রে সোরগোল তুলে জামা কাপড় পরে—বাইরে থেকে শোনা যায় তার শব্দ। টুক্রো টুক্রো সুর ভাজে, শুলজএর সাথে কথা কয়, হাসি ঠাট্টা করে বন্ধ দরজার ওপার থেকে। আসন্ন বিদায়ের ব্যাথায় বুক ভেঙ্গে যায় বৃদ্ধের, তবু

হাসেন। দরজা খুলে যায়। বেরিয়ে আসে ক্রিসতফ; রাতের নিরুদ্বেগ বিশ্রামের পর তাজা ঝলমলে খুশি উপচে-পড়া চেহারা। ওরই জন্য আর একখানা হৃদয়ে যে বেদনার কি গভীর রাগিনী বাজছে তা জানতে পারলে না ক্রিসতফ। হায় দুটো দিন যে ও থাকতে না পারত তা নয়। ওর কোন ক্ষতি হ'ত না, থাকলে বৃদ্ধের যে কি আনন্দ হ'ত কি করেই বা জানবে ও, তা ছাড়া ওর মনের পালে এখন ঘর-ফেরা হাওয়া লেগেছে। বড় ক্লান্ত ও, কাল সারাদিন হট্টগোল আর অনবরত কথা কওয়ার পর বড় ক্লান্ত লাগছে। তাছাড়া পৃথিবীর শেষ প্রান্তে তো চলে যাচ্ছে না যে আর দেখা হবে না। কত সময় আছে। ক্রিসতফ তরুণ তার সময় আছে, কিন্তু বৃদ্ধ অধ্যাপক জানেন সময় যে নাই, নাই···ডাক এসে গেছে তাঁর···চলো মুসাফির বাঁধো গাঠরিয়া···শিগগিরই তল্পী গোটাতে হবে। পৃথিবীর শেষ প্রান্তের চেয়েও নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকেন ক্রিসতফের দিকে···অসীমাবগাহী সে-দৃষ্টি।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও ষ্টেশনে গেলেন শুলজ ওর সাথে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কনকনে ঠাণ্ডা। ষ্টেশনে গিয়ে ব্যাগ খুলে দেখে ক্রিসতফ, সর্বনাশ! টিকিট কেনার পুরো টাকা তো নেই। শুলজএর কাছে চাইলে হাতে স্বর্গ পাবেন তিনি, ও জানে; কিন্তু চাইতে পারলে না। ···কেন?···যে তোমায় ভালোবাসে, তোমার জন্য এতটুকুও করতে পারলে ধন্য মানে, তাকে কেন সেই সুখটুকু থেকে বঞ্চিত করা?···তাও পারলেনা ক্রিসতফ চাইতে; হয়তো বিশেষ কিছু বিবেচনা করেই চায় নি; হয়তো বা বাধা দিয়েছে অহমিকা। আগের একটা ষ্টেশনের টিকিট কিনলে— বললে, বাকীটা হেঁটে যাবে।

ট্রেণ ছাড়ার সময় প্রায় হ'য়ে এল। পা-দানীতে দাঁড়িয়ে কোলাকুলি করে দু'জনে। রাতের লেখা কবিতাটা এক ফাঁকে ক্রিসতফের হাতে

গুঁজে দেন শুলজ্। তারপর নেমে প্ল্যাটফরমএ দাঁড়িয়ে থাকেন। কারো মুখেই কথা নেই। কথা ফুরিয়ে গেছে। শুনজ্এর মুখর চোখ দুটি নির্ণিমেষে তাকিয়ে রইল ক্রিসতফের মুখের দিকে শেষ পর্যন্ত।

একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হ'য়ে গেল ট্রেণ। একলা প'ড়ে রইলেন শুলজ্। চারদিকে যেন শূন্যতা থম্‌থমিয়ে উঠল। কাদা-ভরা রাস্তা দিয়ে ফিরে চললেন। দেহ আর চলে না। হঠাৎ বড় শ্রান্ত মনে হ'ল। এতক্ষণ কিছুই খেয়াল ছিল না। এখন রাজ্যের অবসাদ, ঠাণ্ডা, বাদলা দিনের গুমট দেহখানা অসাড় ক'রে দিয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। টলে টলে কোনমতে বাড়ী এলেন। নিজের ঘরে আসার সাথে সাথেই প্রবল কাশির টান উঠল। সেলোমে ছুটে এল। আক্রমণটা অত্যন্ত তীব্র। ওঁকে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তার নিয়ে এল সেলোমে। পাশ ফেরারও শক্তি নেই। ন্যাকড়ার মত নেতিয়ে পড়েছে দেহ। সারাটা দিন কাটল এক অপূর্ব আবেশে। গত কালের প্রতিটি মিনিট তরঙ্গ হ'য়ে সারাদিন পীড়িত বৃদ্ধের নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলিকে দোল দিল। ভালোবাসায় বিশাল হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভ'রে আছে। করজোড়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণতঃ হ'লেন প্রেমিক।

নূতন বন্ধুর গভীর স্নেহে সমস্ত গ্লানি জুড়িয়ে গেছে ক্রিসতফের। আত্মবিশ্বাস এসেছে ফিরে। টিকিটের মেয়াদ ফুরালে সেই ষ্টেশনে নেমে প'ড়ে হাঁটা পথ ধরল। রাস্তা নেহাৎ কম নয়। ধীরে ধীরে ইস্কুলের ছেলের মত চারদিক দেখতে দেখতে চলল। এপ্রিল মাস। গাছে গাছে কালো কালো ডালপালার অঙ্গ জুড়ে নূতন পাতার সমারোহ। আপেল গাছে ফুল ফুটেছে। ঝোপের মধ্যে মধ্যে ক্ষীণাঙ্গী হগলানটাইন ফুলের

ভীরু হাসি। নিষ্পত্র বনানীর গায়ে সবুজের ছোঁয়া লাগতে শুরু ক'রেছে; তারি ওপারে একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় অতি প্রাচীন রোমান দুর্গটি। কোমল নীল আকাশের গায়ে তিনখানি কালো মেঘের টুকরো ভেসে চলেছে। চলন্ত মেঘের ছায়া ছুঁয়ে গেল, হাল্কা এক পশলা বৃষ্টি ভিজিয়ে দিয়ে গেল মাটির বুককে। এপ্রিলের সূর্য আবার ঝলমলিয়ে উঠল। পাখীরা উঠল গান গেয়ে।

হঠাৎ খেয়াল হ'ল ক্রিসতফ-এর, বেশ কিছুদিন থেকে গতেফ্রেদের কথা মনে হচ্ছে বড়, বহুদিন তো হয়নি এমন। খালের পাড় দিয়ে চলেছে ও; জলের বুকে পপলার গাছের ছায়া। আর মনের মধ্যে মামার। মাথা তুলে সামনের দিকে তাকাতেই সত্যি মনে হ'ল মামাই আসছেন ওধারের পথ দিয়ে, ওরই দিকে।

আকাশ আবার আঁধার হ'য়ে আসে। মুষল-ধারে নামে বৃষ্টি, তার সাথে শিলা আর মেঘের গর্জন। ক্রিসতফ এক গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় গোলাপী দেয়াল ও লাল রংএর চালের ঝিলিক। ছুটে গিয়ে একটা বাড়ীর ছাঁচে দাঁড়িয়ে পড়ল। চালের টালিগুলো ঝন্ ঝন্ ক'রে বেজে উঠছে পড়ন্ত শিলার আঘাতে। রাস্তার উপর প্রকাণ্ড বড় বড় শিলা পড়ছে অবিশ্রান্ত। নর্দমাগুলো উপচে উঠেছে। ফুলন্ত গাছগুলির ওপারে কালো মেঘের গায়ে এরি মধ্যে রামধনুর ঝলক জেগেছে আকাশ জুড়ে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে উলের জামা বুনছিল। সে ওকে ভেতরে ডেকে নিয়ে এল। মস্তবড় একখানা ঘর; রান্না, খাওয়া, শোওয়া সব কিছুই হয়। পেছনের দিকে প্রকাণ্ড উনুনের ওপর একটা হাঁড়ি চাপান। চাষী পরিবার। একজন বৃদ্ধা তরকারী ধুচ্ছিলেন। সুপ্রভাত জানিয়ে ক্রিসতফকে ডেকে আগুনের কাছে এনে বসালেন—জামা কাপড়

সব ভিজে গেছে বেচারার। মেয়েটি এক বোতল মদ এনে ওর সামনে রেখে টেবিলের ওধারে বসে বুনতে লাগল। এদিকে ছোট্ট দু'টি ভাইবোন চোখের ডাক্তার সেজে কি একরকম ঘাস নিয়ে ডাক্তারীতে মত্ত। মেয়েটি বুনতে বুনতে ভাইবোনের খবরদারী করে আর ক্রিসতফের সাথে কথা বলে। কথায় কথায় খেয়াল হয় মেয়েটি অন্ধ। চেহারা ভালো নয়; লম্বা-চওড়ায় প্রকাণ্ড দেহ, লাল গাল, সাদা ধবধবে দাঁত, লোহার মত শক্ত দুই বাহু, শ্রী-ছাঁদহীন নাক চোখ মুখের গড়ন। অন্ধদের মতই হাসি হাসি ভাবলেশহীন মুখ, তেমনিভাবে সববিষয়ে কথা বলার অভ্যাস—যেন নিজের চোখে দেখা সব। ক্রিসতফকে বলল, বেশ ভালোই আছেন দেখছি। চারদিকটা আজকাল চমৎকার হ'য়েছে দেখতে। ক্রিসতফ চমকে উঠল; ভাবলে ঠাট্টা করছে। সেই স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে দেখল, কেউই অবাক হয়নি এবং ঠাট্টাও করা হয়নি ওকে। ক্রমে ঘরোয়া আলাপ জমে ওঠে, কোথায় যাবে, কোত্থেকে এসেছে ক্রিসতফ, ফসল কেমন হয়েছে। অন্ধ মেয়েটি আলাপে আর সবার মতই যোগ দেয়।

ক্রমে ক্রমে বাড়ীর অন্যান্যরা ফিরে আসে। ছেলে বছর ত্রিশেক বয়স হবে। আর তার বৌ। সকলের সহজ সরল অভ্যর্থনা ভারী ভালো লাগে ক্রিসতফের। আকাশও পরিষ্কার হ'য়ে এল। রওনা হওয়ার জন্য তৈরী হয় ক্রিসতফ। অন্ধ মেয়েটি কি একটা সুর গুনগুনিয়ে গায়। পুরানো দিনের কত কথা মনে প'ড়ে যায়। চমকে ওঠে ক্রিসতফ:

'ও কি, এ গান কোথায় পেলে তুমি?' [গতেফ্রেদ শিখিয়েছিল ওকে]

ক্রিসতফ বাকীটা গায় সাথে সাথে। মেয়েটি হাসে। ও আরম্ভ ক'রেছিল গান, শেষ করল ক্রিসতফ।

যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় ও। আনমনে ঘরের চারিদিকে চায়। এক

কোণে ওর চোখ বেঁধে গেল। বহুকালের চেনা লম্বা, পাকান ছড়িটি, মাথার কাছটা নুয়ে-পড়া বুড়ো মানুষের আকারে বাঁকান। যখন ছোট ছিল, কত খেলেছে ওই লাঠি নিয়ে। ছোঁ মেরে ওটাকে হাতে তুলে নিয়ে ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করে : 'কোথায়···কোথায় পেলে এ-লাঠি ?'

জবাব দিলে বৃদ্ধার ছেলে : 'ও আমাদের এক পুরানো বন্ধুর। মারা গেছেন তিনি। তাঁরই ফেলে যাওয়া।'

ক্রিসতফ উত্তেজিত স্বরে শুধায় : 'কে ? গতেফ্রেদ ?'

সকলে চমকে উঠে ওর দিকে তাকাল : 'আপনি চিনলেন কি ক'রে ?'

ক্রিসতফেরই মামা, শুনে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সবাই। অন্ধ মেয়েটি উঠে পড়ে কাজ ফেলে, তার সূতোর গুলি মাটিতে লোটায়। ক্রিসতফের হাত দু'টি ধরে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলে : 'আপনি তাঁর ভাগ্নে ?'

সকলে একসঙ্গে কথা ব'লে ওঠে। ক্রিসতফ জিজ্ঞাসা করে, তাঁর সাথে ওদের পরিচয় হ'ল কি ক'রে ? জবাব দেয় পুরুষটি :

'এখানেই তিনি মারা যান যে।'

সবাই ব'সে পড়ে আবার। উত্তেজনা শান্ত হ'লে মা শোনান ইতিহাস। অনেক দিন থেকেই গতেফ্রেদের আসা-যাওয়া এ-বাড়ীতে। যাতায়াতের পথে দু'চার দিন প্রায়ই থাকত এসে। শেষ আসে, বোধহয় গত জুলাইএ···চেহারাটা কেমন যেন ক্লান্ত ছিল সেবার। কাঁধের বোঝাটা নামিয়ে অনেকক্ষণ পরে দম ফেলতে পারল। অতটা খেয়াল করেনি কেউ, কারণ প্রতিবারই প্রায় ওই একই অবস্থা দেখেছে ওর। ওরা ধরেই নিয়েছিল, নিশ্বাসের কষ্ট ওর স্বাভাবিক, তা ছাড়া কখনও তো বলেনি কিছু। নালিশ করার স্বভাবই ছিল না তার ; নিকষ কালোর মধ্যেও একটু না একটু আলো নিতেনই খুঁজে। হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি এলে, ভাবতেন : বাঃ ভালোই হ'ল, রাত্তিরে ঘুমটা যা হবে। অসুখ হ'লে

ভাবতেন, অসুখ যখন সারবে, কি ভালোই না লাগবে তখন !···যাই হোক, বিশেষ নজর কেউ দেয়নি ওর দিকে। বরঞ্চ গাল দিয়েছে উল্টে ; ক্লান্তিও নেই ? একি লোহার শরীর ! মডেষ্টা [ অন্ধ মেয়েটির নাম ] ওর ঘাড় থেকে বোঝা নামাতে নামাতে বলেছিল : 'আচ্ছা আপনার কি কখনও ক্লান্ত লাগবে না ?' জবাবে শুধু একটুখানি হেসেছিল গতেক্রেদ ; কথা বলবে কি ? কথা বলার শক্তি থাকলে তো ? তারপর ধীরে ধীরে এসে দরজার কাছে বসল। সবাই যার যার কাজে গেল—মেয়েরা গেল রান্না করতে, পুরুষেরা গেল মাঠে। মডেষ্টা তার বোনা নিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল তার সাথে। একটি কথারও জবাব এল না ওপক্ষ থেকে। জবাবের জন্য বিশেষ আগ্রহও ছিল না মডেষ্টার। গতেক্রেদ সেবারে চলে যাওয়ার পর থেকে এ-পর্যন্ত যা যা হয়েছে, তার ফিরিস্তি দিতেই সে মহাব্যস্ত। বসে বসে শুধু হাঁপাতে লাগল গতেক্রেদ। কথা বলার সেকি আপ্রাণ চেষ্টা ! মডেষ্টা সবই শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে উপদেশ দেয় :

'না না, কথা বলবেন না। চুপ ক'রে বিশ্রাম করুন খানিকক্ষণ। দেখবেন এক্ষুনি কথা বলতে পারবেন। বাবাঃ ! এমন হাল কেমন ক'রে হয় মানুষের ?'

আর কথা কয়নি সে, চেষ্টাও করেনি। শুধু একবার একটা লম্বা শ্বাস পড়েছিল হয় তো। কিছুক্ষণ পরে মা এসে দেখেন মডেষ্টা তখনও অনর্গল বকে চলেছে, আর ওদিকে গতেক্রেদের দেহ স্থির, মাথা পিছন দিকে ঝুলে পড়েছে। কয়েক মিনিট আগেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে। মডেষ্টা এতক্ষণ মরা মানুষের সাথে কথা বলেছে। এতক্ষণে বুঝতে পারলে মেয়েকে মৃত্যুর আগে কি যেন বলতে চেয়েছিল হতভাগ্য। ক্ষমতায় কুলোয়নি। এই অক্ষমতাকে হাসিমুখে মাথা পেতে নিয়ে সে চলে গেছে বসন্তের এক স্নিগ্ধ সন্ধ্যায়।

বৃষ্টি থেমে গেছে। ছেলে, বৌ যার যার কাজে বাইরে গেল। গল্প শুরু হ'তেই মডেষ্টাও চ'লে গেছে। ঘরের মধ্যে মা আর ক্রিসতফ। ক্রিসতফ নির্বাক, অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে ও। মা বেশীক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে পারেন না। আবার আরম্ভ করেন—পুরানো ইতিহাস। গতেক্রেদের সাথে তাঁর পরিচয়ের বিবরণ।

সে অনেক দিনের কথা; মায়ের তখন বয়স অল্প। গতেক্রেদ ভালোবাসে তাকে। এ নিয়ে সবাই ওকে ঠাট্টা ক'রত; মাও ক'রতেন। নানারকমে তিনি ওকে নাস্তনাবুদ করতেন অন্যদের সাথে। হয়ত তাই, কোনদিন মুখ ফুটে কিছু সে বলেনি মাকে। প্রতি বছর সে নিয়মিত আসত। মায়ের অন্যত্র বিয়ে হ'য়ে গেল। বড় স্থখী হয়েছিলেন তিনি। খুব কমের ভাগ্যে এমন স্থখ ঘটে। কিন্তু বেশীদিন তা সইল না। স্বামী মারা গেলেন। তারপর এই মেয়ে। স্বাস্থ্যবতী বিয়ের যুগ্যি মেয়ে। বিয়ের সব ঠিক। চমৎকার ঘর বর। গেল গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়তে। পা'খানা গেল হড়কে। বাস্, আর যাবে কোথায়। একেবারে মাটিতে। পড়বার সময় একটা শুকনো ডালের বাড়ি লাগল চোখের পাশে। সবাই ভাবলে দু'দিনে সেরে যাবে। কিন্তু কপালের ব্যথাটা আর সারে না। প্রথমে একটা চোখ গেল। তারপর আর একটা। কত হাকিম, বৈদ্য, কত কি। কিছুতে কিছু না। বিয়ে-টিয়ে গেল ভেঙ্গে। পাত্র কিছু না ব'লে ট'লে কোথায় কেটে প'ড়ল। এতদিন পাড়ার ছোঁড়াগুলো হতভাগা মেয়েটার সাথে একটু নাচবার জন্য কিই না ক'রেছে। কিন্তু এর পরে আর কারও টিকিও দেখা যায় না। অন্ধ মেয়েকে কে ঘরে নেবে? অমন হাসিখুশি মেয়ে আমার, তার মুখের হাসি ঘুচল, বাঁচার সাধ ঘুচল। কেমন মন-মরা হ'য়ে থাকে। খাওয়া-দাওয়া ছাড়ল। রাতদিন কেবল চোখের জল। সারা রাত্তির

মেয়ে বিছানায় প'ড়ে ফুঁ ফিয়ে ফুফিয়ে কাঁদে। কি যে করবে ভেবে ভেবে অস্থির সব। কোন উপায় মেলে না। ওর সাথে সবাই কাঁদে। তাতে লাভ হল মেয়ে আরো বেশী কাঁদে দরদ পেয়ে। শেষটায় সকলের ধৈর্যচ্যুতি হ'ল। আর সহানুভূতি না দেখিয়ে সবাই ওকে বকতে লাগল কান্নার জন্য। ও বলে ডুবে মরবে খালের জলে। মাঝে মাঝে পাদ্রী সাহেব আসেন, নানা ধর্মের কথা বলেন, বোঝাতে চেষ্টা করেন দুঃখ দিয়েই পরলোকের পথ খোলসা হয়। ও যতই দুঃখ পাচ্ছে, ততই ঈশ্বরের রাজ্যের যোগ্য হচ্ছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মেয়ের কান্না কিছুতেই ঘোচে না। এমন সময় একদিন এল গতেক্রেদ। গতেক্রেদের সাথে কোনদিনই ভালো ক'রে কথা বলেনি মডেষ্টা। ঠিক যে দেখতে পারত না তা নয়। ওই এক ধরণের জেদী মেয়ে। গম্ভীর হ'য়ে কোনদিন কিছু ভাবতে শেখেনি। শুধু হেসে খেলে বেড়িয়েছে। এই দুর্ঘটনায় গতেক্রেদ এমন আঘাত পেলে যেন সেও এ বাড়ীরই একজন। যাই হোক কিছু বুঝতে দিলে না মডেষ্টাকে। ধীরে ধীরে গিয়ে বসল ওর পাশে যেমন আগেও বসত। এত সব ব্যাপার যে ঘটে গেছে তার এতটুকু উল্লেখও করলে না। একটা দীর্ঘশ্বাসও না, আহা উঁহুও না। সাধারণভাবে গল্পসল্প করতে লাগল বরাবরের মত। এমন ভাব দেখাল, যেন ওর অন্ধ হওয়াটা সে লক্ষ্যই করেনি। শুধু যে-সব জিনিস চোখে দেখেনি মডেষ্টা সে-সব জিনিস একেবারে বাদ দিয়ে গেল। যা ও শুনতে পায়, অনুভব করতে পারে তাই নিয়ে একেবারে সাধারণ ভাবে গল্প করতে লাগল, যেন ও নিজেও অন্ধ। প্রথম কেবল কাঁদল মডেষ্টা। কিছুই কানে গেল না ওর। কিন্তু পরের দিন পরিবর্তন দেখা গেল। চুপ ক'রে শুনল, কথাও বলল দু'চারটা…।

মা ব'লে চলেন: 'কি যাদু যে ক'রল গতেক্রেদ কিছুই জানিনে।

কারণ খড় শুকানো নিয়ে আমরা ভারী ব্যস্ত তখন, ওদিকে তাকাতে পারিনি। সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরে দেখি, শান্তভাবে গল্প করছে আমার মেয়ে। তারপর থেকেই-একটু একটু ক'রে ও ভালর দিকে গেল। একা ব'সে কাঁদে অবশ্যি মাঝে মাঝে। গতেফ্রেদের সাথে দুঃখের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে-মানুষ ওধার দিয়েও যায় না। কানেও তোলে না কোন কথা। মডেষ্টার যা ভালো লাগবে, বা যাতে একটু ভুলে থাকবে, এমন সব কথাই সে বলে, কখনও গম্ভীরভাবে, কখনও হালকা সুরে। তারপর দেখি একদিন বেড়াতেও নিয়ে বেরুল ওকে। অন্ধ হবার পর থেকে ঘরের বার একদিনও হয়নি। প্রথম বাগানেই একটু আধটু ঘোরে। তারপর দেখি আরও দূরে যায় মাঠের দিকে। ক্রমে ক্রমে সাহায্য ছাড়া নিজেই সব জায়গায় যেতে পারে। চক্ষুওয়ালা লোকের মত সব বোঝে। এমন কি আমার চোখে যা পড়ে না তা ওর খেয়াল এড়ায় না। আগে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই কি বুঝতো ও মেয়ে? তখন দেখি চারদিকে নানা বিষয়ে ওর আগ্রহ। এবারটায় অন্যবারের চেয়ে কিছুদিন বেশী থাকল গতেফ্রেদ। মডেষ্টা একটু স্থির না হওয়া পর্যন্ত নিজে থেকেই রইল, আমরা থাকার কথা বলতে সাহস করিনি। যেদিন প্রথম ওর হাসি শুনতে পেলাম, প্রাণে যে·সেদিন কি হ'ল কি ক'রে বোঝাব তোমায়। আমার কাছেই ব'সেছিল গতেফ্রেদ, দেখলাম তার মুখে খুশি আর ধরে না। আমরা দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে রইলাম। আর···কি বলব, বলতে একটুও লজ্জা নেই, সেদিন প্রাণ থেকেই গতেফ্রেদকে সত্যিকার একটা চুমু খেয়ে ফেললাম। তারপর ধীরে ধীরে ও বলল: 'এবার যেতে পারি তা হলে। আর তো দরকার নেই আমার।' অনেক চেষ্টা করলাম রাখতে। কিছুতেই থাকল না।

'সবাই জানে গতেফ্রেদ যাযাবর। এক ঠাঁই থাকতে পারে না বেশী

দিন। বেশী জোর আর করলাম না। চলে গেল। কিন্তু এরপর থেকে একটু শিগগির শিগগির আসে। ও এলেই খুশি হয় মডেষ্টা। যেন অনেকখানি ভালও হ'য়ে যায়। ঘরের কাজে হাত দেয় ক্রমে ক্রমে। ওর ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে। তাদের ছেলেপুলেদের এখন ওই তো দেখা শোনা করে। এখন সর্বদাই ও বেশ ফুর্তিতে থাকে। কিছু নিয়ে আর গোলমাল নেই। চোখ দুটো থাকলে এত খুশি হত কিনা সন্দেহ।'

মডেষ্টা ফিরে আসে। আলাপের মোর ফেরাতে হয়। ক্রিসতফকে কিছুতেই যেতে দিলে না। রাত্তিরটা থাকবে কথা দিতে হল। সারা সন্ধ্যে মডেষ্টা ক্রিসতফের পাশে বসে রইল। বড় কষ্ট হয় ওই মেয়েটির জন্য। ইচ্ছে হয় একটু ভালো ক'রে কথা বলে ওর সাথে। কিন্তু সে অবকাশই দিলে না মডেষ্টা। ও খালি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গতেফ্রেদের কথা জিজ্ঞাসা করে। ক্রিসতফএর কাছ থেকে নূতন কতগুলো খবর পায়, বড় আনন্দ হয়, হিংসেও হয়। নিজে কিছু বলতে চায় না গতেফ্রেদে সম্বন্ধে। বেশ বোঝা যায়, সব কথা ও বলেনি। বলতে গিয়ে কুণ্ঠিত হ'য়ে ওঠে। ওর মনের মন্দিরে গতেফ্রেদের স্মৃতি অক্ষয় মণি-দীপ হ'য়ে জ্বলছে। ঐ স্মৃতি ওর পরম ঐশ্বর্য, সে-ঐশ্বর্যের ভাগ ও কাউকে দেবে না। বরঞ্চ সঞ্চয় বাড়াবে। মাটির প্রতি কৃষক মেয়ের যে দুনির্বার আসঙ্গ, সেই আসঙ্গ নিয়ে ও গতেফ্রেদের কথা শুনতে চায়। ও মানুষটিকে কেউ ওর চাইতে বেশী ভালোবাসে ভাবতে ওর বুকটা খচখচ ক'রে ওঠে। ভাবতেই পারে না সে-কথা। ক্রিসতফ বোঝে, অন্ধ মেয়ের এই আত্মতৃপ্তিতে আঘাত দিতে ওর মন সরে না। তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে কথা শুনতে শুনতে: গতেফ্রেদের যে প্রতিমা এই অন্ধ মেয়ের দৃষ্টির সামনে রয়েছে, সে একেবারে নূতন। চক্ষুষ্মতী মেয়ে যাকে দেখেছিল এ সে নয়। এ সম্পূর্ণ আলাদা। অনাদৃতার বুভুক্ষু হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসার নৈবেদ্য সাজান ওর প্রতিমার

দেউলে। ওর এই স্বপ্নের জগতে অক্ষয় হ'য়ে আছে সেই বিদেহী মানুষ। হঠাৎ বলে ওঠে মডেষ্টা : 'আপনিও ঠিক তার মত।'

স্বরে ওর অখণ্ড নিশ্চয়তা। যে নির্ভীক নিশ্চয়তা দিয়ে দৃষ্টিহীন তার নিজের জগত সৃষ্টি করে।

বোঝে ক্রিসতফ, বহুদিন মডেষ্টা এক দরজা জানালা বদ্ধ নিরন্ধ্র অন্ধকার ঘরের মধ্যে রয়েছে বন্ধ, সেখানে সত্য প্রবেশের পথ পায়নি। এখন আঁধারে ওর দৃষ্টি খুলে গেছে। ভুলতে পারে এখন চারপাশের কালোকে। ওর এখন আলোকেই ভয়। ছোট ছোট বাজে কতগুলো পুরানো কথা ঝালাতে চেষ্টা করে অত্যন্ত হালকা অসংলগ্ন ভাষায়। ক্রিসতফএর অসহ্য লাগে। ভেবেই পায়না এত দুঃখ যে পেয়েছে সে-মেয়ে কি এতটুকুও গাম্ভীর্য শিখলে না! ওর কাছে এর যেন ক্ষমা নেই। ও চেষ্টা করে গম্ভীর কথার আলোচনা করতে। কিন্তু ও পক্ষের সাড়া পাওয়া যায় না। মডেষ্টা যেন বুঝতে পারে না ওর কথা, অথবা বুঝতে চায় না।

রাতে সহজে ঘুম আসে না ক্রিসতফের। গতেক্রেদের ছবিতে অন্ধকার ভরে ওঠে। মডেষ্টা তার ছেলেমানুষী দিয়ে যে প্রতিমা গড়েছে, তার আড়াল থেকে ছিনিয়ে আনতে চেষ্টা করে মৃতের সত্যকার রূপকে। কিন্তু কি আশ্চর্য! পারে না তো! মনে হয়, এ গৃহেই তো মামার শেষ নিশ্বাস পড়েছে, হয়ত এই বিছানায়ই রচিত হয়েছিল তাঁর শেষ শয্যা। বুকটা এক তীব্র ব্যথায় টন্ টন্ ক'রে ওঠে। অনুভব করতে চেষ্টা করে, শেষ মুহূর্তে কথা বলতে পারেনি মামা। কত বেদনায় আকুলি বিকুলি করেছে মুমূর্ষুর বোবা হৃদয়। বোঝাতে পারেনি পাশে-দাঁড়ানো অন্ধ মেয়েকে। একলা মানুষটির বোবা চোখের ওপর সকলের অলক্ষ্যে মৃত্যুর তমিস্রা কেমন ক'রে নেমে এসেছিল কে জানে। ওর ইচ্ছে করে স্তিমিত চোখ দুটির পাতা টেনে তুলে ধরে দেখে কি ভাষা স্তব্ধ হ'য়ে

আছে সেখানে! যে-মানুষটি চলে গেল সবার অলক্ষ্যে চিরকাল আপনাকে সবার আড়ালে রেখে, সে-মানুষের আত্মার কোন্ রহস্য উদ্ভাসিত হ'য়ে আছে ওই নিশ্চল চোখের তারায়। নিজেকে তিনি জানতে চাননি, চাননি বিজ্ঞ আর আর পণ্ডিত হতে; এইখানেই সেই মহামানবের আসল প্রজ্ঞা। পরিস্থিতির উপর জুলুম কখনও করতেন না; সানন্দে শিরোধার্য ক'রে ভবিতব্যের স্রোতে দেহ-মন-প্রাণ ভাসিয়ে দিয়েছেন। এমনি ক'রে বিশ্বসংসারের মর্মবাণী গতেক্রেদের অজ্ঞাতসারে তার সত্তার সাথে মিশে গিয়েছিল। মডেষ্টা, ক্রিসতফ এবং আরো অনেকের জীবনে এই ক্ষীণ মানুষটির কল্যাণহস্তের কত দানই না রয়েছে; কিন্তু কোনদিন কাউকে একটি বিদ্রোহের কথা শোনাননি আরো দশজনের মত। উদাসিনী শান্তিময়ী প্রকৃতির শান্তিখানিকে অলক্ষ্যে এনে কেমন ক'রে তাদের ব্যথার সাথে দিয়েছেন ছড়িয়ে। যে প্রকৃতির রসে ওর সত্তার অনু-পরমাণু রসময়, তারি মাটি, জল, স্থল, বন বনানীর মত ক'রে গতেক্রেদ শুধুই কল্যাণ ক'রে গেছেন নীরবে। মনে পড়ে গ্রামের মুক্ত আকাশের তলায় মামার সাথে কাটানো সন্ধ্যাগুলি; রাত্রিবেলা যে গান গেয়ে, যে গল্প বলে শুনিয়েছেন শিশু ক্রিসতফকে, কত সুদীর্ঘ কালের পথ পেরিয়ে তারা আজ আবার ওর কানের কাছে প্রাণের মাঝে গুঞ্জন তোলে। মামাকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিল; শীতের সকাল বেলায় ঝড় তুফানের মধ্যে পাহাড়ের ওপর দিয়ে দুজনে চলেছিল একসাথে। সেই শেষ। চোখের জল বাধা মানে না। ঘুমুতে ইচ্ছা করে না। কোন অলক্ষ্য দেবতা ওকে নিয়ে এলেন এখানে, অজানা গ্রামের এই গৃহ কোণে, যার প্রতিটি ধূলি কণা, প্রতি বিন্দু বায়ুর সাথে মিশে আছে সেই মহাপ্রাণের আত্মা। একটি ক্ষণও হেলায় হারাবে না। বিদেহী সেই আত্মার সাথে একাত্ম হ'য়ে আজ ওর পহর জাগা। কোথায় ঝরণাটার জলঝরার

এলোমেলো শব্দ কানে আসে। কর্কশ চিৎকারে বাদুর ডেকে ডেকে যায়। আর স্বাস্থ্যবান তরুণ দেহের গ্লানিহীন শ্রান্তি অবস ক'রে দেয় ওর দেহ মনকে। ঘুমিয়ে পড়ে ক্রিসতফ।

পরের দিন ঘুম যখল ভাঙ্গল, সূর্য উঠে গেছে অনেক দূর। সবাই যার যার কাজে চলে গেছে। ছেলে, বৌ গেছে মাঠে, মডেষ্টা গেছে দুধ দুইতে। মাঝের ঘরে শুধু বৃদ্ধা আর বাচ্চা দু'টি। কিন্তু মডেষ্টাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। ওর সাথে দেখা করার খুব একটা আগ্রহ ছিল না ক্রিসতফের। বললে, তাড়া আছে, আর দেরী করা সম্ভব হবে না। মা যেন ওর বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে দেন সবাইকে।

কিন্তু গাঁয়ের সীমায় পথের বাঁকে, বাঁধের ওপর হথর্ণ ঝোপের তলায় ব'সে মডেষ্টা। ক্রিসতফের পায়ের শব্দ পেয়ে হাসিমুখে ছুটে এসে হাত ধরে বল ল: 'চলুন।'

মাঠ পেরিয়ে ওরা চলল। চড়াইএর রাস্তা। খানিক দূরে ফুলে ফুলে ছাওয়া একটা বাগান—অসংখ্য সমাধি, তার নীচে ওই হোথা গ্রাম দেখা যায়। একটা কবরের কাছে ওকে নিয়ে এসে বললে মডেষ্টা:

'এখানে।'

দু'জনে নতজানু হ'য়ে বসল। মনে পড়ে আর একদিন আর একটি সমাধির পাশে এমনি করেই ও নতজানু হ'য়ে বসেছিল গতেফ্রেদ-এর সাথে। ভাবে, এবার ত আমার পালা।

মনের মধ্যে বিষাদ নেই আজ। মাটির বুক থেকে কি এক গভীর শান্তি উর্ধ্বাকাশে উঠছে। সমাধির ওপর ঝুঁকে পড়ে ক্রিসতফ। গতেফ্রেদের কানে কানে বলে:

'তুমি এস, এস, আমার মধ্যে তুমি এস···'

মডেষ্টাও প্রার্থনা করে। নীরব প্রার্থনায় ঠোঁট দু'টি শুধু কেঁপে কেঁপে

ওঠে। শেষ হ'য়ে গেলে নতজানু হয়েই সমাধিটি প্রদক্ষিণ ক'রে দুই হাতে প্রতিটি ঘাস, প্রতিটি ফুল পরম আদরে স্পর্শ ক'রে ক'রে ওর জীবন্ত আঙ্গুলগুলি যেন দেখতে পায়। আইভি আর ভায়োলেট ফুলের শুকন ডাঁটগুলোকে কোমল হাতে ভেঙ্গে দেয়। নামলেখা ফলকখানার ওপর ভর দিয়ে ও ওঠে। ক্রিসতফ লক্ষ্য করে গতেফ্রদের নামের প্রতিটি অক্ষরের ওপর আলতো ভাবে হাত বুলিয়ে যায়। মডেষ্টা বলে :

'পৃথিবীটা বড় মিঠে লাগছে আজ।'

হাত বাড়িয়ে দেয় ক্রিসতফের দিকে। নিজের হাতে তুলে নেয় ক্রিসতফ। মডেষ্টা ওর হাত ধরে ভিজে মাটির ওপর চেপে ধরে। শক্ত ক'রে ধরে ক্রিসতফ অন্ধ মেয়ের হাত। দৃঢ়-সংলগ্ন হাত দুটি মাটির গভীরে পথ খোজে। পরস্পরকে চুম্বন করে দু'জনে।

হাঁটুর ধূলো ঝেড়ে উঠে পড়ে দু'জনে। মডেষ্টা ওর তোলা তাজা ভায়োলেটগুলি ক্রিসতফকে দিয়ে, ঝরন্ত ফুলগুলো নিজের জামায় লাগায়। নিঃশব্দে সমাধিস্থল থেকে বেরিয়ে আসে ওরা। মাঠে মাঠে লার্ক-এর ডাক ; বৃষ্টি-ধোয়া আকাশ বেয়ে ওঠে পাশের গাঁ থেকে ওঠা ধোঁয়ার ঋজু রেখা। একটা মাঠে গিয়ে বসল দু'জন। সরে সরেই বসল। পপ্‌লার বনের মাঝখান দিয়ে বয়ে-যাওয়া খালের জল ঝিক্‌মিক করে। দীপ্তিময় নীল কুয়াশার আবরণে ঢাকা মাঠ, ঘাট, বন বনানী।

কানে কানে বলে মডেষ্টা : 'কি সুন্দর পৃথিবী!' যেন দুই চোখ ভরে ও দেখছে রূপসী পৃথিবীর রূপ। আধখোলা ওষ্ঠ দুটি দিয়ে যেন ও বাতাসকে পান করে গণ্ডুষ ভ'রে ভ'রে। কান পেতে থাকে কোথায় কিসের শব্দ ওঠে। ক্রিসতফও প্রকৃতির এই সঙ্গীতের মধুর স্বাদ জানে। ঘাসের বুকে, শূন্যের বুকে কত দোলাই লাগে, কত ধ্বনি বেজে চলে অনুক্ষণ ; ক্রিসতফ তার পরিচয় দেয়। মডেষ্টা শুনে বলে :

'আঃ, তুমিও জান তাহ'লে ?'

নিরন্তর এই ধ্বনি প্রবাহ হতে বিভিন্ন শব্দ চিনে নিতে মামা শিখিয়েছিলেন ওকে।

একটু যেন রুষ্ট হয় মডেষ্টা, বলে : 'তোমাকেও ?'

ক্রিসতফ বলতে যায় :

'হিংসে করোনাগো, হিংসে করোনা।' কিন্তু তাকিয়ে দেখে কি এক স্বর্গীয় দ্যুতি হাসছে তাদের ঘিরে ঘিরে। দৃষ্টিহীনার শূন্য দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে গভীর মত্ততায় ওর বুক ভ'রে ওঠে। শুধায় : 'গতেফ্রেদের কাছ থেকেই শিখেছ তাহ'লে···।'

ছোট্ট একটুখানি জবাব দেয় অন্ধ মেয়ে : 'হ্যাঁ।' কোন প্রশ্ন করে না। বলতে গিয়ে ওর মুখ খুশিতে উপচে ওঠে।

করুণা-ভরা দৃষ্টিতে ক্রিসতফ তাকায় ওর দিকে। বুঝতে পারে মডেষ্টা। ক্রিসতফ-এর ইচ্ছা হয় জানুক মেয়ে তার জন্য কতখানি দরদে ওর বুক ভ'রে আছে। ইচ্ছা হয় হৃদয় খুলুক মডেষ্টা, তার দুঃখের কথা বলুক ওর কাছে। কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করে :

'অনেক কষ্ট পেয়েছ, না ?'

গুম হ'য়ে ব'সে থাকে মডেষ্টা চুপ ক'রে ; ঘাসের শীষ তুলে তুলে চিবোয়। একটা লার্ক গাইতে গাইতে উড়ে যায় ; ধীরে ধীরে দূর হ'তে দূরে মিলিয়ে যায় তার রেশ। কয়েক মুহূর্ত কেটে যায় নিঃশব্দে। তারপর ক্রিসতফ আরম্ভ করে তার নিজের জীবনের দুঃখ বেদনা সংগ্রামের ইতিহাস। দুঃখে, নিরাশায় ওরও জীবন এমনি ক'রে ঝিমিয়ে পড়েছিল। গতেফ্রেদই ওকে সেই অন্ধকার থেকে নিয়ে এসেছিলেন আলোর মুক্ত অঙ্গনে। একটি একটি ক'রে ইতিহাসের প্রতিটি পাতা উল্টায়। মডেষ্টার মুখ প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ; গভীর আগ্রহে ও শোনে ক্রিসতফের

কাহিনী। ক্রিসতফ তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। কাছে সরে আসে মেয়ে, ওর হাত ধরতে চায়। কাছে সরে আসে ক্রিসতফও। কিন্তু এরই মধ্যে ঔদাস্যে সুদূর হ'য়ে ওঠে মডেষ্টা; ক্রিসতফের কাহিনী শেষ হ'লে সাধারণ সান্ত্বনার ভাষায় জবাব দেয়। রেখাবিহীন প্রশস্ত ললাটে কৃষক মেয়ের পাথুরে জেদ লেখা। শান্তভাবে হেসে ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের কথা বলে; বলে: 'ফিরতে হবে এখন বাড়ী। ওগুলো কি জানি কি করছে।'

ক্রিসতফ শুধায়:

'সুখেই আছ তাহ'লে?'

সুখ শব্দটি ওর মুখে শুনে, আরো বেশী সুখ ঝলমলিয়ে ওঠে মডেষ্টার মুখে চোখে। সুখী? নিশ্চয়ই। কেনই বা সুখী হবে না। ক্রিসতফকে ও নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে সত্যি সুখী ও। বাড়ীর কথা, ওর কাজ কর্মের কথা, দাদার ছেলেদের কথা অত্যন্ত সহজ সুরে বলে যায়।

জবাব দেয় না ক্রিসতফ। উঠে পড়ে মডেষ্টা। ক্রিসতফও ওঠে; খুব হেসে বিদায় নেয় দু'জনে। ক্রিসতফের হাতের মধ্যে মডেষ্টার হাতখানা কেঁপে ওঠে একটু।

মডেষ্টা বলে: 'আবহাওয়াটা খুব ভালো পেয়ে গেলে।' আগে কোথায় চৌমাথা আছে, ভুল যেন না করে ক্রিসতফ। এমনি ক'রে ওকে পথের নিশানা বোঝাতে বসে যেন ক্রিসতফই অন্ধ।

পাহাড় বেয়ে নেমে যায় ক্রিসতফ। নীচে এসে ফিরে তাকায়, অন্ধ মেয়ে তখনও দাঁড়িয়ে ঠিক একই জায়গায়। রুমাল নাড়ছে মডেষ্টা, যেন দেখতে পাচ্ছে ও ক্রিসতফকে।

মডেষ্টার নিজের জীবনের ব্যর্থতাকে হেলায় অস্বীকার করার এই পাথুরে গোঁ-র মধ্যে মর্যাদা আছে, মনে হয় ক্রিসতফের; আবার কেমন যেন অশোভনও লাগে। মুগ্ধও হয়, ব্যথাও লাগে। করুণারই পাত্রী

মডেষ্টা, ওর মন বলে। প্রশংসা করার মত গুণও আছে। কিন্তু দুদিনও ও কাটাতে পারত না এ মেয়ের সাথে। ফোটা ফুলের ঝাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে শুলজ-এর কথা মনে পড়ে; বহু বছরের পোড়-খাওয়া মানুষটির প্রাচীন চোখ দুটি তারার মত ফুটে ওঠে ওর মনের পটে—কত বেদনা, কত কাঁদনের স্রোত বয়ে গেছে ওই উজ্জ্বল, স্নেহাতুর চোখ দুটির সামনে দিয়ে। কিন্তু কিছুই দেখেনি তারা; দেখবে না এই ছিল পণ ঐ মানুষের। হোক বাস্তব, কিন্তু আঘাত-দেওয়া-বাস্তবকে দেখবে না।

অবাক লাগে ভাবতে ক্রিসতফের, এত তফাৎ দু'জনের মধ্যে তবু অমন চোখে দেখলে কি ক'রে আমায়! ওর চোখে আমি আমি নই; যে-রূপে আমায় দেখতে চান, সেই রূপেরই কল্পনায় গড়া-মূর্তি, নিজেরই মত শুচিতায়, ঔদার্যে সুন্দর। জীবনের আসল চেহারাটা দেখলে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না বৃদ্ধ।

আর ওই মেয়ে, যে আঁধারে বাস ক'রে স্বীকার করে না আঁধারকে! আর ছল ক'রে ছায়াকে বলে কায়া, আর কায়াকে বলে ছায়া!

ওর চোখের সামনে থেকে একখানা কালো পর্দা সরে যায়। জার্মান আদর্শবাদ যে কত বড় মনেপ্রাণে বোঝে তা আজ। এই বস্তুকেই একদিন ও ঘৃণা করেছিল সংকীর্ণচেতা মানুষের মধ্যে তার বিপরীত ফল দেখে। তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের বুকে ছোট্ট একটুখানি দ্বীপের মত, এই পৃথিবীর মধ্যেই আর একটা পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে নিতে পারে যে-বিশ্বাসে, মানুষের বুকের সেই বিশ্বাসকে আজ মুগ্ধ নয়নে দেখে ক্রিসতফ। কিন্তু আর যারই থাক ও-জিনিস ওর ধাতে সইবে না। মৃতের রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে বাঁচবে ক্রিসতফ? না না। ও চায় জীবনকে, চায় সত্যকে। চায় জীবনের সাথে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াতে। মিথ্যা কথা বলে নায়ক সেজে বাহাদুরী নিতে পারবে না ও। শোনা যায়, কোন এক জার্মান সম্রাট তাঁর মিথ্যে

আশাকে আইনে বেঁধে তাই দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছিলেন প্রজাদের। বাঁচতে চায় যে দুর্বলের দল, ঐ রকম মিথ্যের খুঁটি তাদের একান্ত দরকার। ঐ মিথ্যাই বাঁচিয়ে রাখে দুর্ভাগাদের। এটুকুকে যে কেড়ে নেয় মহাপাপী সে। কিন্তু ক্রিসতফ পারবে না অমন ক'রে বাঁচতে। মিথ্যাকে আঁকড়ে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যু ভালো। শিল্প কি মিথ্যা নয়? না মিথ্যা হ'তে পারে না শিল্প। মিথ্যে হবে না। সত্য! সত্য! ওগো মানুষ খোলা চোখে দেখ সত্যকে; জীবন নিঃশ্বাস-বায়ু হ'য়ে প্রতি রোমকূপ দিয়ে প্রবেশ করুক তোমার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে। সংসারকে তার সত্যরূপে দেখে দুঃখকে বীর্য দিয়ে বরণ কর ধারণ কর—আর হাসো প্রাণ খুলে।

কয়েকটা মাস চলে গেল। শহর ছেড়ে যাবার আশা ছেড়ে দিলে ক্রিসতফ। একমাত্র ওকে বাঁচাতে পারতেন হাসলার, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে ও পেয়েছে প্রত্যাখ্যান। আর একজন ছিলেন—বৃদ্ধ শুল্জ। কিন্তু হারিয়ে গেলেন তিনি তাঁকে পাওয়ার সাথে সাথেই।

ফিরে এসে একখানা পত্র তাঁকে লিখেছিল ক্রিসতফ; জবাবে দু'খানা স্নেহসিক্ত চিঠি পেয়েছিল ও। কিন্তু জবাব দেয়নি—আলস্যেও বটে, ভাষাগত দৈন্যের জন্যও বটে। আজ লিখি, কাল লিখি ক'রে গড়িয়ে গেল দিনের পর দিন। তারপর কুন্জ্-এর চিঠিতে এলো শুলজ-এর মৃত্যু সংবাদ। সেই ব্রঙ্কাইটিস্ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় নিউমোনিয়ায়। সারা জীবন রোগে ভোগা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় বড় কষ্ট পেয়ে গেছেন। দিনরাত ক্রিসতফ-এরই কথা ছিল মুখে, কিন্তু তবু অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে তাকে বিব্রত করতে রাজী হননি কিছুতে। কুন্জ্‌কে বলে গিয়েছিলেন ওর মৃত্যু সংবাদ জানাতে; আর জানাতে যে ক্রিসতফের নাম স্মরণ করতে করতে তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়েছে। ক্রিসতফের কাছ থেকে যত সুখ

পেয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আশীর্বাদ ক'রে গেছেন। যতদিন বেঁচে থাকবে ও, ওই আশীর্বাদ ওকে ঘিরে থাকবে। সবই জানাল কুন্জ মৃতের শেষ ইচ্ছামত; শুধু জানাল না, ক্রিসতফের সাথে সেই বেড়ানই হয়েছিল বৃদ্ধের কাল।

নীরবে কাঁদল ক্রিসতফ। আজ বুঝতে পারল ক্রিসতফ, কত বড় বন্ধু ও কত বড় মানুষ চলে গেল। অনুতাপে ও পুড়ে যেতে লাগল, কেন আরো ভালো ক'রে জানতে দিল না ও, কত গভীর ছিল ওর ভালোবাসা। আজ আর তো সময় নেই। কিন্তু পথিক তো চলে গেল, ক্রিসতফকে দিয়ে গেল কোন্ ধন সে যাবার বেলায়? শুধু ওর বুকের শূন্যতা হ'ল শূন্যতর; আরো কালো হ'ল রাতের অন্ধকার। কুন্জ আর পট্‌মেটশ্মিট্ হারালেন একজন সুহৃদকে—ঐ পর্যন্ত। কারণ, পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ঊর্ধ্বে আর কোন মূল্য ছিল না তাঁদের পরস্পরের কাছে। ক্রিসতফ মানুষ দুটির মূল্য বিচার করতে ভুল করেনি। একখানা পত্র লিখেছিল তবুও ও; কিন্তু সম্পর্ক ওখানেই শেষ। মডেষ্টার কাছে লিখতে চেষ্টা ক'রল। জবাবে এল নিতান্ত সাধারণ একখানা চিঠি যত আজেবাজে কথা ভরা। এরপর আর কাউকে চিঠি লেখেনি ও। ওকেও কেউ লেখে না।

স্তব্ধ! স্তব্ধ! একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেল ক্রিসতফ। দিনের পর দিন নীরবতার ঘন আবরণের তলায় ও লুপ্ত হ'য়ে যায়। যেন ভস্ম-বৃষ্টি হ'য়ে ভস্মের তলায় চাপা প'ড়ে গেল আগুন ছেলে। মধ্যাহ্নেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে চায়; জীবনের গ্রন্থি খসে যেতে চায় মুক্তি হ'তে। কিন্তু এ বিলুপ্তি ও স্বীকার করবে কি ক'রে! ডাক তো আসেনি। নিদ্‌মহল থেকে নিদ্‌পরীর হাতছানি এখনও দেখা যায়নি। বাঁচতেই হবে ক্রিসতফকে, মরবে না, মরতে পারবে না।

কিন্তু জার্মানীতে থাকা আর নয়। সৃষ্টির বেদনায় বেদনাবতী ওর প্রতিভা ছোট শহরের ক্ষুদ্রতায় যেন সংহারিণী হ'য়ে ওঠে। ওর কাঁচা স্নায়ু হ'তে রক্ত ঝরে প্রতিটি আঘাতে। শহরের পার্কে পার্কে খাঁচায় গর্তে বন্দী পশু পাখীদের মত ও ঝিমিয়ে পড়ে। শহরে গিয়ে প্রায়ই দরদ-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বন্দী জীবগুলির দিকে। কি আশ্চর্য ওদের চোখ! কখনও ভয়ংকরী অগ্নিশিখা ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলে; তারপর ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হ'য়ে আসে দিনের পর দিন। বুলেটের মুখে যদি মুক্তি আসে, তবে ঝরুক বুলেট, কত বুলেট আছে কার ভাণ্ডারে; নয় রক্ত-ঝরা কলজেগুলোর মধ্যে দাও ছোরা বসিয়ে। হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু। বুলেট নয় ছোরা। একটা কিছু। এই না-মরণ, না-বাঁচন অবস্থা থেকে মুক্তি চাই-ই। কিন্তু বাঁচতেও দেবে না, মরতেও দেবে না মানুষগুলো। ওরা নির্বিকার। ওদের এই বর্বরতার চাইতে বুলেট ছোরাও সহস্রগুণে ভাল!

সেই না-মরণ না-বাঁচন অবস্থা ক্রিসতফের। প্রতিবেশীদের শত্রুতা আছে—তবু তার একটা হদিশ পাওয়া যায়, চেহারাটা চেনা যায়; কিন্তু এখানকার মানুষগুলোর চরিত্র অদ্ভুত! বোঝবার জো নেই কখন তার কি চেহারা। এখন হাঁ তো পরমুহূর্তেই না। অর্থাৎ কোন চেহারাই নেই। গভীরতা নেই, ডোবার জলের মত। এরকম মানুষের সাথে কিভাবে যে চলা তা বোঝা কঠিন। সব থেকে বেশী বিপদ হ'ল ক্রিসতফের এইখানে। ও ছট্‌ফট্ ক'রে মরে। ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়।

স্বদেশ নিজের মধ্যে ওকে যেন আর ধরে রাখতে পারে না। বিশিষ্ট এক জাত পাখী আছে, বছরের বিশেষ একটা সময়ে তারা পাগল হ'য়ে ওঠে দেশান্তরী হবার নেশায়। রীতিমত জৈব প্রেরণা। ক্রিসতফও দূরের অভিসারে অধীর হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু কোথায় যাবে! কিছুই জানা নেই। নিজেরই অজ্ঞাতে মন দক্ষিণে ডানা মেলে। ফ্রান্স—! বিপন্ন জার্মানীর চির আশ্রয় ফ্রান্স। অথচ জার্মানী চিরকাল ফ্রান্সকে গাল দিয়েছে। এক মুখে গাল দিয়েছে আর একমুখে আশ্রয় মেগেছে। শিল্পের পীঠভূমি ফ্রান্স! সঙ্গীত-শিল্পের পূর্ব-গুরুদের অনেককেই স্বদেশের বিমুখতায় ফ্রান্সের দিকে মুখ ফেরাতে হয়েছিল। তাই হোক, ক্রিসতফও চলে যাবে পারীতে···। কিন্তু কাউকে তো জানে না সেখানে। ফরাসীদের সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই, শুধু ক্ষণিকের পরিচিতা দুই ফরাসিনীর স্মৃতি আর পুঁথির বিদ্যা মাত্র সম্বল। হোক্, ওই ঢের। এইটুকু দিয়েই কল্পনার ছবি আঁকা চলে, কত আলো, কত হাসি-গানের, কত বীর্যের দেশ সে; সেখানকার মানুষের হয়তো বা কিছু গুমর আছে, কিন্তু ফরাসী তরুণের সাহস-বিস্তৃত-বক্ষ-পটের সাথে ওটুকু অহংকার মানিয়ে যায়। এসব শুধু কল্পনার অলীক ছবি নয় ক্রিসতফের, তার বিশ্বাসের ধন। এ বিশ্বাসটুকু ওর একান্ত প্রয়োজন, কারণ বাস্তবের ফ্রান্সের এই মূর্তিই মনেপ্রাণে কামনা করে ক্রিসতফ।

যাবেই। সংকল্প স্থির ক'রে ফেলে ক্রিসতফ। কিন্তু মায়ের জন্য বাধা পড়ে। ক্রমশঃই বয়সের ভারে নুয়ে পড়ছেন লুইসা। সংসারে এই ছেলেকেই আঁকড়ে ধরে আছেন। সমস্ত আনন্দ ওই ছেলে। ক্রিসতফেরও বিপুলা এই পৃথিবীতে ওই মাই আছেন। মায়ের প্রতি ওর ভালোবাসা সব কিছুর উর্ধ্বে। অথচ দু'জনে কেবলি পরস্পরকে আঘাত দেয়। ছেলেকে বোঝেন না লুইসা, বুঝতে চান না। হয়তো বুঝবার ক্ষমতাও নেই; সংকীর্ণ, ভীরু, ভোঁতা মন, কিন্তু হৃদয়টির তুলনা হয় না। ভালোবাসা দেবার ও পাবার এমনি তার কাঙ্গালপনা যে চোখে জল আসে দেখলে। ছেলেকে ভালোবাসেন পূজোর সাথে মিশিয়ে—কারণ ওঁর চোখে সে মস্ত বড় বিদ্বান। কিন্তু ভালোবাসায় ছেলেকে মুক্তি দেননি

লুইসা, বেঁধেছেন। তার প্রতিভা সে-বাঁধনের তলায় ছট্‌ফটিয়ে মরে। লুইসা ভাবেন, সারা জীবন ছেলেকে নিয়ে এই ছোট শহরে থাকবেন এমনি নীড় বেঁধে। কোনদিন সে দূরে যাবে এ তাঁর কল্পনার অতীত। ছোট্ট আকাশের তলায় ছোট্ট একটু ঘর বেঁধে লুইসা পরিপূর্ণ সুখ পেয়েছেন। ক্রিসতফই বা না পাবে কেন? আর চাই-ই বা কি? এই শহরেরই কোন বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করিয়ে বৌ ঘরে আনবেন; রবিবার গির্জায় গিয়ে শুনবেন ছেলের হাতের পিয়ানো; আর চিরকাল এমনি ক'রে রাখবেন বুকে জড়িয়ে। ছেলের সম্বন্ধে এই হ'ল মায়ের চরম উচ্চাশা। ক্রিসতফ এখনও মায়ের কাছে বারো বছরের ছেলে; মা চান বারো বছরের ছেলে হ'য়ে চিরকাল সে থাকুক তাঁর কোল জুড়ে। কিন্তু ক্রিসতফের দম বন্ধ হ'য়ে আসে এই স্নেহের অত্যাচারে।

সত্য, মা বোঝেন না তাঁর ছেলেকে, চেনেন না তাঁর আকাশ-ছোঁওয়া আশাকে। পারিবারিক কর্তব্য পালনের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে তাঁর সুখের হিসাব যায় না। সবই সত্য। কিন্তু এই অপরিসর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও একটা স্বাভাবিক দর্শন আছে, তার খবর মা রাখেন না নিজেও। একান্ত ক'রে স্নেহ করতে চান লুইসা, শুধু স্নেহ করতে। অত্যন্ত তীব্র তাঁর ভালোবাসার প্রয়োজন, এজন্য হয়ত সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারেন। কি অসীম ভালোবাসা সে। নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকেন, আবার আপন দাবী আদায় করেন কড়া হাতে। লুইসার ভালোবাসা সব দেয় এবং সব নেয়। প্রাণ দেয়, প্রাণ চায়। কিন্তু ক্রিসতফের জীবন-দর্শন অন্য কথা বলে। তার দাবী সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অনেক দিন থেকেই ক্রিসতফ মাকে বলতে চাইছে কথাটা। কিন্তু মায়ের অবস্থা ভেবে আর সাহস পায়নি। বলতে গিয়ে থেমে গেছে। একটু আভাস দিয়েছে বার কয়েক। কিন্তু লুইসা তেমন গুরুত্ব দেননি।

হয়তো বা ইচ্ছে করেই ; ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার জন্য। মন গুমরে থাকে ক্রিসতফ, মুখ খুলতে সাহস হয় না। লুইসা তাঁর প্রতিভা-বুদ্ধি দিয়ে ছেলের মনের কথা বোঝেন। ভয়ে ভয়ে কেবলি সরে সরে থাকেন। একদিন শুনতে তো হবেই। যে ক'দিন চাপা দিয়ে রাখা যায়। এক একদিন সন্ধ্যের সময় মা ছেলে প্রদীপের আলোয় বসে থাকেন নিঃশব্দে। হঠাৎ আশংকায় কালো হ'য়ে ওঠেন লুইসা ; এই বুঝি ছেলে সেই ভয়ংকর কথাটা ব'লে বসে। পাগলের মত আবোল তাবোল অসংলগ্ন কথা বলতে আরম্ভ করেন। কিছুতেই মুখ খোলার অবকাশ দেওয়া হবে না ছেলেকে। লুইসা জানেন কি ক'রে ছেলের মুখ বন্ধ ক'রতে হয়। আরম্ভ করেন : হাত ফুলেছে, পা ফুলেছে, শিরায় পড়েছে টান···আরো হাজার রকম অসুখের কথা সহস্র গুণ বাড়িয়ে। ক্রিসতফ জানে, বোঝে সবই। ওর বোবা দৃষ্টিতে তিরস্কার ফুটে ওঠে। খানিকক্ষণ চুপচাপ ব'সে থেকে ক্লান্ত লাগছে বলে শুতে চলে যায়।

লুইসার কৌশল বেশীদিন খাটে না। সেদিন জোর ক'রে সাহস সঞ্চয় ক'রে বলে ফেলল ক্রিসতফ :

'কিছু কথা আছে, মা !'

হাসতে চেষ্টা করেন লুইসা। ভয়ের কালোয় জোর-করা হাসি বড় করুণ হ'য়ে ওঠে।

'কিরে ? কি কথা ?'

প্রথমটা গলা কেঁপে যায় ক্রিসতফের। লুইসা ঠাট্টাচ্ছলে নিতে চেষ্টা করেন। কথার মোড় ঘুরিয়ে সাধারণ হাল্কা কথায় নিয়ে আসেন। কিন্তু না, আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে ক্রিসতফ। লুইসা দেখলেন, আর ঠেকান যাবে না আজ। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকেন পাথরের মূতির মত। নাড়ীর স্পন্দন থেমে যায় ; চোখের দৃষ্টিতে বিপুল ভয় আর বেদনা থরো থরো

কাঁপে ; ক্রিসতফ থেমে যায়। নিঃশব্দ নিশ্চল হ'য়ে বসে থাকে মা ছেলে। একটু সামলে নিয়ে বলেন লুইসা, ঠোঁঠ দুটি কাঁপে বেদনায়···

'ওরে না রে না, বলিস না···বলিস না···'

বড় বড় দুই ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে ফিরে দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে ক্রিসতফ। চোখের জলে ওর বুক ভেসে যায়। কিছুক্ষণ পরে নিজের ঘরে চলে যায় ক্রিসতফ। সেদিন রাতে আর বাইরে এল না। রাতের ঘটনার কোন উল্লেখ করল না কেউ পরের দিন। ক্রিসতফও একেবারে চুপ ক'রে রইল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন লুইসা। ছেলে বুঝি মত বদলেছে শেষ পর্যন্ত।

কয়েক দিন যায়। আর পারে না ক্রিসতফ। বলতেই হবে। বুক ভেঙ্গে গেলেও বলতে হবে। আর সহ্য করা যায় না এই কঠিন যাতনা। নিজের কষ্টের তীব্রতায় মায়ের কষ্টের কথা ভুলে যায়। সুতরাং বলেই ফেলল সেদিন—মায়ের মুখের দিকে তাকাল না, পাছে মন দুর্বল হ'য়ে পড়ে। যাবার দিন অবধি ঠিক ক'রে ফেলল, যাতে দ্বিতীয় দিন আর কোন আলোচনার প্রয়োজন না হয়। কেঁদে ওঠেন লুইসা :

'ওরে থাম রে থাম !···আর বলিসনে···'

দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হ'য়ে বলে চলে ক্রিসতফ। শেষ হ'লে মায়ের হাত নিজের হাতে নিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে। সব দিক থেকে—ওর নিজের দিক থেকে এবং শিল্প চর্চার দিক থেকে কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ বাইরে যেতে হবে। কোন কথা শুনবেন না লুইসা। অঝোরে কেবলি কাঁদেন আর বলেন : 'না না,—কিছুতেই কিছু শুনব না আমি···'

শত চেষ্টা ক'রেও বোঝানো যায় না মাকে। ক্রিসতফ হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ে। রাতটা যাক। হয়তো একটু শান্ত হবেন। পরের দিন সকালে খাবার টেবিলে আবার কথাটা তোলে ক্রিসতফ। হাত থেকে

রুটি পড়ে যায় লুইসার। রীতিমত আর্তনাদ ক'রে ওঠেন : 'আমাকে এভাবে কষ্ট দিয়ে তোর লাভ কি বলতো?' ক্রিসতফের বুকের মধ্যে গিয়ে যেন ধাক্কা দেয় কথাটা। বলে :

'কষ্ট দেবার জন্য নয় মা। আমার সত্যি যেতে হবে।'

'না না না। কোথাও যেতে হবে না তোর। পাগলামী করিসনে। আমাকে কষ্ট দিচ্ছিস কেন?'

কেউই কারো কথা বোঝে না, যদিও চেষ্টা করে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে। কিন্তু যুক্তির ধার ধারে না কেউ। লুইসা শুধুই দুঃখ পান। ক্রিসতফ নিতান্ত সাধারণ ভাবেই যাবার ব্যবস্থা করে। বোঝেন লুইসা, এবার আর বাধা মানবে না ছেলে। পাগল হ'য়ে ওঠেন। দিন রাত বন্ধ ঘরে প'ড়ে থাকেন। সন্ধ্যেয় আলো জ্বলে না। ওঠেনও না বিছানা থেকে, খানও না। রাতের বেলা পাশের ঘর থেকে ক্রিসতফ শুনতে পায় মার কান্নার শব্দ। ওর বুক ভেঙ্গে যায়। ঘুম আসে না। সারারাত ছট্‌ফট্‌ ক'রে কাটে। অসম্ভব ভালোবাসে-মাকে ও। আর সেই মাকেই কিনা এমন ক'রে কষ্ট দিচ্ছে!···শুধু মা-ই নন, দিব্যচোখে দেখতে পায় ক্রিসতফ। কিন্তু প্রিয়জনকে এমন ক'রে কাঁদিয়ে এমন সাধনা করার শক্তি কেন দিলেন ওকে ভগবান? কেনই বা দিলেন তার বাসনা? হায় মা! অদৃষ্ট যদি আমাকে এই নরকে না ঠেলে আনত, নিজের কাছেই আমার লজ্জায় এমন ক'রে মাথা যদি না হেঁট হ'য়ে থাকত, তাহ'লে এ দুঃখ তোমায় দিতে হ'তো না, মা। শুধু একবার আমাকে বাঁচতে দাও; কঠিন পথ ভেঙ্গে দুঃখ সয়ে কর্মের মধ্যে শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে একবার জীবনের স্বাদ পেতে দাও; ফিরে আসব আবার তোমার বুকে; আবার তোমায় ভালবাসবো, আরো বেশী ক'রে বাসবো। শুধু ভালোবাসব···। ভালোবাসতেই যে চাই আমি।

লুইসা কথা বলেন বেশী। এই গভীর দুঃখকে নিজ্যের মধ্যে রাখতে পারলেন না, প্রতিবেশীদের কাছে বললেন, অন্য দুই ছেলেকে বললেন। নইলে আতুর হৃদয়ের স্তব্ধতা হয়ত সহ্য করতে পারত না ক্রিসতফ। এই সুযোগ ছেড়ে দিলে না ওর দুই ভাই। বিশেষ ক'রে রুডলফ। সেই ছোটবেলা থেকে ক্রিসতফের ওপরে ওর একটা বিজাতীয় হিংসা। ওর ভালো কখনও বরদাস্ত করতে পারেনি রুডলফ। আজও পারলে না। ক্রিসতফ বিদেশে যাবে বড় হবে এ-সম্ভাবনাও ওর অসহ্য। আজ সুযোগ যখন পেয়েছে অমনি ছেড়ে দেবে না ওটাকে। দেখিয়ে দেবে বড় কে।

নিজের যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। অথচ মার কষ্ট হয় জেনেও কোনোদিন মার কথা ভাবেনি। ক্রিসতফের উপর তার ভার ছেড়ে দিয়ে, দিব্যি গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়িয়েছে। ওর বাইরে যাবার কথা শুনেই তার মাতৃভক্তি একেবারে উথলে উঠল। এসে যাচ্ছে-তাই ক'রে ভাইকে গালাগাল দিল মাকে একলা ফেলে এভাবে যাওয়ার জন্য। এতো মানুষের কাজ নয়। মাষ্টারী চালে, আরো কত বক্তৃতা দিলে: 'কত করেছেন মা, আর তার এই প্রতিদান!'

এক লাথি মেরে বসল ক্রিসতফ। রুডলফ প্রতিশোধ নেয় মাকে ওর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে। উত্তেজনায় লুইসা ভুলে যান নিজেকে, ভুলে যান এতদিন একমাত্র এ-ছেলেই তার কর্তব্য করেছে। চিৎকার করেন, ক্রিসতফ কুপুত্র। নইলে বুড়ো মাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেই পারত না। কোন্ অধিকারে সে যেতে চায় ইত্যাদি। মায়ের চোখের জল সইতে পারে না ক্রিসতফ। কিন্তু মায়ের অত্যন্ত অন্যায় ও অভদ্র তিরস্কারে ওর মন বিষিয়ে ওঠে। মাকে দশটা কড়া কথা শুনিয়ে দেয় পাল্টা, নিজেও শোনে। এতদিন ক্রিসতফ মন স্থির করতে পারেনি। ইতস্তঃতই করছিল। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ও স্থির ক'রে ফেলল

যাবেই। জানে, এর ফল কি। শুভানুধ্যায়ী পাড়াপড়শীরা আছেন, তাঁরা পেছন থেকে মাকে উস্‌কাবেন। দুনিয়া দেখবে অসহায়া মায়ের ওপর কুলাঙ্গার পুত্রের অত্যাচার। হোক, রাগে দাঁত কড়মড় করে ও, হোক, তবু যাবেই। কিছুতেই ফিরবে না।

ক্রিসতফ আর লুইসার মধ্যে কথা প্রায় বন্ধ। দিনগুলো এক বিশ্রী গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে কাটে। ওদের আসন্ন বিচ্ছেদের দিনগুলো সুধায় ভরে উঠল না। মা-ছেলের নিবিড় ভালোবাসা মুখ ফিরিয়ে রইল। ব্যর্থ হ'ল কত দিন আর রাত। অমনি ক'রে ব্যর্থ হয় কত ভালোবাসা নিষ্ফল অভিমানে, কে দেবে তার হিসাব!

খাবার সময় শুধু দেখা হয় মা ও ছেলের। সামনাসামনি ব'সেও কেউ তাকায় না কারো দিকে, নিঃশব্দে খেয়ে যায়। খাওয়া শুধু নিয়ম রক্ষা, বসতে হবে তাই। দু'এক সময় ক্রিসতফ চেষ্টা করে এক-আধটা কথা বলতে। জবাব দেয় না লুইসা। আবার লুইসা যখন কথা বলেন, জবাব আসে না ওপক্ষ থেকে। এক মর্মান্তিক পরিস্থিতি। দু'জনেই পিষে যেতে লাগল। কিন্তু কোথায় এর সমাধান? যতই দিন যায়, বাধা আরো কঠিন হ'য়ে ওঠে। লুইসা বোঝেন, মর্ম দিয়ে বোঝেন, অন্যায় করছেন ছেলের ওপর। কিন্তু কিই বা আর ক'রবে অসহায়া হতভাগিনী মা! পলাতক ছেলেকে বুকে আঁকড়ে রাখবার আকুলতায় সম্বিৎ হারিয়েছিলেন। চলে যাবে ক্রিসতফ, জানে না সে মায়ের বুকের পাঁজরগুলো কেমন ক'রে ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাচ্ছে। তাই…তাই নিষ্ঠুর হয়েছে। ক্রিসতফ লুকিয়ে দেখে মায়ের ফোলা মুখ, বসা চোখ। অব্যক্ত বেদনার এক তামসী ছায়া। ওরও পাঁজর গুড়িয়ে যায়। যাক্ যাক। তবু সংকল্প টুটবে না। জানে ও এতো শুধু দেশ ছেড়ে যাওয়া নয়, মায়ের স্নেহ-ভরা বুক থেকেও ওর চির অবসান; তবু

ফিরবে না, তাকাবে না মায়ের দিকে, দুর্বল হ'য়ে যাবে, হয়ত ভেঙ্গে যাবে সংকল্প।

মাঝখানে আর মাত্র একটি দিন আছে যাবার। খেয়ে দেয়ে সবে ঘরে গেছে ক্রিসতফ। অন্যদিনের মত নীরবেই সাঙ্গ হয়েছে খাওয়ার পালা। কাজে মন দিতে পারছে না ও। ডেস্কের সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে। রাত গভীর হয়েছে, প্রায় একটা, হঠাৎ পাশের ঘরে চেয়ারটা উল্টে পড়ল। পরক্ষণেই ওর নিজের ঘরের দরজাটা খুলে গেল। খালি পায়ে, রাতের জামা পরেই উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসে দুই হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠলেন লুইসা! উন্মাদিনী চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন ক'রে দিলেন ছেলেকে। বুক-ভাঙ্গা কান্নায় তার সর্বশরীর তোলপাড়:

'ওরে যাসনে রে তুই যাসনে···মিনতি করছি···মায়ের ভিক্ষা রাখ··· তুই গেলে আমি বাঁচবো নারে···বাঁচবো না···'

ক্রিসতফ ভয় পেয়ে যায়। অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে ওঠে। মাকে চুমু খেয়ে সান্ত্বনা দেয়: 'ছিঃ মা, শান্ত হও। ওরকম করে না।'

মায়ের আকুল কান্না বাধা মানে না: 'নারে, আমি পারছি না···আমার যে তুই ছাড়া আর কেউ নেই রে···তুই ছেড়ে গেলে কে দেখবে আমায়··· আমার কি হবে···কিছুতেই বাঁচব না···। না না···আমি মরলে যাস তুই···। কটা দিন আর অপেক্ষা কর্‌।···তোর কোলে মাথা রেখে মরতে না পারলে আমার শান্তি নাই···একা মরতে চাইনে আমি···'

ক্রিসতফের বুক ভেঙ্গে যায়। কি বলে সান্ত্বনা দেবে মাকে খুঁজে পায় না! জড়িয়ে ধ'রে পাশে বসিয়ে আদর ক'রে ভোলাতে চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে কান্নার তীব্রতা কমে আসে। একটু সুস্থ হ'ল লুইসা। ক্রিসতফ বলে: 'শুতে চলো মা, ঠাণ্ডা লাগবে যে!'

'যাসনে, যাসনে খোকা তুই…' মা আবার বলেন।

স্তিমিত স্বরে জবাব দেয় ক্রিসতফ : 'না, যাবো না।'

লুইসার সারা দেহ কাঁপে বেতস লতিকার মত। ছেলের হাত ধরে আকুল হ'য়ে শুধান : 'সত্যি বলছিস! সত্যি যাবিনে!'

বেদনাহত ক্রিসতফ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বলে : 'কাল…কাল বলব মা ঠিক কথা। আজ আমায় একটু একা থাকতে দাও লক্ষ্মী।'

বাধ্য মেয়ের মত নিজের ঘরে চলে যান লুইসা। ভোরবেলা উঠে নিজের কাছেই লজ্জায় মরে যান। কোত্থেকে এল এ পাগলামী কাল মাঝ রাতে! কি বলবে ক্রিসতফ! ছেলের প্রতীক্ষায় ঘরের কোণে বসে থাকেন লুইসা। একটা সেলাই নিয়েছেন তুলে একটুখানি অবলম্বনের জন্য। কিন্তু সেলাই অমনি প'ড়ে থাকে। ধরবার শক্তি নেই হাতে।

ক্রিসতফ আসে। হাত থেকে বোনা পড়ে যায় লুইসার। চোখে চোখে না তাকিয়ে চাপা স্বরে সম্ভাষণের পালা শেষ হয়। ক্রিসতফের মুখ থমথমে। মায়ের দিকে পেছন ফিরে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও নিঃশব্দে। অন্তরে দুর্বিসহ সংগ্রাম। তার পরিণাম ও জানে। চরম মুহূর্তটিকে শুধু একটু ঠেলে সরিয়ে রাখা। লুইসার বুক দুরু দুরু করে… জানেন শেষের গানই শোনাতে এসেছে ছেলে। আগে কথা ক'য়ে জানা কথাটাই নাই বা শুনলেন তাড়াতাড়ি। হোক না একটু দেরী। শক্তি সংগ্রহ ক'রে বোনাটা হাতে তুলে নেন আবার। কিন্তু অন্ধকারে সব মিলিয়ে যায় চোখের সামনে থেকে। ঘর প'ড়ে যায় যেখানে সেখানে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। নিরন্ধ্র স্তব্ধতায় স্তম্ভিত তরঙ্গ ঘরের মধ্যে। কতক্ষণ যে এমনি কাটে তার ঠিক নেই। ক্রিসতফ ধীরে ধীরে মায়ের কাছে আসে। মুখ তুলে তাকাবার সাহস নেই লুইসার। নিশ্চল, স্থির, যেন জমাট বেঁধে গেছে লুইসা। হৃদ্‌পিণ্ডটা তোলপাড় হয় ভেতরে।

হঠাৎ ক্রিসতফ নতজানু হ'য়ে মায়ের সামনে বসে প'ড়ে তাঁর কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ছেলের মুখের না-বলা কথা ভাষা পায় তার বুকের উন্মথনে! মায়ের আকূতি ব্যর্থ হয়নি। ক্রিসতফ যাবে না! সেই কথাই বলতে এসে…আনন্দ সুতীব্র বেদনা হ'য়ে মায়ের অন্তরের রন্ধ্র রন্ধ্র ভরে তোলে। ত্যাগ!…না বিসর্জন!…মায়ের স্নেহ ভিক্ষা চেয়েছে পুত্রের আত্মবিসর্জন! যাবার সংকল্প ক'রে মাকে বলি দিতে প্রস্তুত হয়েছিল ক্রিসতফ। তার সেই বেদনা, সেই সংগ্রাম ঠিক তেমনি ক'রে মায়ের বুকে এসে বাজল আজের এই উপলব্ধির ক্ষণে। ঝুঁকে প'ড়ে চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন ক'রে দেন ছেলের মাথা, চুল, কপাল। মায়ের বেদনা, মায়ের অশ্রু, পুত্রের বেদনা, পুত্রের অশ্রুর সাথে নীরবে নিঃশব্দে মিলে মিশে এক হ'য়ে যায়। অনেকক্ষণ পরে মাথা তোলে ক্রিসতফ। দুই হাতের মধ্যে তার মুখখানি নিয়ে গভীর দৃষ্টিতে লুইসা তাকান ছেলের দিকে! তার চোখের দিকে নয়, তার মর্মস্থলে। ইচ্ছে হয় বলেন: 'যা বাবা, তুই যা।' কিন্তু পারেন না।

ক্রিসতফও বলতে চায়: 'না মা, আমি যাব না। আমার একটুও কষ্ট নেই।'

কিন্তু পারল না। বাধা সরল না। ভাঙতে পারলে না—না মা, না ছেলে। স্নেহে বেদনায় ভরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লুইসা বলেন:

'সবাই যদি আমরা একই সাথে জন্মে একই সাথে মরতে পারতাম।'

মায়ের হৃদয়-নিংড়ান সহজ কথা ক্রিসতফ-এর বুক অসীম কোমলতায় ভরে দেয়। একটু হাসতে চেষ্টা ক'রে বলে: 'আমরা একসাথেই মরব মা।'

'তাহ'লে সত্যি যাচ্ছিস না?' নিশ্চিন্ত হ'তে চান লুইসা।

ক্রিসতফ উঠে পড়ে। বলে:

'আমি বলেইছি তো। আর কিছু বলার নেই। আর তুলো না

এসব কথা।' আর যাবার কথা তুলল না ক্রিসতফ। বাইরে বলে না বটে, কিন্তু মন থেকে যায় না। রইল বটে, কিন্তু ওর মুখের হাসি গেল, মেজাজের প্রসন্নতা গেল। ওকে ফেরানোর মূল্য হিসেবে অনেক কড়ি জোগাতে হয় লুইসাকে। সাংসারিক বুদ্ধি চিরকালই কম তাঁর। এখন আরও কমেছে। ক্রিসতফের ভাবান্তরের কারণ খুব ভাল ক'রে জানেন। তবু অনবরত পেছনে লেগে থাকেন : 'কি হয়েছে তোর বল। বলতেই হবে।' জেদ্ করেন, তর্ক করেন, উপদেশ দেন। ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠে ও স্নেহের এই অসঙ্গত অত্যাচারে। যে ব্যথাটা ভুলতে চায়, সেটা কাঁচাই থাকে মায়ের সস্নেহ খোঁচাখুঁচিতে! কতদিন চেষ্টা করেছে মন খুলে দেবে মায়ের কাছে; কিন্তু বল্‌তে বসলেই কোথা থেকে চীনের প্রাচীরটা এসে দাঁড়ায় মাঝখানে। ক্রিসতফের বেদনা তার অন্তরের গোপনে রয়ে গেছে চাপা। মা বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু প্রতীকারের পথ তাঁর জানা নেই। বরঞ্চ যখনই একটু চেষ্টা করতে গেছেন—কাঁচা হাতের কারবার, অঘটন ঘটিয়ে বসেছেন। ক্রিসতফ আরো ডুব মেরেছে নিজের ভেতরে। যে-দুঃখ মায়ের স্নেহে গলিয়ে নেবার জন্য ওর প্রাণ আকুলি বিকুলি করছে, তাকে নিজের ভেতরে বন্দী রেখে জলে মরে মায়ের ছেলে।

প্রতি ছোটখাট কথা, ঠাট্টা তামাশায় বিরক্ত হ'য়ে ওঠে ও। একটু একটু ক'রে মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে। স্নেহশীলা মা—ছেলে তার পূজার ঠাকুর। চব্বিশ ঘণ্টার সাংসারিক জীবনের ঘনিষ্ঠতায় পাড়াপড়শীর কথা বলেন, নিন্দা কুৎসার সমাচার দেন, ছেলের শৈশবের, বাল্যের বহুবার বলা-কাহিনী ফিরে ফিরেই আসে। ভালো লাগে না ওর।—মানুষের স্বভাবই ওই, বিশেষ ক'রে যিনি পালয়িত্রী ধাত্রী—আঁতুড়ঘরের ভেজা কাঁথার বন্ধন থেকে তারও মুক্তি নেই। আর সংসারের মাটিতে প্রথম পা-ফেলা যে ক্ষুদে পথিককে একদিন অঙ্কে ধারণ করেছিলেন তারও নেই।

ধাত্রীর অঞ্চল বন্ধনে সে চিরনাবালক। বর্ধমান মানবকের অভিযাত্রী আত্মার সাধনা সংগ্রামের নিষ্ঠুর ইতিহাস খোকামনির খেলার স্মৃতি হিসেবেই শুধু তার উত্তর কালের জীবনে রোমন্থিত হয়।

পীড়িত হয় ক্রিসতফ। কিন্তু মায়ের কাছ থেকে এই ছোট ছেলের মত আদর কেমন যেন মনটাকে গলিয়ে দিয়ে যায়। মাঝে মাঝে মায়ের আদুরে ছেলে হ'য়ে ওঠে। কিন্তু বিশ্ব সংসার থেকে একেবারে সরে এসে সারা দিন ক্ষণ একসঙ্গে থাকা—দু'জনের কারো পক্ষেই কল্যাণের হ'ল না! দুঃখের দিনে কাছে থেকে যদি একে অপরকে সান্ত্বনা দিতে না পারে, তখন নালিশ এসে জমা হয়। নিজের দুঃখের সমস্ত দায় তখন পড়ে অপর পক্ষের পর।

প্রত্যহের ঘনিষ্ঠতার গ্লানি জমে উঠল ক্রিসতফ লুইসার জীবনেও। স্নেহ বিড়ম্বিত হ'ল খণ্ডিত ইচ্ছার ফরিয়াদে। কলঙ্কিত স্নেহের এ-বন্ধন থেকে মুক্তি এল—এল অভাবনীয় পথে।

অক্টোবর মাসের এক রবিবার সেদিন। চমৎকার বিকেল। সারাটা দিন ক্রিসতফ ঘরের মধ্যে বসে বসে গুমরে কাটিয়েছে। আর পারছিল না। মরীয়া হ'য়ে বেরিয়ে পড়ল, হেঁটে হেঁটেই শরীরটা খুব ক্লান্ত হ'লে যদি ভাবনার শেষ হয়।

গত পরশু থেকে মার সাথে খুব মন কষাকষি চলেছে। মাকে কিছু না বলেই রওনা হচ্ছিল। কিন্তু সিঁড়ির গোড়ায় এসে মনে হ'ল যে সারাটা সন্ধ্যা বেচারীকে একা থাকতে হবে। ভারী দুঃখ পাবেন। যেন কিছু ফেলে এসেছে, অছিলা ক'রে আবার ফিরে এল। মায়ের ঘরের দরজা খোলা। উঁকি মেরে দেখে···মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েকটি মুহূর্ত···। আমৃত্যু হৃদয়ের একটি বিশেষ স্থান পরিপূর্ণ ক'রে রাখে ওই দু'টি মুহূর্ত···।

সান্ধ্য উপাসনা থেকে লুইসা সবে ফিরেছেন। খোলা জানলার সামনে প্রিয় জায়গাটিতে আছেন বসে ; দৃষ্টি হোঁচট খায় সম্মুখের বাড়ীর একটা শুভ্র ফাটল-ধরা প্রাচীরের গায়ে। ডান দিকে পাশের বাড়ীর উঠোনটা পেরিয়ে রুমালের আকারের ছোট্ট দু'টি ঘাসে-ঢাকা লন্ দেখা যায়। জানালার ওপরে রাখা দুটি মাটির গামলায় কনভলভিউলাস্ লতা দড়ি বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠেছে। কচি কচি পাতাগুলির ওপর পড়ন্ত রোদের ফালি ঝিলমিল করছে। কোলের উপর বাইবেল খোলা, ঝুঁকে বসে আছেন লুইসা। কিন্তু বেশ বোঝা যায় পড়ছেন না। দীর্ঘকালের কাজ করা শিরা-ফোলা হাত দু'টি পাতা রয়েছে বইয়ের ওপর। নিবিষ্টচিত্তে তাকিয়ে আছেন ছোট লতাটি আর তার ফাঁকে উঁকি-মারা আকাশের ফালিটির দিকে। দৃষ্টি দিয়ে যেন পান করছেন লুইসা। চোখে উপচে উঠেছে স্নেহ। সোনা-সবুজের আলপনা আঁকা পাতার ওপর ঝিমিয়ে-পড়া রোদের ফালির আভায় লুইসার শ্রান্ত মুখখানি আলো হ'য়ে উঠেছে। ঈশদ্-ভিন্ন ওষ্ঠ দুটিতে একটুখানি হাসি লেগে আছে। বিশ্রামের এই সময়টুকু পরিপূর্ণভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করছেন লুইসা! এই সময়টুকু লুইসার জীবনে সবচেয়ে রমণীয়। চিন্তা ভাবনাহীন, সুস্নিগ্ধ প্রশস্তি-ভরা তন্দ্রা-ছাওয়া মন্থর বেলা, যখন সুপ্তির আবেশ-বিভোল মৌনের বুকে জেগে থাকে শুধু আধ-ঘুমন্ত হৃদয়। দুঃখীর দুঃখ-ভোলানিয়া নেশা···লুইসা বুঁদ হ'য়ে থাকেন এই নেশায়।

'মা, একটু বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে রাত হ'তে পারে।' ক্রিসতফ বলে। লুইসা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন, চম্‌কে উঠলেন। ফিরে শান্তভাবে ছেলের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন : 'যাও বাবা, বেড়িয়ে এসোগে। দিনটা বড় সুন্দর হয়েছে।'

স্নিগ্ধ হাসিতে মায়ের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, মায়ের দিকে তাকিয়ে

ক্রিসতফ হাসে। অনেকক্ষণ চোখে চোখে চেয়ে থাকে দু'জনে। তারপর গভীর স্নেহে পরম অন্তরঙ্গতায় শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নেয় ক্রিসতফ। ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে। আবার ডুবে যান লুইসা···পুত্রের মুখের হাসির আলোয় কনভলভিউলাস পাতার ওপর পড়া রোদের ফালিটির মতই আলো হ'য়ে উঠেছে ওর স্বপ্নের জগৎ।

চলে গেল ক্রিসতফ···হারিয়ে গেল। একেবারে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল।

অক্টোবরের সন্ধ্যা। আকাশে বিবর্ণ জোলো সূর্য। ঝিমুন গ্রাম্য পরিবেশ সুষুপ্তিতে লীন হচ্ছে। সুদূর-বিসারী শস্য ক্ষেতের গভীর প্রশান্ত মৌনের বুকে গ্রামের ছোট ঘণ্টা বেজে চলে টুং টাং। চষা ক্ষেতের মাঝখান থেকে ধোঁয়া ওঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে। বহুদূরে দিগবালে মিহি কুয়াশার জাল দোলে! রাত্রির প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে হিমানীর শ্বেত কণার দল···একটা কুকুর মাথা নীচু ক'রে গোল হ'য়ে দৌড়ুচ্ছে ওই দূরের মাঠে। ধোঁয়াটে আকাশের বুকে অসংখ্য কাকের দল পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে।

আনমনে হেঁটে চলেছে ক্রিসতফ। কিন্তু ওর পা আপনা আপনিই একটা বিশেষ দিকে চলেছে। গ্রামান্তরে রয়েছে এক সুন্দরী কন্যা। আজ ক'দিন হ'ল বেড়াতে বেরিয়ে ওর লক্ষ্যটা থাকে সেদিকে। মেয়েটিকে ওর ভালো লেগেছে। শুধুই ভালো লাগা। শুধু ভালোলাগা হ'লেও, ওর মনের মধ্যে তার জোর বড় কম নয়। কাউকে না কাউকে ভালো না বেসে থাকতে পারে না ক্রিসতফ। ওর হৃদয় কখনও শূন্য থাকে না। হয় থাকবে ওর প্রত্যক্ষ প্রিয়া, নয় বুকের মধ্যে থাকবে কোন প্রিয়ার প্রতিমা। অপর পক্ষ ওর মন জানল কি জানল না তাতে ওর আসে যায় না। ওর

ভালবাসতে পারলেই হ'ল এবং পারাটা ওর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। প্রেমের দীপ অনির্বান থাকবে ওর হৃদয়ে, অলো চাই শুধু আলো··· আঁধার নয়।

এক কৃষক-বালা। হঠাৎ দেখা হ'য়ে গিয়েছিল পথে এক নদীর ধারে। ওকে জল দিয়েছিল সে···পিপাসার জল নয়, ওর গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল। ছোট্ট নদীটির এপারে ওপারে ব'সে কাপড় কাচছিল গাঁয়ের মেয়ের দল। সে ছিল দুটো উইলো গাছের ফাঁকে ভাঙ্গা পাড়টার আড়ালে। হাতের সাথে তার মুখ চলছিল সমান তালে। খানিক দূরে হাতের ওপর থুতনি রেখে উপুর হ'য়ে শুয়ে শুয়ে ক্রিসতফ দেখছিল ওদের। একটু অপ্রস্তুত লাগলেও পুরোদমে তাদের কলরব চলছিল হাতের কাজের সঙ্গে। ক্রিসতফ-এর কান নেই ওদের কথার দিকে। দূরের মাঠে গো-পালের হাম্বা রব···এদিকে কাপড় কাচার শব্দের সাথে মিশে ওদের আনন্দ-মুখরিত কলোচ্ছ্বাস ওর কানের কাছে গুঞ্জন তোলে। রূপসী রজকিনীর মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে তাকিয়ে ও গভীর স্বপ্নে ডুবে যায়। ক্রিসতফ কার দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে দেরী হ'ল না কন্যাদের। চোখা চোখা বিদ্রূপের বান আসতে লাগল ছুটে। কিন্তু নড়লও না ছেলে। কাপড় মেলার ছল ক'রে মেয়েটি কাছে এসে ভালো ক'রে ক্রিসতফকে দেখে নেয়। আসা-যাওয়ার সময় ভিজে কাপড় দিয়ে ওর গায়ে বাড়ি মেরে যায় আর হাসে। শীর্ণ কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ-গঠন; থুতনি যেন সূক্ষ্ম হাতে কুঁদে তোলা, ছোট নাক, ধনুকের মত বাঁকান দুই ভ্রূ, একটু বসে-যাওয়া নীল চোখ দুটি দৃপ্ত, দীপ্ত, ইস্পাতের মত কঠিন। পুরু ওষ্ঠ ঘেরা গ্রীক কুমারীর মত সামান্য ফোলান ফুলকুঁড়ির মত কমনীয় মুখ। মাথার ওপর ঝুটি ক'রে বাঁধা একরাশ চুল; দেহের বর্ণ তো নয়, বর্ণালীর ছটা। চলে মাথাটি সোজা ক'রে, রোদে-পোড়া হাত দুটি দুলিয়ে দুলিয়ে পুরুষালী

ঢংএ। কথায় কথায় খিলখিলিয়ে হাসে, কথা না কইলেও হাসে। কেবলি কাপড় আনে আর মেলে, আর ক্রিসতফের দিকে তাকিয়ে মন-মজান হাসি হাসে; অপেক্ষা করে কখন কথা বলবে ও। ক্রিসতফ ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে ওকে, কিন্তু কথা কইতে চায় না মন। অবশেষে বোবা চেহারাটার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে হাসতে চলে যায় মেয়ে। শুয়ে থাকে ক্রিসতফ একভাবে। সন্ধ্যা হয়। বোঝা পিঠে তুলে বাড়ীর দিকে ফেরে রজকিনী। বোঝার ভারে পিঠ গেছে ঝুঁকে; অনাবৃত হাত দুটি বুকের ওপর আড় ক'রে রাখা। ওদের হাসি কলোচ্ছ্বাসে বনের পথ মুখর হ'য়ে ওঠে।

কদিন পরে আবার দেখা শহরের বাজারে—গাজর, টমেটো, কুমড়ো, কপির হাটে। মেয়েরা এসেছে বেসাতি নিয়ে বেচতে। আপন আপন পসরা আগলে দাঁড়িয়ে আছে লাইন ক'রে। পুলিশ কর্মচারী আসে, ওদের কাছ থেকে মাশুল নিয়ে কি একখানা কাগজ দিয়ে যায়। কফিওয়ালা ছোট ছোট পেয়ালা ভরে কফি নিয়ে পসারিণীদের কাছে ফিরী ক'রে বেড়ায়। একজন বুড়ী নান্, মোটাসোটা স্ফূর্তিবাজ, দু'হাতে প্রকাণ্ড দুই ঝুরি দুলিয়ে ধর্ম কথা শুনিয়ে শুনিয়ে তরকারী মাগেন। কতকালের পুরানো দাঁড়িপাল্লাগুলির চেইনের ঝনঝন; গাড়ীতে যোতা কুকুরের সগর্ব ঘেউ ঘেউ—এইসব হট্টগোলের পরিবেশে আবার দেখল লরশেনকে—সেদিনের দেখা সেই রজকবালা। মাথার ওপর ওল্টো ক'রে রাখা প্রকাণ্ড এক বাঁধাকপির পাতা···সুন্দর চুলগুলির ওপর লেসের টুপীর মত দেখাচ্ছে। একটা ঝুরির ওপর বসে—সামনে রাখা পেঁয়াজ, গাজর, শিম, আর লাল টুক্‌টুকে আপেলের স্তূপ। একটার পর একটা আপেল চিবিয়ে চলেছে সে—বিক্রী করার কোন চেষ্টা নেই। মাঝে মাঝে জামাটা দিয়ে থুতনি পোঁছে, বাহু দিয়ে চুলগুলোকে সরিয়ে দেয়; মাথা কাৎ ক'রে কাঁধে

গাল ঘষে, বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নাকের ডগাটা পুঁছে নেয়। কখনও বা হাঁটুর ওপরে কনুই রেখে মটর নিয়ে এক হাত থেকে আর এক হাতে লোফালুফি খেলে, আর এদিক ওদিক তাকায় এমনি নিরুৎসুক ভাবে, যেন কিছুই দেখছে না। অথচ দেখছে সবকিছু এবং খুব বেশী ক'রে দেখছে; চলতি পথের যতগুলো চোখ অন্ততঃ একবারও তাকিয়ে গেল ওর দিকে, তার নির্ভুল হিসেব রাখে। ক্রিসতফকে ও দেখল। খদ্দেরের সাথে কথা বলতে বলতে বিচিত্র ভঙ্গীতে ভ্রূ তুলে চকিতে ওকে দেখে নেয়; গম্ভীর ভারিক্কি চাল, কোথাও এতটুকু হালকামো নেই বাইরে। মনে মনে হাসে। ক্রিসতফ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে; ওর চোখ যেন দৃষ্টির গণ্ডূষ ভ'রে পান করে ওই মেয়ের রূপ। তারপর ধীরে ধীরে চলে যায় একটি কথা না বলে। কথা বলতে মন চায়না ওর।

ঘুরে ফিরেই আসে ক্রিসতফ ওই গ্রামে। বাজারের আশে পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। লরশেন কাজ করে তার বাড়ীতে। চলতে চলতে কখন সেও থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে তাকিয়ে থাকে নিজেই জানে না। লরশেনকে দেখতেই যে এদিকে আসে কিছুতেই স্বীকার করে না তা; মিথ্যে নয়। ওর পা দু'টো কখন যে এদিক মুখো হয় ও তা সত্যি জানে না। সঙ্গীত রচনার সময় কতদিন এমনি হয়েছে। তখন যেন ও ঘুমন্ত মানুষের মত চলে। ওর সচেতন মন সঙ্গীত রচনা করে। একই সাথে ওর অবচেতন মন উদার মাটির উন্মুক্তি খোঁজে। লরশেনের সামনে দাঁড়িয়ে নব নব সঙ্গীতের গুঞ্জনে ওর দিক্ দিগন্তর ভরে ওঠে; ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিরুদ্দেশে ডানা মেলে ওর স্বপ্নাবিষ্ট মন। প্রেমে পড়েছে ক্রিসতফ? না, প্রেমে নয়। শুধু ভালো লাগা। দেখতে ভালো লাগে ও-মেয়েকে। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু বারে বারে কিসের আকর্ষণে যে এই ফিরে ফিরে আসা তার হিসেব রাখেনি ক্রিসতফ।

বিসদৃশ ব্যবহারটা চোখে পড়ার মত। পড়েছেও। খামারের বাসিন্দারা বিদ্রূপ করে। তারা খোঁজ পেয়েছে ক্রিসতফকে। কিন্তু কিছু বলেনা। বুঝেছে ওকে দিয়ে লোকসানের ভয় নেই। ওর বোকাটে চেহারাটা তার সাক্ষ্য দেয়।

গ্রামে সেদিন কিসের উৎসব। ছেলের দল ছুঁচো বাজী পোড়াতে মহাব্যস্ত। সরাইখানায় পানের হুল্লোড়; খামারে বাঁধা গরুটা চিৎকার করছে। লম্বা লেজওয়ালা ঢাউস ঘুড়িগুলো গোত্তা খেয়ে একবার আকাশে উঠছে আবার প্রায় মাটিতে এসে ঠেকছে। মুরগীর দল খড়ের গাদায় আর গোবরের স্তূপ ঘেঁটেঘেঁটে কি যেন খাচ্ছে। বাতাসে উড়ছে তাদের পালক। রোদে শুয়ে শুয়ে রোগা গোলাপী রংএর শুয়রটা ঘুমুচ্ছে অসাড় হ'য়ে।

সরাইখানার দিকে এগিয়ে চলল ক্রিসতফ। জানালাগুলো লাল হলদে ফুল দিয়ে সাজান। সামনে সুতোয় সুতোয় ঝুলছে পেঁয়াজ। বসবার হলটি সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরা। বেশ ভালো ক'রে জানে ওর নূতন মানসী কন্যা আসবেনই। নাচ চলছে তখন ঘরের মধ্যে। এক কোণে গিয়ে বসল যাতে কেউ দেখতে না পায়। কিন্তু লরশেনের চোখ এড়াল না। নাচতে নাচতে সঙ্গীর কাঁধের ওপর দিয়ে চোখ বাড়িয়ে দেখে নেয়, ক্রিসতফ তখনও তাকিয়ে আছে কিনা। ওকে একটু ক্ষেপিয়ে তুলতে ভারী ইচ্ছে করছে লরশেনের। গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে আরম্ভ করল ঢলাঢলি। চলল অনর্গল কথা আর হাসাহাসি দেখিয়ে দেখিয়ে। টেবিলে কনুই আর দুই হাত গালে চেপে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ক্রিসতফ কুহকিনীর ছলনা দেখে। ওর মুক্ত মন ওই ছলনায় ধরা দেয় না, অথচ যথেষ্ট জোরও পায় না। মন যেন ধরা দিতে চায়। রাগে ও গোঁ গোঁ করে আপন মনে ব'সে।

লরশেনের বাবা এক কোণে ভাবলেশহীন মুখে লম্বা পাইপ টানছিলেন বসে বসে আর লক্ষ্য করছিলেন ক্রিসতফকে। ক্রিসতফের হাবভাব দেখে আস্তে আস্তে হাসছিলেন আর আশেপাশের অন্য কৃষকদের সাথে জোর ক'রে কথা বলছিলেন যাতে কেউ বুঝতে না পারে। কিছুক্ষণ পরে একবার আলুলায়িত কেশে ক্রিসতফের টেবিলে এসে বসলেন। চোখে মুখে ওর হিংসা। ভারী বিরক্ত হ'ল ক্রিসতফ। একটা চাপা গর্জন ক'রে ফিরে তাকাতেই বৃদ্ধের ধূর্ত দৃষ্টির সাথে ওর চোখাচোখি হ'য়ে গেল। নিতান্ত পরিচিতের মত সম্ভাষণ জানিয়ে বৃদ্ধ বসল। ক্রিসতফ চেনে লোকটাকে। নিতান্ত সাধারণ আরো দশজনের মত মানুষ। কিন্তু ওর মেয়ের প্রতি দুর্বলতায় আজ সাধারণ মানুষটা অসাধারণ হ'য়ে ওঠে। ওর বড় ভালো লাগে বৃদ্ধকে। ধূর্ত শৃগালের বুঝতে বাকী থাকে না। কিছুক্ষণ আবহাওয়া, বৃষ্টি ইত্যাদির কথা ব'লে, যে-সব মেয়েরা এসেছে তাদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য করে। ক্রিসতফ নাচতে যায়নি তা ভালোই করেছে। এই বিশ্রী মেয়েগুলোর সাথে নাচার চাইতে মগ হাতে চুপচাপ বসে থাকা ভাল। কোন ভূমিকা না ক'রে পানের নিমন্ত্রণ জানায় বৃদ্ধ ওকে। মগে চুমুক দিতে দিতে অনর্গল কথা ব'লে যায় বৃদ্ধ। নিজের চাষ-বাস, দুর্মূল্য, দিন চালানো কি রকম কঠিন হয়েছে,—হাজার রকম ব্যক্তিগত কথা। ক্রিসতফ কিছুই প্রায় শোনে না। মাঝে মাঝে মোটা গলায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে একটা হাঁ বা না ব'লে জবাব দিয়ে তন্ময়-হ'য়ে তাকিয়ে থাকে লরশেনের দিকে। বুঝতে পারে না বৃদ্ধের এই আকস্মিক ঘনিষ্ঠতার কারণ কি।

দুঃখ, দুর্দশার কথা বলতে বলতে হঠাৎ স্বর বদলায় বৃদ্ধ। কি চমৎকার তার ফসল, দুধ মাখন, ডিম। দশখানা গাঁয়ে অমন জিনিস পাওয়া যাবে না। হিসেব দিতে দিতে যেন শুধু কথার পিঠেই বলে উঠল, ডিউকের প্রাসাদের জিনিসপত্র জোগান দেবার কোন সুবিধা করা

যায় কিনা। ক্রিসতফ চমকে উঠল—কি ক'রে জানল লোকটা ?··· তাহ'লে তো ওকে ও জানে দেখছি !

'জানিই তো !' জবাব দেয় বৃদ্ধ। 'জানতে আর কি লাগে !'···মনে মনে বলল : 'শুধু একটুখানি খবর রাখতে হয়।'

ক্রিসতফ বুঝতে পারে লোকটার গায়ে পড়ে খাতির করার রহস্য। একটা ক্রুর উল্লাসের সাথে জবাব দেয় ক্রিসতফ, আর একটু খবর রাখলেই জানতে পারতেন বৃদ্ধ, ডিউকের সাথে সম্প্রতি ওর বিষম ঝগড়া হ'য়ে গেছে। সামান্য মানুষ ও, বড়লোকের ভৃত্য মহলের কাছও ঘেঁষেনি। তবে যেটুকু বা ছিল-আলাপ, সেই ঝগড়ার পড়ে তাও নেই। নইলে—অজান্তে ঠোঁট বেঁকে যায় বৃদ্ধের, কিন্তু দমল না। কিছুক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করে কতগুলি বাড়ীতে ওকে সুপারিশ ক'রে দিতে পারে কিনা। যেমন—যে-সব বাড়ীতে ক্রিসতফ কাজ করেছে, বা যাদের সাথে নানা ভাবে ওর পরিচয় আছে তাদের নাম করে। ক্রিসতফ সম্বন্ধে সব খবর সংগ্রহ ক'রে এনেছে বৃদ্ধ। অন্য সময় হ'লে পেছন পেছন এই ফেউ বৃত্তি ও কখনই সইত না। কিন্তু এখন শুধু হাসল। বড় বেশী চালাক বুড়ো ! জানেনা ক্রিসতফের সুপারিশে ওর অতি-চালাকের গলায় দড়ি হবে। নূতন গ্রাহক তো জুটবেই না, পুরানোরা হয়ত খসবে। দেখা যাক, আর কত শয়তানী আছে বুড়োর পেটে পেটে। হাঁ না কোন জবাবই দেয় না। বুড়ো নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত ধ'রে ব'সল, আর কোথাও না হোক ক্রিসতফের নিজের বাড়ীতে ও দুধ মাখন ডিমের যোগান দেবে। ক্রিসতফ গাইয়ে মানুষ। দু'বেলা দু'টো কাঁচা ডিম গলার পক্ষে ভারী উপকারী। একেবারে সদ্য-পাড়া ডিম দেবে। দেখে নেয় যেন ও। বৃদ্ধ শেষে ওকে গাইয়ে ঠাওরাল ! ঘর ফাটিয়ে হেঁসে উঠল ! বুড়ো উৎসাহিত হ'য়ে আর এক বোতলের হুকুম দিল।

সন্ধ্যে উৎরে গেছে। নাচ জমে উঠেছে। ক্রিসতফের দিকে আর নজর নেই লরশেনের। গাঁয়েরই একটি ছোকরাকে নিয়ে মহাব্যস্ত সে। অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবারের ছেলে। ওকে নিয়ে মেয়ে-মহলে চলছিল টানাটানি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসছিল মেয়েরা, কিন্তু হাসি নয়ত যেন ধারাল নখর, কাছে পেলেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে। ক্রিসতফ নিজের কথা ভুলে মনে মনে একান্ত ক'রে বলতে লাগল, জিতুক, জিতুক, লরশেন জিতুক। ওর কামনা মিথ্যে হ'ল না। জিতল লরশেন। বুকে যেন গিয়ে ধাক্কা লাগল একটা। ভয়ংকর রাগ হ'ল। লরশেনকে তো ও ভালবাসে না, না তার ভালোবাসা চায়। যাকে খুশি ভালোবাসুক না সে, ক্রিসতফের রাগ কেন? তা সত্য, বাসুক ভালো লরশেন যাকে খুশি। কিন্তু দরদ! এতবড় শহরটায় ও একেবারে নিঃসঙ্গ। এখানকার মানুষগুলো স্বার্থপর। ওকে দিয়ে যতক্ষণ তাদের স্বার্থসিদ্ধি হবে ততক্ষণই ওর খাতির। তারপর ওর পাওনা তাদের মুখ-ভ্যাংচানী, হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ। দরদী প্রাণের স্পর্শ যে ওর ভারী দরকার। আর ওর হৃদয় যে শুধু নিতেই চায় না, দিতেও চায়। দরদটুকুও দেবে না ও-মেয়ে?

লরশেনের দিকে তাকায় মৃদু হেসে। বিজয় গৌরবে গরবিনী মেয়ের রূপ যেন উথলে উঠেছে।

রাত প্রায় ন'টা। প্রায় দু'মাইল যেতে হবে। উঠে পড়ে ক্রিসতফ। দরজাটা খুলে বেরুবে, ঠিক এমনি সময় হুড়মুড় ক'রে ঢুকল এসে কয়েকজন সৈন্য। এক মুহূর্তে সব হৈ-হুল্লোড় থমকে গেল। কানাকানি পড়ে গেল সকলের মধ্যে। কয়েকজন নাচ থামিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওদের দিকে চায়। দরজার কাছে কয়েকজন কৃষক দাঁড়িয়েছিল। তারা ইচ্ছে ক'রে পেছন ফিরে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল এবং এক সময় এমনভাবে বেরিয়ে গেল যেন সৈন্যদের পথ ক'রে দেবার জন্য সরে গেল।

কিছুদিন থেকে গ্রামবাসী আর পাশের ছাউনীর সৈন্যদের মধ্যে চলছিল ঝগড়া। নিরালা গ্রামে অস্থির হ'য়ে উঠেছিল সৈন্যরা। তার মাশুল যোগাতে হ'য়েছে গ্রামের লোকদের। অকথ্য অত্যাচার অপমান সইতে হয় ওদের, মেয়েরা রাস্তায় বেরুতে পারে না। গত সপ্তাহে একদিন মদ খেয়ে মাতলামী ক'রে কোথায় একটা ভোজ হচ্ছিল, তা তচ্নচ্ ক'রে দিয়ে এল ওদের কয়েকজন। একজন কৃষককে মারতে মারতে আধমরা ক'রে ফেলেছিল। ক্রিসতফ সবই শুনেছে। সুতরাং আজ এদের ভয়টা ও বুঝতে পারে। চলে গেল না। বসল এসে আবার। দেখেই যাওয়া যাক ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়।

অভ্যর্থনার নমুনা যা পেল, তা খুশি হবার মত না হ'লেও সৈন্যরা ভ্রূক্ষেপ করল না। যারা বসেছিল তাদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে তারা টেবিল দখল ক'রে বসল। বেশীর ভাগ লোকই নিজের মনে গোঁ গোঁ করতে করতে চলে গেল। একটা বেঞ্চির একধারে বসেছিল এক বুড়ো। তার উঠতে একটু দেরী হয়। ওরা হোঃ হোঃ ক'রে হাসতে হাসতে বেঞ্চিটা ধরে উল্টে দিল। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল বুড়ো। ক্রিসতফের রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে। প্রতিবাদ করতে উঠবে এমনি সময় চোখে পড়ল বুড়ো অতি কষ্টে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল এবং নালিশ তো ক'রলই না বরং ক্ষমা চাইল উল্টে। দু'জন সৈন্য ওর টেবিলের দিকে এগিয়ে আসে। ক্রিসতফএর মুঠি শক্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আর বেশী কিছু করবার দরকার হ'ল না, কারণ ছেলে দুটি মন্দ নয়, যণ্ডামার্কা চেহারা হলেও। দলে প'ড়ে গুণ্ডামী করেছে, কিন্তু পেছনে থেকে। ক্রিসতফের চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল ওরা। তারপর ক্রিসতফ যখন কাটা কাটা কথায় বলে উঠল, 'এ-টেবিলে জায়গা নেই,' এমন একটা জোর অভিব্যক্ত হ'ল ওর স্বরে আর বলার ভঙ্গিতে, যে বুঝল ওরা এখানে আর যারা আছে তাদের থেকে

আলাদা এ লোকটা। এতক্ষণ স্থান বুঝে সিংহ বিক্রম দেখালেও ওদের নীচু ক'রে থাকতে অভ্যস্ত মাথাটা আরো নীচু হ'য়ে গেল। ক্ষমা চেয়ে দূরে সরে গেল ওরা।

এত সহজে ওদের মাথা নীচু ক'রতে দেখে আশ্বস্ত হ'ল ক্রিসতফ এবং আরো শান্তভাবে দেখতে লাগল ঘটনা-প্রবাহ। ওদের সঙ্গে ছিল একজন নন্-কমিশন্ড্ অফিসার—বুলডগের মত চেহারা, বুলডগের মতই ক্রুর দুই চোখ, ধূর্ত শয়তানী চেহারা। গত রবিবারের হাঙ্গামার ইনিই ছিলেন পাণ্ডা। ক্রিসতফের পাশের টেবিলে বসেছে এসে; নেশায় চুর। লোকদের গাল আর টিট্‌কারী দিচ্ছে যাচ্ছেতাই ভাবে। বিশেষ ক'রে নাচিয়েদের দেহ-গঠন লক্ষ্য ক'রে টিপ্পনী কাটছে যে ভাষায়, শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয় ভদ্রলোকের। ওর সঙ্গীরা হেসে লুটোয়। অন্যেরা যেন শোনেনি এমনি ক'রে মুখ ফিরিয়ে থাকে। মেয়েরা লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে, ওদের কান্না পায় এই ইতরোচিত অপমানে। পুরুষের দল দাঁত কড়মড় করে আর ভেতরে ভেতরে রাগে গুমরায়। বুলডগটার চোখ চারদিকে ঘোরে। কারু রেহাই নেই ওর কাছে। এবারে বোধহয় ক্রিসতফএর পালা। শক্ত ক'রে মগটা ধরে, ঘুসি বাগিয়ে ও প্রতীক্ষা করে। আসুক না গুণ্ডাটা এদিকে, মদ ঢেলে দেবে ওর মাথায়, আবার মনে হয় : 'ছিঃ পাগলামী করছি কেন! চলে যাওয়াই তো ভালো। ওদের সঙ্গে তো পারবো না। হাড় গুড়িয়ে হাতকড়া পড়িয়ে জেলে ঠুসে দেবে। তার চাইতে ঠোকাঠুকি লাগার আগেই চলে যাই।'

কিন্তু কতগুলো জানোয়ারের ভয়ে পালাবে ক্রিসতফ! ওর গর্বে আঘাত লাগে। না কখনও যাবে না।

ওদিকে বুলডগের ক্রুর দৃষ্টি বিঁধে আছে ওর ওপর। ওর দেহ শক্ত হ'য়ে ওঠে; চোখে আগুন জ্বলে। ক্রিসতফের দিকে তাকিয়ে অফিসারের

মুখ বাঁকা হ'য়ে যায়। পাশের সাথীকে ওর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় একটা বিশ্রী ভঙ্গি ক'রে। কি একটা ইতরামীও করতে যায়। ক্রিসতফ লাফ দিয়ে উঠে মগটা ওর দিকে ছুঁড়ে মারে আর কি। কিন্তু হরি রাখলেন, তাই এযাত্রা বেঁচে গেল। ব্যাপার হ'ল নাচতে নাচতে হঠাৎ দু'জন এসে বুলডগের গায়ের ওপর পড়ল। তার হাতের গ্লাস পড়ে গেল ধাক্কা লেগে। রেগে আগুন হ'য়ে লোকটা ওদের গাল দিতে লাগল। মন অন্যদিকে চলে যাওয়ায় ক্রিসতফের কথা আর মনে রইল না। কয়েক মিনিট অপেক্ষা ক'রে দেখল ক্রিসতফ। একেবারেই ভুলে গেছে সে। টুপীটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে। কিন্তু কেউই ওকে লক্ষ্যও করল না।

দরজার হাতলটায় হাত দিয়েছে ক্রিসতফ, হঠাৎ হুকুম হ'ল এত শিগ্‌গির যাওয়া চলবে না। ঘরের আর এক প্রান্ত থেকে একটা ক্রোধের গুঞ্জন উঠল। মদ খাওয়া হ'য়ে গেছে বাবুদের, এবার নাচবেন তাঁরা। অনেককেই মানতে হ'ল হুকুম। সব মেয়েরই জুড়ি বাছা ছিল আগে থেকে। তাদের হাঁকিয়ে দিল ওরা। কি আর করবে ওরা। কিন্তু লরশেন এত সহজ পাত্রী নয়। অফিসারটির পছন্দ হ'য়েছে ওকেই। মত্ত হ'য়ে ওয়াল্‌ট্‌জ নাচছিল লরশেন। লোকটা এসে ওর সঙ্গীকে ঠেলে সরিয়ে দিল। লরশেন চিৎকার ক'রে, মাটিতে পা আছড়িয়ে ঠেলে দিল অফিসারকে। কখনও নাচবে না ও ওই গুণ্ডার সঙ্গে। ছুটে পালায় লরশেন, সেও ছোটে পেছন পেছন। কারো আড়ালে গিয়ে যদি বা একটু আশ্রয় নিল, গুণ্ডাটার ঘুসি লাথির চোটে সে-বেচারা ছিটকে পড়ল কোথায়। অবশেষে ও দাঁড়াল গিয়ে একটা টেবিলের পেছনে। হাঁপ ছাড়বার সময় পাওয়া গেল একটু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে ওকে গাল দিতে লাগল ওর ভাণ্ডারে যত ছিল সব উজাড় ক'রে। ওদের

খামারে যত পশু পাখী আছে সব কটার সঙ্গে তুলনা দিল ওর মুখের। সে এক তুমুল কাণ্ড। লরশেন জানে এই দুর্বল আশ্রয়ে ওর পরিত্রাণ নেই। তাই যত পারে গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেওয়া। লোকটা শয়তানের হাসি হেসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওকে ধরতে চেষ্টা করে। তারপর এক অতর্কিত মুহূর্তে টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠে ওকে ধরেই ফেলল। লরশেন লাথি মেরে কিল চড় মেরে লোকটার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে। ঝটাপটিতে বুলডগ টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। রাগে লরেশনকে দেয়ালের গায়ে আছড়ে ফেলে ওর মুখে চোখে চড় কষিয়ে দিল। দ্বিতীয়বার হাত তুলিবার আগে পেছন থেকে কে একজন লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ওর টুটি চেপে ধরে লাথি মারতে মারতে যেখানে ভিড় ক'রেছে সবাই সেদিকে টেনে আনতে চেষ্টা করতে লাগল। আর কেউ নয়, ক্রিসতফ। বর্বরের হাতে একটি মেয়ের এতবড় অপমানে রাগে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হ'য়ে অন্ধের মত ছুটে এসেছে চেয়ার টেবিল উল্টে লোকজনকে ধাক্কা মেরে। পরিণাম ভাবার সময় ছিল না ওর। এই অতর্কিত আক্রমণে লোকটা ক্ষেপে উঠল। হাতের কাছে আর কিছু না থাকায় তলোয়ার বের ক'রে ক্রিসতফকে ধাওয়া করল। কিন্তু সাথে সাথেই ক্রিসতফ একটা টুল তুলে ছুঁড়ে মারল। লোকটার হাত থেকে হাতিয়ার খসে পড়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন চোখের নিমেষে ঘটে গেল যে সবাই দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে। এদিকে সৈন্যেরা খোলা কৃপাণ হাতে ছুটে আসছে ক্রিসতফের দিকে। এতক্ষণে চমক ভাঙ্গল সকলের। তারা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপক্ষ দলের ওপর। তারপর চিৎকার, মগ, টেবিল চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি, ধ্বস্তাধ্বস্তি, কামড়াকামড়ি, মাটিতে লুটোপুটি সে এক প্রলয় কাণ্ড। অনেক হজম করেছিল কৃষকেরা, সুদে আসলে হিসাব চুকাবার পালা এবার। লরশেনের সাথী—হাতুড়ি-পেটা দেহ;

একটা সৈন্যের মাথা দুই হাতে ধ'রে দেয়ালে ঠুকে চলেছে প্রাণপণে। লোকটা একটু আগে ওকে অপমান করেছিল। লরশেনও কোত্থেকে একটা হাতুড়ি জুটিয়ে ডাইনে বাঁয়ে যাকে পেল ঠুকে চলল উদ্‌ভ্রান্তের মত। মেয়েরা সব পালাল ভয়ে। কয়েকজন বাইরে-ঘোরা মেয়ে শুধু রয়ে গেল, মজা দেখবার জন্য মারপিটে যোগ দিল তারা পরম উল্লাসে। ক্রিসতফকে মাটিতে ফেলে, তার বুকের ওপর চেপে নাচছিল ক্রিসতফেরই টেবিলে বসেছিল সেই মোটা লোকটা। ভারী বুটের চাপে ওর পাঁজরের হাড়গুলো হয়ত গুড়িয়ে যেত আর একটু হ'লে। দেখতে পেল ছোট্ট মোটা মেয়েটি। ছুটে গিয়ে অগ্নিকুণ্ড থেকে খানিকটা গরম ছাই এনে, হ্যাঁচকা টানে মারল টান গুণ্ডাটার মাথাটার পেছন দিক থেকে। মাথাটা উল্টে যেতেই আগুনে-ছাই দিল ওর চোখে ঢেলে। লোকটা ষাঁড়ের মত গোঁ গোঁ ক'রে চিৎকার ক'রে উঠল। উল্লাসে নেচে উঠল মেয়েটি। নিরস্ত্র শত্রুকে গাল দিতে লাগল প্রাণ ভরে। কৃষকের দলের হাতে পড়ে অভাগার যা দশা ঘটল তা না বলাই ভালো। সৈন্যরা দেখতে পেল ও-পক্ষের দল ভারী; অতএব সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ এই আপ্ত বাক্য স্মরণ ক'রে দু'জন ধরাশায়ী সাথীকে ফেলে রেখেই রনে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালাল সব, পেছনে ছুটল কৃষকরা। যে-পথে ওরা যায়, এরা ছোটে পেছনে। রাস্তায় রাস্তায় লড়াই। সৈন্যরা গ্রামবাসীদের বাড়ীতে গিয়ে চড়াও হয়, গ্রামবাসীরা কুকুর লেলিয়ে দেয়, নিরানী যন্ত্র হাতের কাছে পেয়ে তাই নিয়ে তাড়া করে। একজন সৈন্যের পেট দু'ফাঁক হ'য়ে গেল ধারাল একটা নিরানীর আঘাতে। তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেল সৈন্যেরা শেষ পর্য্যন্ত; কিন্তু দূর থেকে শাসিয়ে গেল দলবল নিয়ে ফিরে আসবে আবার।

বিজয়ীর দল ফিরে এল আবার সরাইখানায় বিজয়োল্লাসে। বহু পীড়ন,

লাঞ্ছনা সহ্য করেছিল ওরা নীরবে বহুদিন ধরে। এতদিনে তার কিছু শোধ হ'ল। উল্লাসে উত্তেজনায় পরিণামের কথা মনে আসেনি কারো। কেবল চলছে নিজের নিজের বীরত্বের সদম্ভ আস্ফালন। এক সাথে সকলে চিৎকার করে। ক্রিসতফের ভারী আদর। ওর বড় ভালো লাগে। আজ আর ও পর নয়। এদেরই একজন। লরশেন এসে ওর হাতখানা নিজের রুক্ষ হাতের মধ্যে নিয়ে খিলখিল ক'রে হাসে। অন্ততঃ এখন আর ক্রিসতফকে অদ্ভুত লাগে না ওর।

উত্তেজনা ক'মে এলে মনে পড়ে আহতদের কথা। এ পক্ষের বিশেষ কিছু হয়নি কারো, সামান্য দু'একটা দাঁত ভেঙ্গেছে, বা, পাঁজরের দু' একখানা হাড় ভেঙ্গেছে দু'চার জনের। আর সামান্য আঁচড় কামড়। কিন্তু ও-পক্ষের জখমীদের অবস্থা সাংঘাতিক। যার চোখে গরম ছাই ঢেলে দিয়েছিল মোটা মেয়েটি, তার একটা কাঁধ কার কুড়ুলের ঘায়ে প্রায় আধখানা। পেট-কাটা লোকটির শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। আহতদের মধ্যে ওদের অফিসারও ছিল। তিনজনের মধ্যে তার আঘাতই সবচেয়ে কম। সবাইকে আগুনের পাশে এনে শোয়ান হ'ল। খানিকক্ষণ পরে অফিসার চোখ মেলল। কৃষকেরা ঘিরে বসে আছে আহতদের মুখের দিকে চেয়ে। ওদের দিকে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অফিসার। জ্ঞান ভাল ক'রে হতে না হ'তেই আরম্ভ করল গাল। এর শোধ তুলে তবে ছাড়বে। একজন একজন ক'রে বাছাধনদের বুঝিয়ে দেবে মজা। রাগে ওর গলার স্বর কাঁপে। চোখে আগুন; পারলে হয়ত গাঁখানা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় এই মুহূর্তে। কৃষকরা হাসে; কিন্তু জোর-করা হাসি। একজন ছোকরামত ধমকে ওঠে লোকটাকে:

'মুখ সামলে কথা কও, নইলে খুন ক'রে ফেলব।' উঠতে চেষ্টা করে অফিসার। চোখ দুটো রক্তের মত লাল; জলন্ত দৃষ্টিতে কট্‌মট্ ক'রে

তাকিয়ে গর্জন ক'রে ওঠে: 'শুয়র কাহাকার। খুন! আমায় খুন করবি! তোদের একটারও ঘাড়ে মাথা থাকবে না।'

ভয়ে কৃষকদের দেহের রক্ত যেন জমে যায়। লরশেন আর কয়েকজন স্ত্রীলোক মিলে আহতদের আর একটা ঘরে নিয়ে যায়। অফিসারের চিৎকার আর মুমূর্ষুর গোঙ্গানী মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। কিন্তু কৃষকরা যে যেখানে ছিল পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। কারু মুখে কথা নেই। ওরা যেন জমে গেছে ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—মুমূর্ষু মানুষগুলো এখনও যেন পড়ে আছে ওদের সামনে। ভয়ে কারু দিকে কেউ তাকাতেও পারে না। অনেকক্ষণ এমনি যায়।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে লরশেনের বাবা: 'কাজের মত কাজ করেছ একটা।'

একটা গুঞ্জন ওঠে—যেন ভয়ার্তের চাপা আর্তনাদ। গলা শুকিয়ে কাঠ সবার। তারপর সকলে হঠাৎ এক সঙ্গে কথা ব'লে ওঠে। প্রথমটায় স্বর বেরুতে চায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে জড়তা কেটে যায়। গলায় জোর আসে। খোঁজ পড়ে কাণ্ডটা বাঁধাল কে। এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপায়, সে তার ঘাড়ে। বচসা দাঁড়ায় ঝগড়াতে এবং ক্রমে ঝগড়া ছেড়ে আবার নূতন ক'রে হাতাহাতির উপক্রম হয়। লরশেনের বাবা কৌশলে উত্তেজনার মোড় ঘুরিয়ে দেয় ক্রিসতফের দিকে। সবাইকে শান্ত ক'রে, বুকের ওপর হাত দুটোকে আড় ক'রে মাথা সোজা ক'রে থুতনি নেড়ে ঝাঁঝিয়ে বলে ক্রিসতফের দিকে ফিরে:

'বলি, এই লোকটার কোন্ মাথা-ব্যথা প'ড়েছিল?'

হুংকার দিয়ে ওঠে বীরের দল: 'ঠিক্ ঠিক্ বলেছ। এই ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া। ওই তো লাগাল। নইলে মারামারি হ'তই না।'

একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়ে ক্রিসতফ! এরা বলে কি?

একটা জবাব দিতে চেষ্টা করে : 'হ্যাঁ, ঝগড়া বাঁধিয়েছি আমিই। কিন্তু কার জন্য? আমার জন্য নয়। সবাই দেখেছ নিজ চোখে।'

ওরা হিংস্র হ'য়ে ওঠে :

'ওঃ, বড় আমার উপকার করনেওয়ালা এসেছেন রে। আমরা সব ভেড়া, তাই উনি এসেছেন আমাদের রক্ষা করতে। ঘাস খাই তো, তাই শহুরে ভদ্দরনোক এলেন আমাদের শেখাতে। কে তোর উপদেশ চেয়েছে রে? এখানে কে বলেছিল তোকে আসতে? বাড়ী বসে থাকতে পারিস নি?'

কি আর বলবে ক্রিসতফ! দরজার দিকে এগোয়। লরশেনের বাবা এসে পথ আগলে দাঁড়ায়। চিৎকার ক'রে ওঠে :

'বটে! আমাদের বিপদে ফেলে এখন গুটি গুটি সটকাবে! সেটি হচ্ছে না যাদু! যেতে পারছ না।'

অন্যরা চীৎকার ক'রে সায় দেয় : 'না না, কিছুতেই ছাড়া হবে না। আমাদের ফাঁসিয়েছো। তার দামটি চুকিয়ে তবে যাবে চাঁদ!'

ওকে ঘিরে ফেলে সবাই। মুঠি আস্ফালন ক'রে গর্জন করে। ওদের চোখে খুন। হিংস্র মানুষগুলি ক্রমশঃই এগিয়ে আসে ওর দিকে। ক্রিসতফ বোঝে, ভীরুগুলো ভয় পেয়েছে, তাই এই বন্যতা। টুপীটা টেবিলের ওপর রেখে ঘরের শেষ প্রান্তে গিয়ে বসে রইল পেছন ফিরে।

লরশেন ভয়ানক চটে গেল। ঠেলে সরিয়ে দিল মারমুখো লোকগুলোকে। রাগে ওর সুন্দর মুখখানা লাল হ'য়ে ওঠে। চিৎকার ক'রে গাল দেয় :

'ভীরুর দল কোথাকার। জানোয়ার! লজ্জা করে না? যতসব দুধে-খোকা! ওই একটা মানুষই অতগুলো লোককে ঠেঙ্গিয়েছে, আর তোমরা সব হাত গুটিয়ে বসেছিলে। মাছ ভাজা উল্টে খেতে জানো না। ভীরু শেয়াল যত সব...!'

এই হঠাৎ আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল কৃষকরা। পরক্ষণেই আবার চিৎকার ক'রে উঠল :

'ওই তো শুরু করল। নইলে কোন গোলমাল হ'ত না।'

বাপ মেয়েকে ইশারা করে চলে যেতে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। তুবড়ীর মত মুখ চলে লরশেনের :

'হ্যাঁ করেইছে তো আরম্ভ। সবার মুরোদ দেখা গেছে। মারামারি বাঁধিয়েছে তাই বেঁচেছ। নইলে ওদের বুটের লাথি খেতে খেতে মুখ ভোঁতা হ'ত। মরদ না, যত মুর্দার দল!'

তারপর ওর নাচের জুড়ি ছেলেটির দিকে ফিরে বলে :

'আর তুমি? বোবা হ'য়ে গিয়েছিলে? প্রাণখানা তো ধুকপুকিয়ে একেবারে ঠোঁটের আগায় এসেছিল। লালমুখোগুলোর লাথি খাবার জন্য পিঠখানা পেতে দিতে! দু'চারটে লাথি পড়লে ধন্য হ'য়ে পা চাটতে ওদের, না? লজ্জা করে না তোমাদের? আশ্চর্য্য! যত নির্লজ্জ বেহায়ার দল। তোমরা মানুষ নও, ভেড়া—। একটু শিক্ষার দরকার ছিল তোমাদের। দেখিয়ে দিল এই লোকটা সাহস কাকে বলে। আসল মরদের বাচ্চা। আর ওকেই বিপদের মুখে একলা ঠেলে দেবার ব্যবস্থা করছ, না!···সেটি হচ্ছে না। খবরদার। আমাদের জন্য লড়েছে ও। বাঁচাতে পার ওকে বাঁচাবে, আর, নয় তো ওর সাথে তোমাদেরও মরতে হবে, জেনে রেখো। এই বলে দিলাম···'

বাপ রাগে একেবারে জ্ঞানশূন্য। মেয়েকে হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিতে চায় : 'চুপ কর, চুপ কর হারামজাদী!'

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় বাপকে। তুফানের মত ওর মুখ চলে। সবার চিৎকার ছাপিয়ে ওঠে ওর গলা :

'সব দেখেছি আমি! ও-ঘরে ওই আধমরা লোকটাকে লাথি মেরেছে

কে শুনি ? এই তুমি···দেখি তোমার হাত ! রক্ত লেগে আছে কেন ? ভেবেছ, হাতের ছোরাখানা দেখিনি আমি ? সব দেখেছি। একটি চুল ছুঁয়েছ এ-লোকটার, তবে যা দেখেছি সব বলে দেব। বুঝলে ? সকলের হাতে হাতকড়া পরিয়ে তবে ছাড়ব।'

মার মার ক'রে ছুটে আসে সবাই। একজন লরেশেনের কান মলতে যায়। কিন্তু ওর সঙ্গী ছেলেটি ঘাড়ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় তাকে। আর একবার হাতাহাতি লেগে ওঠে প্রায়।

বুড়ো বলে তার মেয়েকে :

'বলি, আমাদের হাতে হাতকড়ি পড়লে তুই বেঁচে যাবি ভেবেছিস ?'

ফেটে পড়ে জবাব দেয় লরশেন : না তা ভাবিনি। তোমাদের মত ভীরু নই আমি।'

এই দজ্জাল মেয়েটাকে নিয়ে কি যে করা যায়, ভেবে ঠিক পায় না কেউ। নিরুপায় হ'য়ে বাপকে বলে :

'কি হে, মেয়ের মুখটা বন্ধ করতে পারছ না ?'

বৃদ্ধ জানে মেয়েটাকে আর না ঘাঁটালেই ভালো। ওর ইশারায় চুপ হ'য়ে যায় সবাই। লরশেন একা একা বকে চলে, কেউ জবাব দেয় না। ইন্ধনহীন আগুনের মত আপনি নিভে যায় ও। একটু কেশে ওর বাবা বলে এই সুযোগে : 'হ্যাঁরে, তোর ইচ্ছেটা কি বল ত ? আমরা সবাই মরি ?'

জবাব দেয় লরশেন : 'তোমরা মর তা চাইনে, তবে ও বাঁচে এটা চাই।'

ভাবনার কথা। সবার মুখে চিন্তার ছায়া পড়ে। ক্রিসতফ একভাবে বসে আছে কাঠ হ'য়ে মাথা উঁচু ক'রে। মুখ দেখে মনে হয় ওদিকে কিসের কথা হচ্ছে, কিছুই বোঝেনি ও। কিন্তু লরশেনের এই অভয়া রূপ

ওর হৃদয় স্পর্শ করে। ওরই টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে। কিন্তু ক্রিসতফ যে এখানেই বসে সে-খেয়াল ওর আছে ব'লে মনে হয় না। অবশেষে মুখের পাইপটাকে চর্বন করতে করতে ওর বাবা বলে :

'আমরা না হয় কিছু না বললাম। কিন্তু ও এখানে থাকলে ওর জানটি থাকবে না। ওদের বড়কর্তা ওকে দেখেছে। চিনে রেখেছে। সে-বেটা তো ছাড়বে না। কাজেই ওর সামনে একমাত্র খোলা পথ, দেশ ছেড়ে যাওয়া, একেবারে ত্রিসীমানা পেরিয়ে।'

ভেবে চিন্তে এই উপায়ই ঠাউরে রেখেছে বুড়ো। ক্রিসতফ-এর পালানই ভাল। সবার পক্ষেই ভাল। তাহ'লে আফ্‌সেই প্রমাণ হ'য়ে যাবে দোষটা কার। দূরে চলে গেলে যত খুশি দোষ চাপাও, মারতে তো পারবে না। সবাই মানলে ওই একমাত্র পথ। চোখের নিমেষে সব ভুলে একঘর মানুষ ক্রিসতফের শুভাকাংক্ষী হ'য়ে উঠল। বুড়ো বলে : 'বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়। এক মুহূর্ত সময় নেই। এসে পড়ল ব'লে! আধঘণ্টা ওদের আস্তানায় যেতে, আধঘণ্টা আসতে, বাস্‌...পালাও এই সুযোগে...'

উঠে দাঁড়ায় ক্রিসতফ। ও-ও ভাবছিল, কি করা যায়। এখানে থাকলে রক্ষে নেই তা ঠিক। কিন্তু মাকে না ব'লে, দেখাটুকুও না ক'রে চলে যাবে?...না, তা হয় না। কিছুতেই হয় না। বলল, শহরে ওকে যেতেই হবে একবার। যথেষ্ট সময় থাকবে। রাতেই ও সীমান্ত পার হ'তে ঠিক পারবে। জোর প্রতিবাদ ওঠে ও-পক্ষ থেকে। কতক্ষণ বা আগের কথা ক্রিসতফ যেতে চেয়েছিল। ওকে ওরা যেতে দেয়নি। এখন ওকে ওরা থাকতে দেবে না। শহরে গেলে ধরা পড়বেই ও। যে ক'রে হোক খবর পৌঁছে যাবে ছাউনীতে। তারা গিয়ে ওর বাড়ী চড়াও

করবে। তবু ক্রিসতফ জেদ করে। লরশেন বোঝে। বলে : 'মার সাথে দেখা করতে চাও?...আচ্ছা, তোমার যেতে হবে না। আমি যাচ্ছি তোমার বদলে।'

'কখন?'

'আজ রাতেই।'

'সত্যি? সত্যি যাবে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' শালটা জড়িয়ে নিল লরশেন।

'একটা চিঠি লিখে দাও মায়ের কাছে। এস, কালি কাগজ দিচ্ছি।' ভেতর দিকের একটা ঘরে ওকে নিয়ে যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বন্ধুকে ডেকে বলে :

'তৈরী হ'য়ে নাও। তোমায় যেতে হবে ওর সাথে। সীমান্ত পার ক'রে দিয়ে তবে তুমি আসবে।'

যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বিদায় হ'য়ে যাক আপদ। ফ্রান্সে কেন, আরও দূরেই না হয় পার ক'রে দিয়ে আসবে ও।

ক্রিসতফ তখনও পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। মার সাথে দেখা ক'রে, মায়ের বুকে মাথা রেখে বিদায় নিয়ে যেতে পারবে না, ভাবতে পারছে না ও। আবার কবেই বা দেখা হবে, কে জানে! বয়েস হয়েছে মার, এমনিতেই বড় একা; ভেঙ্গেও পড়ছেন দিন দিন; এ-আঘাত কি সইতে পারবেন! ওকে ছাড়া কি বাঁচবেন! আবার মনে হয়, এখানে থাকলে ওই কি বাঁচবে! জেলে পচতে হবে সারা জীবন। মার পক্ষে আরো খারাপ হবে তা হ'লে। বরঞ্চ যদি ধরা না প'ড়ে বাইরে থাকতে পারে স্বাধীনভাবে, তবে একদিন না একদিন দেখা হবেই; বিপদে আপদে ও সাহায্য করতে পারবে; মাও যেতে আসতে পারবেন ওর কাছে। ঠিক করতে পারে না কিছুই। সময় নেই ভাববার।

লরশেন এসে হাত ধরে। পাশে দাঁড়িয়ে পরম অন্তরঙ্গতায় তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। মুখে মুখ ছুঁয়ে যায়। ব্যগ্র বাহু দিয়ে ওর কণ্ঠ জড়িয়ে টেবিলের দিকে দেখিয়ে বলে কানে কানে :

'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! দেরী করো না একটুও।'

ভাবনা বিসর্জন দিয়ে টেবিলে এসে বসে ক্রিসতফ। একটা হিসেবের খাতা থেকে লাল রংএর খোপ খোপ কাটা একটা কাগজ ছিঁড়ে এগিয়ে দেয় লরশেন। ক্রিসতফ লেখে :

"মাগো,

আজ তোমায় যে আঘাত দিচ্ছি, কি ক'রে যে ক্ষমা চাইব জানি না। কিন্তু মাগো আমার যে উপায় নেই। কোন অন্যায় করিনি আমি; তবু আমায় যেতে হবে। একেবারে দেশ ছেড়ে যেতে হবে। যে-মেয়েটি এই চিঠি নিয়ে যাচ্ছে তার কাছ থেকেই সব শুনতে পাবে। তোমার কাছে বিদায় না নিয়ে যেতে আমার পা সরছে না। কিন্তু মা, ওরা আমায় যেতে দিলে না। আমি নাকি ধরা পড়ে যাব। আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। দেহ মন অবশ। কিছু ভাববারও ক্ষমতা নেই। সীমান্ত ছেড়ে যাচ্ছি। তবে তোমার চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত সীমান্তের কাছাকাছি থাকব। এই মেয়েটি তোমার জবাব নিয়ে আসবে। কি করব বলে দিও, মাগো। ফিরে আসতে বল ফিরে আসব। যা বল করব। বলো, মা, আমায় ফিরে আসতে বলো। তোমায় একা ফেলে যাচ্ছি, এ যে সহ্য করতে পারছিনে। কি নিয়ে বেঁচে থাকবো? ক্ষমা ক'রো মা আমায়, তোমার অযোগ্য ছেলেকে। ক্ষমা ক'রো। আমার ভালোবাসা আর চুমু নিও..."

দরজাটা ফাঁক ক'রে উঁকি দেয় লরশেনের বন্ধু :

'ওহে করছ কি! তাড়াতাড়ি কর। নইলে যে সবশুদ্ধ মরব!'

ক্রিসতফ কোনরকমে নিজের নামটা নীচে লিখে চিঠিটা লরশেনের হাতে দেয় :

'নিজে গিয়ে হাতে হাতে দেবে কিন্তু।'

'এই যে এক্ষুনি যাচ্ছি,' লরশেন বলে। যাবার জন্য তৈরী হয়েই এসেছে ও : 'কাল জবাব পাবে চিঠির। লাইডেনের [জার্মান সীমান্ত পেরিয়ে প্রথম ষ্টেশন] প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করবে আমার জন্য।'

'চিঠি পড়ে মা কি বললেন, কি করলেন, কিভাবে নিলেন খবরটা সব কিন্তু বলবে এসে। কিছু লুকুবে না', বলেই মিনতি করে ক্রিসতফ।

'না, কিছু লুকুব না। সব বলব।'

বন্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে, রাশ টানতে হয় কথায়, ব্যবহারে। বলে লরশেন : 'মাঝে মাঝে গিয়ে তোমার মাকে দেখে আসব হের ক্রিসতফ। তাঁর খবর তুমি ঠিক পাবে। ভেবো না।' খুব জোরে পুরুষের মত ক'রে করমর্দন করে লরশেন।

'চল হে, চল।' হাঁক আসে দরজার কাছ থেকে।

'চল।' জবাব দেয় ক্রিসতফ।

তিন জনেই বেরিয়ে পড়ে এক সাথে। রাস্তায় এসে ওরা বিদায় নেয়। লরশেন এক রাস্তায় চলে। ক্রিসতফরা ধরে তার বিপরীত পথ। দুজনেই নির্বাক। কুয়াশা মুড়ি-দেওয়া বাঁকা চাঁদ ডোবে বনের আড়ালে। তারি ম্লান আলো দোলে মাটির বুকে। বায়ুমণ্ডলে বিছান দুগ্ধ-ফেন শুভ্র কুহেলীর গাঢ় আবরণ। ভিজে বাতাসে গাছেরা শির-শিরিয়ে ওঠে। গ্রাম থেকে সবে কয়েক মিনিটের পথ এসেছে ওরা। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ক্রিসতফের সঙ্গী, ওকে থামতে ইশারা করে। কিসের শব্দ শোনা যায়। কান পাতে দু'জনে। সামনের রাস্তায় সৈন্যদলের মাত্রায় বাঁধা পা ফেলার শব্দ। লাফ দিয়ে বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওদিকের মাঠে

গিয়ে পড়ে। চষা জমির ওপর দিয়ে চলতে থাকে। শুনতে পেল সৈন্যরা পথ দিয়ে চলে গেল। ক্রিসতফের সঙ্গীটি অন্ধকারেই শত্রুর দিকে তার বদ্ধমুষ্টি ছুঁড়ে মারে। শিকারী কুকুরের ডাক শুনে কোণঠাসা জন্তুর মত ক্রিসতফের হৃদয়-স্পন্দন যেন থেমে যায়। রাস্তায় এসে উঠল আবার। গ্রাম ও খামারের কুকুরগুলো রাতের অন্ধকারে অচেনা লোক দেখে ডাকতে আরম্ভ করেছে। ধরা পড়ার ভয় আছে। একটা জঙ্গলে-ঢাকা পাহাড়ের ওপর থেকে দূরে ষ্টেশনের লাল আলো দেখা যায়। সিগন্যালের লাইন ধরে ধরে প্রথম ষ্টেশনটায় গিয়ে ট্রেণ ধরবে ঠিক ক'রল। কিন্তু যেতে হ'ল বিপথে। ঘন কুয়াশা নীচে। ঘন নয় শুধু, নিরেট। নিজের হাত পা দেখা যায় না। রাস্তায় পড়ল গোটা কয়েক নদী-নালা। তারপর এল বীটের ক্ষেত আর চষা জমি—মনে হয় এর বুঝি শেষ নেই। এ ছাড়াও প্রতি পদে খানা, ডোবা, গর্ত, উঁচু নীচু। কখন যে কোথায় পা পড়ে তার ঠিক নেই। কুয়াশার মধ্যে অন্ধের মত পথ চলেছে ওরা। হঠাৎ দেখা গেল একটা বাঁধের ওপরে সিগন্যালের লাল আলো। বাঁধের ওপর উঠে রেল ধ'রে চলতে লাগল। যে-কোন মুহূর্তে ট্রেণ এসে পড়তে পারে। ডাইনে বাঁয়ে সরে যাবার পথ নেই। প্রাণ হাতে নিয়ে চলা। তবু চলতেই হবে। ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে রাস্তায় নামল আবার। ট্রেণ ছাড়ার প্রায় কুড়ি মিনিট আগেই ওরা ষ্টেশনে এসে পৌছুল। লরশেনের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও ওর সঙ্গী চলে গেল ট্রেণ ছাড়ার আগেই। এতক্ষণ ওদের বাড়ীঘরে কি যে কাণ্ড ঘটে গেল কে জানে; সেই চিন্তায় বেচারা অস্থির।

ক্রিসতফ লাইডেনের টিকিট কিনে তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম কক্ষে একা চুপ ক'রে বসে রইল ট্রেণের প্রতীক্ষায়। গাড়ী এল অবশেষে। একজন ট্রেণ-কর্মচারী কামরার মধ্যে একটা বেঞ্চিতে ঘুমিয়েছিলেন। উঠে ওর

টিকিট পরীক্ষা ক'রে দরজা খুলে দিলেন। আর দ্বিতীয় লোক নেই কামরার মধ্যে। সমস্ত ট্রেণে প্রতিটি যাত্রী ঘুমিয়ে—ঘুমিয়ে বাইরের ওই উন্মুক্ত মাঠের বুকে সবকিছু। কিন্তু ঘুম নেই ক্রিসতফের চোখে। শ্রান্তিতে অবসাদে দেহ ভেঙ্গে পড়ছে, তবু ঘুম নেই। ট্রেণের ভারী ভারী লোহার চাকাগুলি ঝন্‌ঝনিয়ে সীমান্তের দিকে ছুটে চলেছে···আর কতক্ষণ! ক্রিসতফ ভাবে আর কতক্ষণ! তারপরেই তো মুক্তি। আর প্রায় ঘণ্টাখানেক। তারপরেই বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নেবে ও ভয়শূন্য হ'য়ে। কিন্তু তার আগে! একটি ছোট্ট কথায় এই মুহূর্তে ও ধরা পড়তে পারে।··· ধরা পড়বে!···কথাটা মনে হতেই ওর সমস্ত সত্তা বিদ্রোহী হ'য়ে ও'ঠে··· ঘৃণ্য পশু-শক্তির হাতে ওর বিসর্জন হবে! ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে। মায়ের কথা ভুলে গেল, দেশের কথা ভুলে গেল। যা কিছু পেছনে ফেলে এসেছে মন থেকে সব মুছে গেল···মুক্তি, মুক্তি ছাড়া আর কিছু মনে নেই চেতনে অবচেতনে। মর্যাদা-দৃপ্ত চিত্ত শুধু জানে তার মুক্তি চাই। সম্ভাবিত বন্ধন থেকে মুক্তি পেতেই হবে। অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে ওর স্বাধীনতা—যে-কোন মূল্যে, যে-কোন উপায়ে; এর জন্য যদি নিজেকে মসীলিপ্ত করতে হয় তাও করবে। কেন হেঁটে এল না, কেন ট্রেণে চড়তে গেল! অনুতাপে ওর মন দগ্ধ হ'তে লাগল। কয়েক ঘণ্টা সময় বাঁচাতে চেয়েছিল! খুব লাভ হ'ল। এখন বাঘের মুখে পড়ো। নিশ্চয় সর্বত্র হুকুম চলে গেছে। সীমান্তের ষ্টেশনে পৌছুলেই ও ধরা পড়বে···ষ্টেশন আসছে একটা। ভাবল, পৌছুবার আগেই চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যাবে। দরজাটা খুললও। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেণ ঢুকে গেছে ষ্টেশনে। পাঁচ মিনিট থামবে। পাঁচ মিনিট নয় তো, অনন্তকাল। কামরার শেষপ্রান্তে গিয়ে পরদার আড়ালে লুকিয়ে রইল। প্ল্যাটফরমে একজন রক্ষী স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর বুকের রক্ত জল হ'য়ে আসে।

হঠাৎ ষ্টেশন মাষ্টার একটা টেলিগ্রাম হাতে ছুটে এলেন রক্ষীর দিকে। নিশ্চয়ই ওর ব্যাপার। চারদিক হাতড়ায়, কোন একটা হাতিয়ার যদি পাওয়া যায়। খালি দু'মুখো একটা ছুরি আছে। ওটাই খুলে বাগিয়ে ধ'রে রাখল! একজন কর্মচারী ল্যাম্পটা বুকের কাছে ধরে ট্রেণের সাথে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছেন। হাতের মুঠোটা ছুরির বাঁটে শক্ত হ'য়ে চেপে বসল। ওর গা দিয়ে ঘাম ছোটে ; আর বুঝি রক্ষে নেই।

লোকটা এ কামরায় না এসে পরের কামরায় উঠে নূতন একজন যাত্রীর টিকিট পরীক্ষা করল। ক্রিসতফের কামরায় আসেনি, ভালোই হয়েছে। সামনে পেলে ওর বুকে হাতের ছুরিখানা অনায়াসে বসিয়ে দিতে পারত। ট্রেণ আবার চলতে আরম্ভ করে। দুই হাতে বুকের কাঁপুনি চেপে রাখে। আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় করে। বড় বাঁচা বেঁচেছে সত্যি কথা। কিন্তু না, এখন উচ্চারণ করবে না ও-কথা। নিজের দুই কানের কাছেও না। এখনও বাকী আছে রাস্তা। ওদের আওতার বাইরে গিয়ে বলবে, ততক্ষণ যদি ধরা না পড়ে।...

ভোর হ'য়ে আসে। রাত্রির সমুদ্র হ'তে গাছেরা ধীরে ধীরে দেখা দেয় কৃষ্ণ আলিম্পনে। রিনিঝিনি ঘণ্টা বাজিয়ে, মিটি মিটি আলোর চোখে চেয়ে চেয়ে রাস্তায় একটা গাড়ী চলে গেল একটা ভুতুরে ছায়ার মত। জানালার সার্শীতে মুখটা লাগিয়ে ক্রিসতফ রাজকীয় ছাপ-মারা সীমা-নির্দেশক স্তম্ভগুলি খোঁজে। ট্রেণের বাঁশী বেজে ওঠে। ষ্টেশন এসে গেছে...বেলজিয়ামের ভূমি...বেলজিয়ামের প্রথম ষ্টেশন।

দরজাটা একেবারে খুলে দেয়...বাইরের হিমেল হাওয়ার মুক্তি পান করে বক্ষ ভ'রে। মুক্তি...মুক্তি...ক্রিসতফ মুক্ত...জীবনের স্বর্ণ সিংহদ্বার ওই খুলে গেল...আনন্দ! আনন্দ! জীবন-পাত্র উছলিয়া ওঠে আনন্দ-রসে!...হঠাৎ ওর আনন্দের আকাশ কালো হ'য়ে উঠল। যা পেছনে

ফেলে এল তারি ব্যথার সাথে ব্যথা হ'য়ে মিলল এসে অনাগতের ভয়। উত্তেজনা-ভরা জাগরী রাত্রির অবসাদে অঙ্গ ছেয়ে গেল। একটা আসনের ওপর লুটিয়ে পড়ল ওর অসাড় দেহ। মিনিটখানেকও হয়নি ট্রেণ থেমেছে। একজন অফিসার এসে দেখেন অঘোরে ঘুমুচ্ছে ক্রিসতফ। জাগিয়ে দিলেন। ওর চোখে ঘোর; মনেও ঘোর। মনে হয় যেন অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিল। টলতে টলতে শুল্ক অফিসে গেল। সেখানকার ছাড়পত্র পেয়ে ওয়েটিং রুমে এসে বসে পড়ল একটা বেঞ্চির ওপর এবং মুহূর্তে অঘোর ঘুমে ঢলে পড়ল।

ঘুম ভাঙ্গল সে ছুইপুরে। লরশেনের আসতে এখনও দেরী আছে। বেলা ছুটো তিনটের আগে তার আসা হ'য়ে উঠবে না। খানিকক্ষণ প্লাটফর্মে পায়চারী ক'রে সোজা চলে গেল মাঠের দিকে। গুমোট দিন—আসন্ন শীতের উদ্বোধন। আলোর রং ফিকে। চারদিক একটা বিষন্ন স্তব্ধতায় থম্‌থমে; মাঝে মাঝে তার তাল ভঙ্গ হয় ট্রেণের বাঁশীর মন্থর ধ্বনিতে। জনহীন গ্রামসীমা…সীমান্ত রেখার কিছু দূরে এসে দাঁড়ায় ক্রিসতফ। সামনে বেড়ায়-ঘেরা ছোট একটা পুকুর; তার স্বচ্ছ জলে মেঘলা আকাশের ছবি। ডানদিকে একটা পপলার গাছ…তার নিষ্পত্র শাখায় শাখায় নাচন লাগছে। পেছনে প্রকাণ্ড একটা ওয়ালনাট গাছ… তার মহাকায় অজগরের মত ঘনকৃষ্ণ ডালগুলি অজস্র ফলের ভারে নোওয়া। পাতা-ঝরা শেষ হয়নি এখনও। পুকুরের শান্ত বুকে এক আধটি ক'রে শুকনো পাতা ঝরে পড়ে টুপটাপ, টুপটাপ। হঠাৎ ওর মাথা ঘুরে ওঠে। এই গাছ, এই পুকুর যেন এর আগেই ওর দেখা। কত কালের চেনা মনে হয়…হঠাৎ কি হ'য়ে যায়…জীবনের সম্মুখে যেন দূর দূরান্তরের আগল খুলে গেল…কালের বুকে দেখা দিল বিশাল গহ্বর। স্থান কালের হিসাব যায় ধোঁয়ায় মিলিয়ে। ভুলে যায় কেই বা ও, এ কোথায়ই বা আছে…কোন যুগের পার-ঘাটে? কত যুগ ধরেই বা এমনি আছে এখানে? ওর কেমন

যেন মনে হয়, এমনিই ছিল কোন এক কালে, কিন্তু আজ তা নেই। আজ ক্রিসতফ ক্রিসতফ নেই আর। আজ অনেক দূর থেকে ও নিজকে দেখতে পাচ্ছে। এ যেন ও নয়, অন্য আর কেউ দাঁড়িয়ে আছে ওর জায়গায়। কিসের স্মৃতি গুনগুনিয়ে ওঠে ভেতরে, কোন এক অশরীরি, পরিচয়হীন সত্তার বাণী ওঠে মর্মরিয়া। ওর শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করে, ও কান পেতে শোনে তার কল্লোলিত উদ্‌ঘোষণা : 'এমনি ক'রে···এমনি ক'রে···এমনি ক'রে···'

এমনি ক'রেই ক্রাফট বংশের অভিযাত্রা চলেছে যুগে যুগান্তরে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী আবর্তিত হয় ওর চিত্তের গভীরে, ক্রিসতফেরই শুধু একা নয়, বহু বহু ক্রাফটের জীবনেও ঠিক এমনি কঠিন দিন এসেছে··· এমনি ক'রে বুকের রক্তে পথ রাঙ্গিয়ে দেশের মাটি থেকে বিদায় নিয়েছেন তারা। বাধা-বন্ধহীন উদ্দাম সৃষ্টিছাড়া স্বাধীনচেতা জাতি। স্বাধীন মনটার জন্যই যেখানে গেছে তাড়া খেয়ে খেয়ে আবহমান কাল ওরা যাযাবর হ'য়ে রইল। ওদের বুকের মধ্যে একটা দানব বাসা বেঁধে আছে— কোথাও তিষ্টুতে দিলে না কাউকে। দেশের মাটি থেকে উপড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে এখানে সেখানে। তবু হতভাগ্যের দল মাটির সাথে নাড়ীর বাঁধনে বাঁধা হ'য়েই রইল। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা অনির্বাণ হ'য়ে আমরণ বুকে জ্বলেছে সবার। এক লহমার তরেও তা স্তিমিত হয়নি।

ক্রিসতফও আজ সেই একই পথের পথিক···পথের ধূলোয় পূর্বগামীদের পায়ের চিহ্ন খোঁজে। ধীরে ধীরে দিগ্বালে কুয়াশার সাথে মিশে যায় প্রিয় ভূমির শেষ রেখা···ওকেও বিদায় নিতে হ'ল আজ অদৃষ্টের ফেরে। কিন্তু ও তো নিজেই যেতে চেয়েছিল, রীতিমত পাগল হ'য়ে উঠেছিল। তবু আজ বিদায়ের ক্ষণে ওর বুক ভেঙ্গে যেতে চায়। এই তো ওর মা— ধাত্রিকা জননী। ওকে পালন করেছেন, ব্যথার ব্যথী, কর্মের সাথী হ'য়ে

সুখে হোক, দুঃখে হোক এই মায়ের সাথেই ওর জীবন কেটেছে। এই মায়েরই বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে ; আশ্রয় পেয়েছে তার অন্তলোকে। ওর সমগ্র সত্তার কোষে কোষে প্রাণশক্তি হ'য়ে আছেন ওর দেশমাতৃকা। ওর অতীত, ভবিষ্যৎ, প্রেমের পাত্রদের পবিত্র স্মৃতি, ওর মানসলোকের স্বপ্নের ধন ওই মায়ের বুকের তলায় মণি-ভাণ্ডারে জমা হ'য়ে আছে। যে-দিনগুলো চলে গেছে, আজ যে প্রিয়জনদের পেছনে ফেলে এল মাটির ওপরে আর তলায়, এক এক ক'রে সব ইতিহাস ভেসে ওঠে ওর সমীক্ষা-ব্যাকুল দৃষ্টির সামনে। সুখ-দুঃখে মেশান স্মৃতি। সুখের মত দুঃখও ওর বুকের ধন। মিনা, সেবাইন, য়্যাডা, ঠাকুর্দা, গতেফ্রেদ মামা, শুলজ বুড়ো, ...মিছিল চলে যায় চোখের সামনে দিয়ে পলক না ফেলতে। নিগূঢ় বন্ধনে ওই বিদেহীদের সাথে ও বাঁধা [ মৃতদের মধ্যে য়্যাডাকেও ধরে ও ] কিছুতেই মুক্ত হতে পারে না ক্রিসতফ। যাদের ভালবাসে একে একে তারা গেছে সবাই। একমাত্র মাই আছেন। মায়ের কথা মনে হ'লে থাকতে পারে না।

ওর একখানা পা এখনও সীমান্তের ওপারে। লরশেন নিয়ে আসবে মায়ের চিঠি। যদি দেখা যায় খুব আঘাত পেয়েছেন, যাই হোক না কেন, ও ফিরে যাবে। আর চিঠি যদি নাই আসে ? এমনও তো হ'তে পারে যে লরশেন মার কাছে যেতেই পারেনি। অথবা কোনও কারণে তাঁর উত্তর নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি ! সেই ক্ষেত্রে ও ফিরেই যাবে।

ষ্টেশনে ফিরে এল। প্রতীক্ষাদীর্ণ মুহূর্তগুলি ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। অবশেষে এল ট্রেণ। এক এক ক'রে সব কটা কামরা দেখল ক্রিসতফ। লরশেন কোথাও নেই। ও ভেবেছিল এ মেয়ের কথার খেলাপ হবে না। হঠাৎ বিপরীত দিক হ'তে আসা ভিড়ের মধ্যে একখানা মুখ চোখে পড়ল। মনে হ'ল যেন আগে ও দেখেছে এ মুখ। চৌদ্দ পোনের বছরের মেয়েটি

মোটাসোটা গোলগাল আহুরে চেহারা, আপেলের মত লাল টুকটুকে টোল-খাওয়া গাল। ছোট ওল্টান নাক, মুখের হাঁ ঈষৎ বড়, মাথা ঘিরে হু'টি বেণী। কাছে এসে ভালো ক'রে দেখে ক্রিসতফ। ঠিক ওর থলির মত একটি থলি ঝোলান তার কাঁধে। চড়াই পাখীর মত ঘাড় বাঁকিয়ে মেয়েটি দেখছিল ওকে। ক্রিসতফকেও তাকিয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে সামনে শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে ইঁহুরের মত তীক্ষ্ণ চোখ হুটো দিয়ে ক্রিসতফের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নিঃশব্দে। ক্রিসতফের চেনা ; লরশেনের খামারেই থাকে, হুধ দোয়। থলিটার দিকে দেখিয়ে ক্রিসতফ বলে :

'এটা তো আমার, তাই না ?

একটুও নড়ল না মেয়েটি। সন্দিগ্ধভাবে জবাব দিল :

'ত জানি-টানিনে। আপনি কোত্থেকে আসছেন, তাই বলুন আগে।'

'বুইর।'

'এটা কে পাঠিয়েছে বলুন তো !'

'লরশেন। দাও এবার।'

মেয়েটি থলিটা বাড়িয়ে দিল : 'এই নিন।' তারপর বলল : 'আমি তো দেখেই চিনতে পেরেছি আপনাকে।'

'তাহ'লে আর দাঁড়িয়েছিলে কেন ?'

'আমি চাইছিলাম আপনিই এসে পরিচয়টা দিন প্রথম।'

'লরশেন এল না কেন ?' জিজ্ঞাসা করে ক্রিসতফ।

উত্তর দিল না মেয়েটি। ক্রিসতফ বোঝে চারদিকে এত লোকজনের মধ্যে ও বলতে চায় না। তাই আগে শুল্ক অফিসের কাজটা সেরে নিয়ে প্লাটফরমের শেষ প্রান্তে নিয়ে গেল ওকে। এবারে মুখ খুলল ওর :

'পুলিশ এসে পড়ল আপনি যাবার ঠিক পরে পরেই। বাড়ী বাড়ী গিয়ে খানাতল্লাসী করেছে ; প্রত্যেককে জেরা করেছে আলাদা ক'রে।

পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। দু'জন মেয়েও আছে তার মধ্যে। কত বলল ওরা যে কিছু করেনি, তারা তাও শুনলে না। গার্টরুড পুলিশদের আঁচড়ে কামড়ে একাকার ক'রে দিয়েছে। তখন আর বলে কি লাভ হ'ত যে আপনিই যত নষ্টের গোড়া।'

'আমি!' ক্রিসতফ চিৎকার ক'রে ওঠে।

'নিশ্চয়', জোরের সঙ্গে বলে মেয়েটি: 'তা, আপনি তো পালিয়েই এলেন। তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজ করেছে আপনার।'

'আর লরশেন?'

'ও ছিলই না। শহরে গিয়েছিল।'

'আমার মায়ের সাথে দেখা হয়েছে ওর?'

'হয়েছে! এই নিন চিঠি। ও নিজেই আসতে চেয়েছিল। কিন্তু গ্রেপ্তার হ'য়ে গেল।'

'তুমি কি ক'রে এলে?'

'পুলিশের চোখ এড়িয়ে গ্রামে ফিরে এসেছিল লরশেন। আবার বেরুবে, এমনি সময়ে পুলিশ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে এসে হাজির। ওদের দেখেই ও ছুটে ওপরে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে হেঁকে বলল: 'এক্ষুনি আসছি কাপড় পরে।' তারপর জানালা দিয়ে ঝুঁকে চেঁচিয়ে আমায় ডাকল: 'লিডিয়া! লিডিয়া!' ডাক শুনে ছুটে কাছে যেতেই থলিটা ছুঁড়ে নীচে ফেলে দিয়ে আমায় সব বলে দিল। আমি ছুটে তখুনি বেরিয়ে পড়লাম। তারপর এই তো দেখছেন।'

'আর কিছু বলেনি সে?'

'বলেছে। আমি যে তার কাছ থেকেই আসছি, তার প্রমানস্বরূপ এই শালটা দিয়েছে।'

ওকে পৌছুতে আসার সময় লরশেনের মাথায় ফুল তোলা আর লাল

ফুট্‌কী দেওয়া সাদা যে শালখানা বাঁধা ছিল ও চিনতে পারে তা। লরশেন ওকে ভালবাসার চিহ্ন পাঠিয়েছে ওই ছল ক'রে, বুঝতে বাকী রইল না ওর! কিন্তু হাসলে না আজ।

লিডিয়া বলল: 'এই যে ফিরতি গাড়ী; আমায় যেতে হবে এক্ষুনি, আচ্ছা নমস্কার।'

'দাঁড়াও একটু।' ক্রিসতফ বলে: 'ভাড়া? ভাড়ার টাকা কোথায় পেলে?'

'দিয়ে দিয়েছে লরশেন।'

'তাহোক, ধর।' ব'লে কিছু টাকা ওর হাতে গুঁজে দিল। লিডিয়া যাবার জন্য পা বাড়ালে আবার ওকে পেছন থেকে টানে। বলে: 'তারপর...'

নীচু হ'য়ে ওর গালে চুমু খায়। মেয়েটি রাগ করার ছল করে।
'চটো না।' ক্রিসতফ বলে: 'তোমায় দেইনি ও চুমু।'

বিদ্রূপের স্বরে লিডিয়া বলে: 'জানি গো জানি! আর বলতে হবে না। লরশেনকে দিয়েছেন।'

শুধু লরশেন নয়, সমস্ত জার্মানীকেই নিবেদন করা ওই চুম্বনের অর্ঘ্য।

ট্রেণ চলতে আরম্ভ করে। লিডিয়া ছুটতে ছুটতে গিয়ে ওঠে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে রইল রুমালটা নাড়াতে নাড়াতে। ওই যে গ্রামের মেয়ে দূত হ'য়ে ওর দেশের আর প্রিয়জনের বার্তা বয়ে এনে দিয়েছে শেষবারের মত, যতক্ষণ দেখা গেল গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল ক্রিসতফ।

ট্রেণ চলে যায়। অবশেষে বিদেশের ভূঁয়ে বিদেশী ক্রিসতফ! ওর চার পাশে একটা একলা জগৎ থম্ থম্ ক'রে উঠল। মায়ের চিঠি আর প্রিয় হস্তের উপহার শালখানাকে বুকে চেপে ধরে। মায়ের চিঠি খুলতে

সাহস হয় না। হাত কাঁপে। কে জানে কোন ভাঙ্গা বুকের হাহাকার আর কঠিন তিরস্কার বহন ক'রে এনেছে এই লিপিকা! ও যেন শুনতে পায়…

শেষ পর্যন্ত চিঠি খুলে ফেলল। মা লিখেছেন :

"বাবা আমার জন্য কিছু ভাবিসনে। আমি খুব ভাল থাকব। ভগবান আমায় শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে আমার স্বার্থে তোকে এখানে ধ'রে রেখে বিপদে ফেলব! অতবড় স্বার্থপর নই। তুই পারীতে চলে যা। হয়ত এতেই তোর ভাল হবে। আমার জন্য একটুও ব্যস্ত হস্‌নে। আমার দিন চলে যাবেই। তুই সুখে থাকলেই আমার সুখ। আমার শুভ-আশীষ নে…মা।"

"সুবিধে পেলেই চিঠি লিখিস।"

ক্রিসতফ থলিটার উপর বসে প'ড়ে আকুল হ'য়ে কাঁদে।

কুলি হাঁকে : 'পারীর ট্রেণ, পারীর ট্রেণ।'

চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায় ক্রিসতফ। তাই যাবে ও—চলে যাবে পারীতে। আকাশের দিকে তাকায় ওই তো ও দিকে পারী। মেঘান্ধকার আকাশের ওই দিকটা আরো অন্ধকার। একটা বিরাট কালো গহ্বরের মত দেখায় অন্ধকার আকাশটাকে, ওর বুকটা টনটন ক'রে ওঠে। না… না…যাবে…যাবে…যেতে হবে, ও পারীতে চলে যাবে।

গাড়ীতে উঠে বসে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মেঘায়িত আকাশের রুদ্র দিগ্বালের দিকে তাকিয়ে থাকে আকুল হ'য়ে। মনে মনে বলে :

'ওগো পারী! পারী! এস হাত বাড়িয়ে এস! তোমার বুকে আশ্রয় দাও! বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও আমার মানস লোকের স্বপ্নকে। বাঁচাও! বাঁচাও!'

গাঢ় কুয়াশা গাঢ়তর হয়। ক্রিসতকের পিছনে ফেলে-আসা প্রিয়ভূমি …উর্দ্ধে আকাশ, পাণ্ডুর নীল…ছোট্ট এক টুকরো…ছুটি চোখের মত… সেবাইনের চোখ বুঝি ঘন মেঘের আড়ালে ঝলসে ওঠে বিষাদের ম্লান হাসির মত…তার পরই যায় মিলিয়ে…

ট্রেণ চলে, বৃষ্টি নামে, নামে রাতের অন্ধকার।